বুদ্ধের শিক্ষা

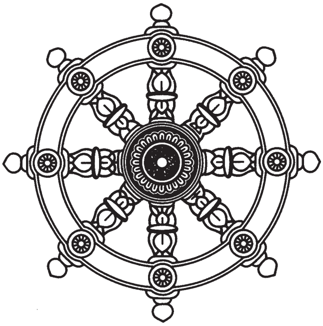

ধর্ম চক্র

ধর্ম চক্র শব্দটি সাংস্কৃত শব্দ "ধর্ম চক্র" হতেই অনুবাদ করা হয়েছে। ইহা শকঠের চাকার ন্যায় পুনঃ পুনঃ চলন্ত অবস্থায় থাকে, এই প্রতিকী চাকার ন্যায় বুদ্ধের শিক্ষা বিস্তৃতাকারে ও সীমাহীনভাবে প্রসারতা অক্ষুন্ন থাকবে। চাকার ৮টি অংশের দ্বারা বৌদ্ধ ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গকে উপস্হাপন করা হয়েছে। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ হলো, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। অতীতে বুদ্ধ প্রতিবিম্ব বা অন্য ধরনের মূর্তি তৈরীর পূর্বে, এই ধর্ম চক্রকেই উদ্দেশ্য করে প্রার্থনা করা হতো। বর্তমানে, এই ধর্ম চক্রকে সাধারণত আন্তর্জাতিকভাবে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

Copyright © 2005 by **BUKKYŌ DENDŌ KYŌKAI**

Any part of this book may be quoted without permission. We only ask that **Bukkyō Dendō Kyōkai**, Tokyo, be credited and that a copy of the publication sent to us. Thank you.

BUKKYŌ DENDŌ KYŌKAI
(Society for the Promotion of Buddhism)
3-14, Shiba 4-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan, 108-0014
Phone: (03) 3455-5851
Fax: (03) 3798-2758
E-mail: bdk@bdk.or.jp http://www.bdk.or.jp

Fourth revised edition, 2011

Printed by
Kosaido Co., Ltd.
Tokyo, Japan

বুদ্ধের প্রজ্ঞা মহা সমুদ্রের ন্যায় প্রশস্ত এবং তাঁর সহিষ্ণুতা মহাকরুণায় পরিপূর্ণ।

বুদ্ধের কোন রূপ নেই কিন্তু তিনি নিজেকে তাঁর সমগ্র করুণাভরা হৃদয়ের মাধ্যমে খুবই সৌন্দর্যপূর্ণভাবে আমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করেন।

এই বইটি খুবই মূল্যবান কারণ এর মধ্যে বুদ্ধের শিক্ষার অপরিহার্য উপাদান নিহিত আছে যা পাঁচ হাজার সংকলনের মধ্যে লিপিবদ্ধ ছিল। এই শিক্ষা, সীমান্ত ব্যাপকতা এবং জাতিগত প্রতিবন্ধকতার উর্ধ্বে, ২হাজার ৫০০ বৎসরেরও বেশী সময় ধরে রক্ষা করা হচ্ছে এবং যা এই বিশ্বের সকলের উদ্দেশ্যে অর্পন করা হয়েছে।

এই বই বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাণী সমৃদ্ধ, যা মানব জীবনের সকল দৃষ্টিভঙ্গিকে স্পর্শ করেছে এবং একে অর্থবহ করে রেখেছে।

ধর্মপদ

জগতে শত্রুতার দ্বারা কখনও শত্রুতার উপশম হয় না, মিত্রতার দ্বারাই শত্রুতার উপশম হয়; ইহাই সনাতন ধর্ম। (গাথা নং ৫)

যে মূর্খ নিজের অজ্ঞতা সম্পর্কে সচেতন, তদ্বারা সে সেই পরিমানে পণ্ডিত কিন্তু যে মূর্খ নিজেকে পণ্ডিত বলে অভিমান করে সে-ই যথার্থ মূর্খ বলে কথিত হয়। (গাথা নং ৬৩)

যে ব্যক্তি সংগ্রামে সহস্র সহস্র মানুষকে জয় করে তাঁর তুলনায় যিনি কেবলমাত্র নিজেকে জয় করেন-তিনিই সর্বোত্তম সংগ্রামজয়ী। (গাথা নং ১০৩)

যে ব্যক্তি উত্তম ধর্ম দর্শন না করে শতবর্ষ জীবিত থাকে, তাঁর জীবন অপেক্ষা যিনি ঐ ধর্ম দর্শন করেছেন তাঁর একদিনের জীবন ও শ্রেয়ঃ। (গাথা নং ১১৫)

মানব জন্ম লাভ করা যেমন দুষ্কর, মৃত্যু ও তেমনি কষ্টকর। সদ্ধর্ম শ্রবণ খুবই কষ্টকর; বুদ্ধদের আবির্ভাব সহজ নহে। (গাথা নং ১৮২)

সর্ব প্রকার পাপ হতে বিরত, কুশল কর্মের পরিপূর্ণতা ও স্বীয় চিত্তের পবিত্রতা সাধন-ইহাই বুদ্ধের অনুশাসন। (গাথা নং ১৮৩)

(মৃত্যু হতে) ত্রাণ কল্লে পুত্রগণও নেই, পিতাও নেই, বন্ধুগণও নেই; যমাক্রান্তের ত্রাণকার্য জ্ঞাতিগণের দ্বারা সম্ভব নয়। (গাথা নং ২৮৮)

সূচী পত্র

বুদ্ধ

১ম পরিচ্ছেদ ঃ শাক্যমুণি বুদ্ধ 2
১। বুদ্ধের জীবন কথা 2
২। বুদ্ধের শেষ শিক্ষা 9
২য় পরিচ্ছেদ ঃ চিরন্তনসত্য বুদ্ধ ও তাঁর মহিমা 13
১। বুদ্ধের করুনা ও তাঁর ব্রত 13
২। জীবজগতের মুক্তির জন্যে বুদ্ধের পথ নির্দেশনা 16
৩। চিরন্তনসত্য বুদ্ধ 19
৩য় পরিচ্ছেদ ঃ বুদ্ধের প্রকৃতি ও গুণাবলী 22
১। বুদ্ধের শরীরের ৩ প্রকার লক্ষণ 22
২। বুদ্ধের আবির্ভাব 25
৩। বুদ্ধের গুণাবলী 28

ধর্ম

১ম পরিচ্ছেদ ঃ কার্যকারণ সম্বন্ধ 34
১। চারি আর্যসত্য 34
২। কার্যকারণ সম্বন্ধ 36
৩। প্রতিত্যুৎসমুদপাদ নীতি 38
২য় পরিচ্ছেদ ঃ মনস্তত্ত্ব ও বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ 41
১। অনিত্য ও অনাত্মা 41
২। মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে 43

৩। বস্তুর প্রকৃত অবস্থান বা স্বরূপ 46
৪। মধ্যম পথ 50
৩য় পরিচ্ছেদ ঃ বুদ্ধের স্বরূপ 56
১। পরিশুদ্ধ মন 56
২। বুদ্ধের স্বরূপ 60
৩। অনাত্মা 64
৪র্থ পরিচ্ছেদ ঃ কলুষিত পথ 68
১। মানবীয় কলুষিত পথ 68
২। মানুষের প্রকৃতি বা স্বরূপ 74
৩। মানব জীবন 75
৪। মানব জীবনের বাস্তবতা 80
৫ম পরিচ্ছেদ ঃ বুদ্ধের দ্বারা নির্দেশিত মুক্তির পথ 85
১। অমিতাভ বুদ্ধের প্রার্থনা 85
২। বুদ্ধভূমি শুদ্ধাবাস 92

অনুশীলন পদ্ধতি

১ম পরিচ্ছেদ ঃ বিশুদ্ধিতা লাভের উপায় 96
১। মনের বিশুদ্ধিতা 96
২। চারিত্রিকতার সৎ দিকগুলো 102
৩। পৌরাণিক রূপকথার আলোকে বুদ্ধের শিক্ষা 111
২য় পরিচ্ছেদ ঃ সফলতা অর্জনের ব্যবহারিক পদ্ধতি 123
১। সত্যের সন্ধানে 123
২। অনুশীলনের বিভিন্ন উপায় 133
৩। বিশ্বাসের পথ 144
৪। বুদ্ধের বাণী 150

ভ্রাতৃসংঘ

১ম পরিচ্ছেদ ঃ ভ্রাতৃসংঘের দায়িত্ব ও কর্তব্য 160

১। গৃহত্যাগী সদস্যগণ/ ভিক্ষুসংঘ 160

২। গৃহী অনুসারীগণ 165

২য় পরিচ্ছেদ ঃ সত্যিকার জীবনধারণের ব্যবহারিক নির্দেশনা 176

১। পারিবারিক জীবন 176

২। মহিলাদের জীবন 185

৩। কর্ম সাধন 191

৩য় পরিচ্ছেদ ঃ বুদ্ধভূমি গঠন 201

১। ভ্রাতৃসংঘের মধ্যে সহনশীলতা 201

২। বুদ্ধ ভূমি 208

৩। বুদ্ধ ভূমিতে যাঁরা মহিমান্বিত 212

উৎস ও নির্দেশনা 217

পরিশিষ্ট

১। বৌদ্ধ ধর্মের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 230

২। বুদ্ধের শিক্ষার প্রচার মিশন 240

৩। বুদ্ধের শিক্ষার ইতিহাস 243

৪। বুদ্ধের শিক্ষা গ্রন্হের অনুক্রমণিক 246

৫। সংস্কৃত শব্দকোষ (বর্ণানুক্রমিক অনুসারে) 255

৬। অঙ্গুত্তর নিকায় 262

বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার সংস্হা এবং বুদ্ধের শিক্ষা গ্রন্হের বিতরণ প্রসঙ্গ 263

বুদ্ধ

১ম পরিচ্ছেদ

শাক্যমুণি বুদ্ধ

১

বুদ্ধের জীবন কথা

১। হিমালয় পর্বতের দক্ষিন পার্শ্বের পাদদেশে প্রবাহিত রোহিনী নদীর তীরে শাক্য গোত্রীয় লোকদের বসবাস ছিল। তাঁদের রাজা শুদ্ধোধন গৌতম কপিলাবস্তুতে সেই জনগোষ্ঠীর রাজধানী স্হাপন করেন। তিনি এক বিশাল রাজপ্রাসাদ তৈরী করে প্রজাদের দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিলেন এবং প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার সাথে রাজ্য শাসন করে আসছিলেন।

তাঁর রানীর নাম ছিল মায়া। তিনি শুদ্ধোধন রাজার মামাতো বোন ছিলেন, এবং তাঁর পিতাও পার্শ্ববর্তী রাজ্যের শাক্যবংশীয় রাজা ছিলেন।

বিয়ের পর বিশ বছর পর্যন্ত তাঁদের কোন ছেলে মেয়ে ছিল না। কিন্তু হঠাৎ একদিন রাত্রে রানী মায়া এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন। তাহলো, তিনি তাঁর বুকের ডান পার্শ্ব দিয়ে এক সাদা হাতী গর্ভে প্রবেশ করছে, এরূপ অনুভব করলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরই তিনি গর্ভবতী হলেন। এতে রাজা এবং প্রজাগণ রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারীর আগমনের জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন। সেকালের প্রথানুসারে রানী মায়া তাঁর পিতৃ গৃহেই সন্তানের জন্মদানের উদ্দেশ্যে পিত্রালয়ের দিকে যথাসময়ে রওনা হলেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভরপুর আলোকোজ্জ্বল বসন্তের এক দিনে, রানী পিত্রালয়ে যাওয়ার পথে লুম্বিনী উদ্যানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করেন।

তখন রানীর সর্বশরীরের উপর ঝরে পড়ছিল শুভ্র অশোক ফুল। প্রফুল্ল মনে তিনি ডান হাত বাড়ালেন অশোক বৃক্ষের এক ঢাল ধরতে। আর এ মুহূর্তেই তিনি প্রসব

করলেন রাজকুমারকে। রানীর মহিমা এবং তাঁর নবজাতকের রাজকীয় এই জন্মে, স্বর্গ মর্ত্যের সকলের অন্তর উদ্বেলিত হলো অপার আনন্দে। এই স্মরণীয় দিনটি ছিল ৮ই এপ্রিল।

এই সন্তানের নিরাপদ জন্মে, রাজার আনন্দ ছিল সবচেয়ে বেশী। তিনি আপন সন্তানের নাম রাখলেন সিদ্ধার্থ। যার অর্থ হলো "সমস্ত আশার পরিপূর্ণতা লাভ।"

২। কিছু দিন পর, রাজপ্রাসাদের এই আনন্দ উৎসব হঠাৎ বেদনাদায়ক হয়ে দেখা দিল, প্রিয়তমা রানী মায়াদেবীর হঠাৎ মৃত্যুতে। ফলে, রানীর ছোট বোন মহাপ্রজাপতি রাজকুমারের লালন পালনের ভার গ্রহণ করলেন। তিনি পরম মাতৃ স্নেহে বড় করে তুলতে লাগলেন মাতৃহারা কুমারকে।

তখন অসিত নামের এক প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী পাহাড়ের অনতিদূরে বাস করতেন। তিনি রাজপ্রাসাদের উপরে এক উজ্জ্বল আলোর বিচ্ছুরণ দর্শন করলেন। ইহা এক মহামংগলের পূর্বাভাস জেনে তিনি রাজপ্রাসাদে আগমন করলেন। রাজকুমারকে দর্শন করানো হলে, তিনি এই বলে ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করলেন, "যদি এই শিশু রাজপ্রাসাদে অবস্হান করেন, তাহলে বড় হয়ে একদিন তিনি জগৎ বিখ্যাত রাজা হবেন; আর যদি সংসার ত্যাগ করেন, তাহলে তিনি হবেন জগত পরিত্রাতা বুদ্ধ।"

প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করে রাজা খুশী হয়েছিলেন, কিন্তু পরে একমাত্র পুত্রের সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী হওয়ার সম্ভাব্যতায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন।

রাজকুমারের বয়স যখন ৭ বৎসর তখন তিনি রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ও সামরিক বিষয়ে পাঠ গ্রহণ শুরু করলেন কিন্তু তাঁর মনের ঝোঁক ছিল এই বিষয়গুলোর চেয়ে অন্য বিষয়ে জানার জন্যে। বসন্তের একদিনে রাজকুমার তাঁর পিতার সাথে বেড়াতে প্রাসাদ হতে বের হলেন। তখন তাঁরা উভয়ে এক কৃষকের ভূমিকর্ষণ দেখছিলেন। রাজকুমার লক্ষ্য করলেন, এক পাখি ভূমিতে অবতরণ করে একটি কেঁচোকে ধরে নিয়ে গেল। চাষার লাংগলের ফলায় এটি মাটির উপরে উঠে এসেছিল। এটা দর্শন করে রাজকুমার এক গাছের ছায়ার নিচে বসে একা একা গভীরভাবে চিন্তা করতে

লাগলেন যে ঃ

"হায়রে ! জগতের সকল প্রাণীই কি একে অপরকে এভাবে হত্যা করে ?"

রাজকুমার, যিনি তাঁর মাতাকে জন্মের অল্প কিছুদিনের মধ্যে হারালেন, তিনি এই ছোট প্রাণীগুলোর মর্মান্তিক অবস্থা দেখে অন্তরে গভীরভাবে বেদনা অনুভব করলেন।

রাজকুমার দিন দিন যত বড় হচ্ছেন তত এ মানসিক বেদনা অধিকতরভাবে অনুভব করতে লাগলেন। এটা যেন চারাগাছের মধ্যে গভীর ক্ষত চিহ্নের ন্যায়। মানব জীবনের দুঃখ সত্য এভাবে তাঁর হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করতে শুরু করলো।

রাজা রাজকুমারের এই অবস্থা দর্শন করে অসিত সন্ন্যাসীর ভবিষ্যদ্বাণীর কথা স্মরণ করলেন। এতে রাজার মানসিক পীড়া আরও বৃদ্ধি পেতে শুরু করলো। ফলে, তিনি রাজকুমারের মনোভাব পরিবর্তনের জন্যে ভোগ বিলাসের প্রতি আকর্ষণের সকল পন্থা অবলম্বন করলেন। রাজা ১৯ বৎসর বয়সে রাজকুমারী যশোধারার সাথে রাজকুমারের বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন। রাজকুমারী যশোধারা দেবদাহ রাজ্যের রাজা এবং স্বর্গীয়া রানী মায়ার ভাই সুপ্রবুদ্ধের কন্যা ছিলেন।

৩। বিবাহের পর ১০ বছর যাবৎ বসন্ত, শরৎ ও বর্ষা ঋতুর উপযোগী করে নির্মিত প্রাসাদে নাচ, গান ও নানা আনন্দের মধ্যে অবস্হান করেও রাজকুমার সিদ্ধার্থের মন এগুলোতে রমিত হলো না। তিনি সর্বদা দুঃখের কারণ অনুসন্ধান এবং মানব জীবনের প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবনের চেষ্টা করতে লাগলেন।

তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, "রাজপ্রসাদের এ আরাম-আয়েশ, আমার এই সু-স্বাস্হ্য এবং যৌবনের এ আনন্দ-আমার জীবনে এগুলো কোন সদর্থ বয়ে আনতে পারে কি ? একদিন আমাদেরকে রোগগ্রস্ত হতে হবে, বৃদ্ধ হতে হবে, এবং অবশেষে

মৃত্যুর হাত থেকে কেহই রেহাই পাবে না। যৌবনের গর্ব, সু-স্বাস্হ্যের গর্ব এবং বেঁচে থাকার গর্ব সবকিছুই একদিন ত্যাগ করে চলে যেতে হবে আমাদেরকে।"

"একজন মানুষ বাঁচার জন্যে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে আসছে এবং এর পিছনে স্বভাবতই কাজ করছে অনেক আশা-আকাঙ্খার মূল্যায়ন। এই মূল্যায়ন দু'ভাবে হতে পারে-সঠিক ধারণা ও ভুল ধারণার মাধ্যমে। রোগ, বার্ধক্য, ও মৃত্যুকে পরিহার করতে পারবে ইহা ভুল ধারণা।"

"যদি সে সঠিক ধারণার মাধ্যমে রোগের প্রকৃত স্বরূপ, বার্ধক্যের প্রকৃত স্বরূপ এবং মৃত্যুর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে বুঝতে পারে, তাহলে সে জীবজগতের মুক্তির পথ নির্দেশনা দিতে পারবে। আমি আরাম-আয়েশের মাধ্যমে আমার এই জীবন যাত্রাকে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছি।"

৪। অতঃপর, রাজকুমার যখন ২৯ বৎসর বয়সে উত্তীর্ণ হলেন তখন রাহুল নামক তাঁর এক পুত্র সন্তান জন্ম নিলো এবং সাথে সাথে তাঁর মনে আধ্যাত্নিকতার বীজ বপিত হলো এই ভেবে, সন্তানের প্রতি পিতার অপত্য স্নেহ যেন আমরণ বন্ধনে আবদ্ধ না করে। পরে তিনি রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে মানসিক উৎকর্ষতা সাধনের জন্যে গৃহত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন। একদিন রাত্রে সিদ্ধার্থ তাঁর ঘোড়া চালক চন্দক এবং প্রিয় সাদা ঘোড়া কন্হককে নিয়ে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করলেন।

তখনও তাঁর মানসিক বেদনার পরিসমাপ্তি হয়নি। মনের অপদেবতাগণ তাঁকে বলতে লাগলো, "সিদ্ধার্থ তুমি রাজপ্রাসাদে ফিরে যাওয়াটাই সর্বোত্তম। কারণ এই পৃথিবী খুব শীঘ্রই তোমার হাতের মুঠোয় চলে আসবে।" মানস দেবতাকে রাজপুত্র বললেন, "এই পৃথিবী আমার প্রয়োজন নেই।" তারপর তিনি তাঁর মাথার চুলগুলো কেটে ফেললেন এবং ভিক্ষা পাত্র হাতে নিয়ে দক্ষিন দিকে রওনা হলেন।

রাজকুমার প্রথমে ভর্গব মুনির কুঠিরে গমন করলেন। তাঁর কৃচ্ছ্র সাধনা সতর্কতার সাথে দর্শন করলেন। অতঃপর তিনি আরাল কালাম এবং রামপুত্র রুদ্রক এর নিকট গিয়ে তাঁদের সাধনানীতি জানার চেষ্টা করলেন। সর্বশেষে তিনি মগধ রাজ্যের গয়া

গ্রামের পার্শ্বে প্রবাহিত নৈরঞ্জনা নদীর অববাহিকায় উরুবেলা নামক বনে সাধনায় রত হলেন।

৫। তাঁর সাধনা পদ্ধতি ছিলো অতুলনীয়ভাবে কঠিন। তিনি এই সাধনার ব্যাপারে বলেছিলেন, "কোন সাধকই অতীতে এবং বর্তমানে এত কঠিন সাধনা করেননি যা আমি চর্চা করেছি এবং যা ভবিষ্যতেও সম্ভব নহে।"

তথাপি তিনি তখনও তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্যে উপনীত হতে পারেননি। তাই ৬ বৎসর কৃচ্ছ্র সাধনার পরে তিনি তা ত্যাগ করলেন। অতঃপর তিনি পার্শ্বের নদীতে স্নান করতে গিয়ে নিকটবর্তী গ্রামের সুজাতা নামক এক গৃহিনী হতে এক কাপ দুধ গ্রহণ করলেন। যখন তিনি সুজাতার হাত হতে দুধ গ্রহণ করলেন তখন অপর ৫ সঙ্গী যাঁরা ৬ বৎসর ধরে তাঁর সঙ্গে সাধনারত ছিলেন তাঁরা রাজকুমারের চারিত্রিক উৎকর্ষসাধনে হানি ঘটেছে এরূপ চিন্তা করে তাঁকে পরিত্যাগ করলেন।

অতঃপর রাজকুমার একাকী অবস্হান করতে লাগলেন। যদিও তিনি শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন কিন্তু তবুও জীবনাবসানের ঝুঁকি নিয়ে সাধনারত হওয়ার পূর্বে সংকল্পবদ্ধ হলেন যে, "আমার শরীরের রক্ত শুকিয়ে যেতে পারে, মাংস খসে পড়তে পারে, হাড় শরীর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে তবুও আমি আমার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার পূর্বে এই আসন হতে এক বিন্দুও নড়বো না।"

ইহা তাঁর জন্যে তীব্র এবং অতীব কঠিন শপথ ছিলো। কারণ ইতিমধ্যে তিনি হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর মন কিংকতর্ব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। তাঁর মনে শতশত কালো ছায়া এসে ভিড় করছিল। এক কথায় বলতে গেলে তিনি সকল প্রকার মারের বাঁধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এই জীবন মরণ সংকল্পের পর তিনি সর্তকতা এবং ধৈর্য্যের সাথে একটার পর একটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে মারের সকল বন্ধন ছেদন করলেন। এটা ছিল তাঁর জন্যে অগ্নি পরীক্ষা তুল্য এবং এতে তাঁর রক্ত চলাচল সূক্ষ্ম হয়ে গেল, শরীরের মাংস শুকিয়ে গেল এবং হাড় বাহির হয়ে আসল।

এভাবে একদিন রাত্রিগত হয়ে পূর্বাকাশে যখন দিনমণি তার রক্তিম আভা ছড়িয়ে

আবির্ভূত হচ্ছিল ঠিক সেই মুহূর্ত্তে রাজকুমারের মনের সমস্ত কালো ছায়া বিদূরিত হয়ে মেঘমুক্ত উজ্জ্বল আকাশের ন্যায় তাঁর মন আলোকিত হলো। অবশেষে তিনি তাঁর পরম পাওয়া বোধিজ্ঞান লাভ করলেন। তাঁর বয়স যখন ৩৫ বৎসর পূর্ণ হলো তখন তিনি বুদ্ধত্বজ্ঞান লাভ করলেন আর ঐ দিনটি ছিল ডিসেম্বর মাসের ৮ তারিখ।

৬। সে সময় হতে রাজকুমার বিভিন্ন নামে পরিচিত হলেন। কেহ তাঁকে বুদ্ধ, কেহ সম্যাসম্বুদ্ধ, কেহ তথাগত, আবার কেহবা শাক্যবংশের মহাজ্ঞানী শাক্যমুণি, কেহবা বিশ্বনন্দিত ব্যক্তি হিসেবে সম্বোধন করতে লাগলেন।

অতঃপর তিনি তাঁর ৫ জন বন্ধু যারা এক সাথে ৬ বৎসর কৃচ্ছ্র সাধনারত ছিলেন এবং পরে তাঁকে ছেড়ে চলে যান, তাঁদেরকে দর্শনের জন্যে বারানসীর মৃগদাবে গমন করলেন। বুদ্ধকে দেখে প্রথমে তাঁরা এড়িয়ে চলতে চাইলেন, পরে তাঁর সাথে আলাপ করে অনুধাবন করতে পারলেন যে তিনি বোধিজ্ঞান লাভ করেছেন এবং পরিশেষে তাঁরা বুদ্ধের প্রতি বিশ্বাস স্হাপন করে তাঁর প্রথম অনুসারী হলেন। অতঃপর বুদ্ধ তাঁর বাল্যবন্ধু রাজগৃহের রাজা বিম্বিসারের নিকট গমন করলেন এবং তাঁকেও তাঁর অনুসারী হিসেবে পেলেন। তারপর থেকে তিনি দেশে দেশে ভিক্ষান্নের মাধ্যমে জীবন ধারণ করে সাধারন জনগণকে তাঁর শিক্ষা এবং জীবন যাত্রা সম্পর্কে প্রচার করতে লাগলেন।

ঠিক সে সময়ে মানুষ তৃষিতের ন্যায় এবং ক্ষুধার্তের ন্যায় তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন। তখন সারিপুত্র এবং মোদগল্যায়ন নামক দুই প্রধান শিষ্য তাদের ২ হাজার অনুসারী সহ বুদ্ধের শরণাপন্ন হলেন।

রাজকুমারের পিতা তাঁর গৃহত্যাগের সিদ্ধান্তে প্রথমে মনে খুবই দুঃখ পেয়েছিলেন, অথচ পরে তিনি নিজেও বুদ্ধের প্রতি বিশ্বাস স্হাপন করেছিলেন। মহাপ্রজাপতি বুদ্ধের বিমাতা, রাজকুমারের স্ত্রী যশোধরা সহ শাক্যবংশের অন্যান্যরাও পরে বুদ্ধের প্রতি তাদের বিশ্বাস স্হাপন করেছিলেন।

শাক্যমুণি বুদ্ধ

৭। বুদ্ধের শিক্ষা প্রচার এবং প্রসারের লক্ষ্যে তিনি দেশ থেকে দেশান্তরে ৪৫ বৎসর যাবৎ প্রচারাভিযান পরিচালনা করেন। তাঁর বয়স যখন ৮০ বৎসর তখন তিনি বৈশালীতে ছিলেন। সে সময়ে ধর্ম প্রচারে যখন তিনি রাজগৃহ হতে শ্রাবস্তীর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন, প্রতিমধ্যে অসুস্হ্য হয়ে পড়লে ৩ মাস পর পরিনির্বাপিত হবেন বলে ঘোষণা করলেন। তখনও তিনি তাঁর ধর্মযাত্রা স্হগিত করেননি। অতঃপর বুদ্ধ পাবায় উপস্হিত হলেন এবং স্বর্ণকার চুন্দের প্রদত্ত আহার গ্রহণ করে খুব বেশী রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। এতে তিনি শরীরে তীব্র বেদনা এবং দুর্বলতা অনুভব করলেন। এর পরেও পায়ে হেঁটে তিনি কুশীনগর সীমান্তের নিকটবর্তী এক শালবনে উপস্হিত হলেন।

তিনি তাঁর পরিনির্বাণের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত দু'টি বৃহৎ শালবৃক্ষের মধ্যবর্তী স্হানে শায়িত অবস্হায় শিষ্যসংঘকে দেশনা করেছিলেন। অতঃপর তিনি এই পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে তাঁর সমস্ত করণীয় কাজ শেষ করে পরম শান্তিপদ মহাপরিনির্বাণ সাক্ষাৎ করেছিলেন।

৮। বুদ্ধের খুবই নিকটতম শিষ্য আনন্দের তত্ত্বাবধানে এবং কুশীনগরের জনগণের সাহায্য সহযোগিতায় তাঁর শেষকৃত্যানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

পার্শ্ববর্তী ৭টি রাজ্যের রাজাগণ সহ অজাতশত্রু বুদ্ধের পুতস্হি সবার মধ্যে সমভাবে ভাগ করে দেওয়ার জন্যে প্রার্থনা জানালেন। এই প্রার্থনা প্রথমে কুশীনগরবাসী প্রত্যাখান করেন এবং এর জন্য প্রয়োজনে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। অবশেষে দ্রোণ পন্ডিতের উপদেশে এই সমস্যার সমাধান হয় এবং ৮টি বড় রাজ্যে এই পুতস্হি সমভাবে ভাগ করে দেয়া হয়। শ্মশানের ছাই এবং মাটি যেগুলো ছিল তাও পরবর্তীতে সম্মান স্বরূপ ২ রাজ্যে ভাগ করে দেয়া হল। অতঃপর ১০টি রাজ্যে বুদ্ধকে পুজা অর্চনা করার উদ্দেশ্যে ঐ পুতস্হির উপর ১০টি সুবৃহৎ চৈত্য নির্মাণ করা হল।

২

বুদ্ধের শেষ শিক্ষা

১। কুশীনগরের শালবৃক্ষের নীচে বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের প্রতি শেষ শিক্ষা দিলেন, যা হলো ঃ

"তোমরা নিজেই নিজেকে আলোকবর্তিকা হিসেবে গড়ে তোল। নিজেকে নিজের বিশ্বস্ত হিসেবে গড়ে তোল। এই জন্যে কারও উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিৎ নয়। আমার শিক্ষাকে তোমাদের পথচলার আলোকবর্তিকা হিসেবে গ্রহণ করতে পার এবং এগুলোতেই বিশ্বস্ত হও, অন্য কোন শিক্ষাতে তোমাদের নির্ভরশীল হওয়া উচিৎ নয়।"

শরীরের প্রতি মনোযোগ দাও এবং ইহা যে পুতি দুর্গন্ধময় তা ভাবার চেষ্টা কর। শরীরের দুঃখ এবং সুখ দু'টিই দুঃখের কারণ। কিভাবে তুমি এর প্রতি রমিত হতে পারো ? তোমরা 'আমিত্ব' শব্দের অসারত্বে মনোযোগ দাও এবং এর অস্হায়ীত্বের কথা ভাবার চেষ্টা করো। কিভাবে তুমি এই 'আমিত্বের' প্রতি মোহগ্রস্ত হতে পারো ? কিভাবে একে পরিচর্যা করতে পারো এবং অহংবোধ করতে পারো ? এই সব ভাবনার মাধ্যমে দুঃখকে সঠিকভাবে জানলে তার পরিসমাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে মনোযোগ দাও। এতে তুমি কোথায় 'আমিত্ব' খুঁজে পাবে ? এগুলোকে এক সাথে আবদ্ধ বস্তু বা স্কন্ধ কি বলা যায় না ? এবং এগুলো আজ না হয় কাল কি নিশ্চয়ই টুকরা টুকরা হয়ে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে না ? তোমরা দুঃখ সত্যকে না বুঝলে বিপথে যাবে। আমি পরিনির্বাপিত হলেও আমার শিক্ষা তোমাদের জন্যে রয়েছে এবং এগুলো অনুশীলন, অনুধাবন করে তোমরা দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবে। যদি তোমরা সঠিকভাবে আমার ধর্ম প্রতিপালন করো তাহলে তোমরাই আমার প্রকৃত অনুসারী হবে।"

২। "শিষ্যগণ, যে শিক্ষা আমি তোমাদেরকে দিয়ে যাচ্ছি তা কখনও ভুলার এবং বর্জনের নয়। এগুলো সর্বকালের জন্যে সম্পদ, শিক্ষনীয় বিষয় এবং চর্চার বিষয়।

যদি তোমরা এই শিক্ষা অনুসরণ কর তাহলে তোমরা সব সময় সুখী হবে।”

“মনকে সংযম করাই এই শিক্ষার মূল বিষয়বস্তু। লোভ থেকে মনকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলে চরিত্রবান হওয়া যায় এবং চিত্তে বিশুদ্ধি লাভ করা যায়। এতে নিজের বাক্যও পরিশুদ্ধিতা লাভ করে। সদা জীবনের নশ্বরতার কথা ভাবলে লোভ এবং সর্বপ্রকার অকুশল কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করা যায়।”

“যদি তুমি দেখ যে, তোমার মন লোভের ফাঁদে পড়ে প্রলুব্ধ হচ্ছে, তখন তোমার উচিৎ লোভের প্রলোভন হতে মনকে সংযত ও দমন করা; নিজেই নিজের মনের নিয়ন্ত্রক হও।”

“একজন মানুষের মন তাকে বুদ্ধ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে, আবার পশু হিসেবেও গড়ে তুলতে পারে। অপকর্মের দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানুষ অপশক্তির দ্বারা ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে, আবার বিপরীতে সৎকর্মের মাধ্যমে মানুষ সর্বজ্ঞ বুদ্ধও হতে পারে। তাই নিজের মনকে আয়ত্তে রাখা এবং সৎ পথ থেকে বাহিরে না যায় মত সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিৎ।”

৩। “তোমাদের উচিৎ একে অপরকে সম্মান করা, ধর্ম প্রতিপালন করা, কলহ থেকে বিরত থাকা। জল এবং তৈলের ন্যায় পৃথক পৃথক থাকা তোমাদের উচিৎ নয়। তোমাদের উচিৎ দুধ এবং পানির ন্যায় একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে অবস্হান করা।”

“এক সাথে শিক্ষা কর, দক্ষতা অর্জন কর এবং ধর্মচর্চা কর, মন এবং সময়কে অকার্য্যে এবং কলহে ব্যবহার করো না। নৈর্বাণিক আনন্দ, মার্গ ও ফল উপভোগ করার চেষ্টা করো।”

“যে শিক্ষা আমি তোমাদের জন্যে প্রচার করেছি তা আমার দ্বারা সৃষ্ট এবং তা আমার দ্বারা আবিষ্কৃত পথ। যে কোন মুহূর্তে তোমরা এসে এর সত্যতা প্রমাণ করতে পারো।”

"যদি এই ধর্মকে তোমরা সঠিকভাবে বুঝ অথবা জ্ঞাত হও তাহলে তোমরা আমাকে সঠিকভাবে বুঝতে পারবে। তোমরা আমার কাছ থেকে দূরে অবস্থান করেও ধর্মকে সঠিকভাবে গ্রহণ করলে এবং চর্চা করলে, তোমরা দূরে থাকলেও আমার অতি নিকটে বলে জানবে।"

৪। "হে সৌম্যগণ ! আমি আর বেশীদিন তোমাদের সম্মুখে থাকবো না; কিন্তু তাই বলে তোমরা অনুতাপ করবে না। জীবন চিরস্থায়ী নয়। কেহই এই নশ্বর দেহকে ধরে রাখতে পারবে না। আমার বর্তমানের এই শরীর মৃত্যুর পরেই ধ্বংস প্রাপ্ত শকটের ন্যায় অদূরে কোথাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে; যা এতদিন 'আমি' 'আমার' বলে বলে আসছিলাম।"

"তোমরা বৃথা পরিতাপ করো না, কিন্তু অনুধাবন করার চেষ্টা কর যে, এই পৃথিবীতে অবিনশ্বর নামের কিছুই নেই; যা এই জীবনের নিশ্চিত অবসান সেই মৃত্যু থেকে আমরা বুঝতে পারি। অকুশল চেতনা পোষণ করো না, এতে যেই দুঃখ ক্ষয়শীল, পরিবর্তনশীল, তা আবার অপরিবর্তিতও হতে পারে।"

"তীব্র বস্তুগত ভোগাকাঙ্খা সর্বদা মানুষের মনকে প্রভাবিত করার পথ খুঁজে বেড়ায়। যদি কোন বিষধর সর্পসহ একই কক্ষের মধ্যে অবস্থান করা হয়, তখন নিশ্চিন্তে ঘুম যেতে হলে আগে ঐ সর্পটিকে নিজের কক্ষ থেকে বের করে দিতে হবে।"

"তোমাদেরকে বিষধর সর্পের ন্যায় বৈষয়িক সমস্ত বন্ধন ক্ষয় করতে হবে। তাই তোমরা অবশ্যই তোমাদের মনকে পাহারার মাধ্যমে রক্ষা করবে।"

৫। "হে শিষ্যগণ ! আমার শেষ দিবস খুবই সন্নিকটে, কিন্তু তোমরা মনে রেখো যে, মৃত্যু মানে শুধুমাত্র এ রূপগত দেহের বিলীন মাত্র। এই দেহ পিতা-মাতা দ্বারা সৃষ্ট এবং খাদ্য দ্বারা প্রতিপালিত হয়ে আসছে; রোগ ও মৃত্যু এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মাত্র।"

শাক্যমুণি বুদ্ধ

"কিন্তু প্রকৃত বুদ্ধ মানবীয় দেহ নহে--ইহা হলো বোধিজ্ঞান। মানবীয় দেহের অবসান আছে, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম ও ধর্মচর্চার মধ্যে বুদ্ধজ্ঞান সর্বদা বিরাজমান থাকে। যে শুধু আমার দেহ দর্শন করে, সে প্রকৃত পক্ষে আমাকে দর্শন করে না। যে আমার ধর্মকে দর্শন করে, শুধু সেই আমাকে প্রকৃত দর্শন করে।"

"আমার মৃত্যুর পরে ধর্মই তোমাদের শিক্ষকরূপে আবির্ভূত হবে। ধর্মকে অনুসরণ করলে আমার দর্শনও পাবে।"

"আমার জীবনের শেষ ৪৫ বৎসর আমি আমার শিক্ষার কিছুই তোমাদের কাছ থেকে আড়াল করে রাখিনি। এই শিক্ষাতে অপ্রকাশিত, গোপনীয় অর্থ বলতে কিছুই নেই; সব আমি তোমাদের জন্যে খোলাভাবে এবং পরিস্কারভাবে বর্ণনা করেছি। আমার প্রিয় শিষ্যগণ ! ইহাই তোমাদের প্রতি আমার শেষ উপদেশ। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি পরিনির্বাপিত হবো। ইহাই তোমাদের প্রতি আমার শেষ নির্দেশ।"

২য় পরিচ্ছেদ

চিরন্তন সত্য বুদ্ধ ও তাঁর মহিমা

১

বুদ্ধের করুণা ও তাঁর ব্রত

১। বুদ্ধ চিত্ত মানে মহামৈত্রী ও করুণায় পরিপূর্ণ। মহামৈত্রী চিত্ত মানে সর্বক্ষেত্রে সর্ব সময়ে জগতের সকল প্রাণীকে রক্ষা করা বা অভয় দান করার আকুল আগ্রহ। মহাকরুণা চিত্ত মানে মানুষের পীড়িত অবস্থায় পীড়িত হওয়ার বেদনা নিজের মধ্যেও অনুভব করা এবং মানুষের দুঃখের সময়ে দুঃখিত হওয়া।

বুদ্ধ বলেন, "তোমাদের দুঃখ মানে আমারই দুঃখ; তোমাদের সুখ মানে আমারই সুখ।" ইহা এরূপেও ভাবা যেতে পারে, "মা যেমন নিজের পুত্রকে সর্বদা ভালোবাসেন এবং পুত্রের প্রতি তাঁর এই চিত্ত এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলে থাকতে পারেন না।" চিত্তের এরূপ অবস্থাকে বুদ্ধের প্রকৃত মৈত্রী করুণা বলা যেতে পারে।

বুদ্ধের করুণাঘন চিত্ত মানুষের প্রয়োজনানুসারে তাদেরকে উদ্দীপিত করে থাকে। এই করুণাঘন চিত্তের প্রতি মানুষের বিশ্বাস, প্রেরণা হিসেবে দেখা দেয় এবং ঐ প্রেরণা তাদেরকে বোধিজ্ঞান লাভে সহায়তা দান করে। এরূপে মা যেমন তাঁর শিশুকে ভালোবেসে মাতৃত্ববোধ অনুধাবন করেন, তেমনি শিশুও এই ভালোবাসা হতে প্রেরণা লাভ করে নিজেকে নিরাপদ অনুভব করে।

অজ্ঞতা হতে সৃষ্ট মোহ ও তৃষ্ণার কারণে মানুষ দুঃখ ভোগ করে আসছে; যার দরুন মানুষ করুণাঘন বুদ্ধ চিত্ত বুঝতে অক্ষম। তারা নিজেদের বৈষয়িক চিন্তা দ্বারা সৃষ্ট কাজের ফল ভোগ করে থাকে এবং নিজের অকুশল কাজের ভারে মন ভারী হয়ে মোহের পাহাড় থেকে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায়।

চিরন্তনসত্য বুদ্ধ ও তাঁর মহিমা

২। বুদ্ধের করুণাঘন চিত্ত শুধু বর্তমান জীব জগতের জন্য নয় এবং ইহার কোন সুনির্দিষ্ট সময়সীমাও নাই। অজ্ঞতার কারণে মানুষ বিপথে ধাবিত হওয়ার দরুন, অনির্দিষ্ট কাল থেকে মানুষের প্রতি বুদ্ধের করুণাঘন চিত্তের উদ্ভব হয়েছে।

তাই চিরন্তনসত্য বুদ্ধ, সর্বদা মানুষের পূর্বেই এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে মানুষের সাথে পরম বন্ধুত্ব সুলভ অবস্হানের মাধ্যমে মানুষকে ধার্মিক জীবন যাপনে সহযোগিতা করে আসছেন।

শাক্যমুণি বুদ্ধ রাজকুমার হিসেবে জন্মগ্রহণ করেও তিনি রাজবাড়ীর সকল আরাম আয়েশ ত্যাগ করে কঠোর তপস্যা ব্রত গ্রহণ করেন। নীরব ভাবনার মাধ্যমেই তিনি বোধিজ্ঞান অনুধাবন করেন। তারপর তিনি তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশ্যে এই জ্ঞান বিতরণ করেন, এবং শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর পার্থিব জীবন অবসানের কথাও ঘোষণা করেন।

বুদ্ধজ্ঞানের কোন পরিসমাপ্তি নেই। তেমনি মানুষের অজ্ঞতারও কোন শেষ নেই। অজ্ঞতার যেমন শেষ নেই তেমনি বুদ্ধের করুণারও কোন সীমা পরিসীমা নেই।

বুদ্ধ যখন এই পার্থিব জীবন অবসানের কথা ঘোষণা করলেন, তখন তিনি ৪টি সংকল্পের কথা প্রকাশ করলেন। যথা- ১। সমস্ত প্রাণীজগতকে রক্ষা করা ২। সমস্ত পার্থিব কামনা ও বাসনাকে সীমিত রেখে পরকল্যাণে ব্রতী হওয়া, ৩। সমস্ত শিক্ষা অধিগত করা এবং ৪। সম্যক সম্বোধি লাভ করা। এ সংকল্পগুলোই মৈত্রী ও করুণার ঘোষণা যা বুদ্ধত্ব লাভের জন্যে অপরিহার্য্য বিষয়।

৩। বুদ্ধ প্রথমেই নিজে শিক্ষা গ্রহণ করলেন যে, প্রাণী হত্যাজনিত পাপ কাজ থেকে বিরত থাকবেন এবং প্রার্থনা করলেন যে, দীর্ঘজীবনের কি মহিমা মানুষ তা জানুক।

বুদ্ধ চুরি করা জনিত পাপ কাজ থেকে বিরত হওয়ার জন্যে নিজেকে গড়ে

তুললেন। তিনি প্রার্থনা করলেন যে সকল প্রাণী তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পদশালী হউক।

বুদ্ধ ব্যভিচারজনিত পাপ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্যে নিজেকে গড়ে তুললেন। তিনি প্রার্থনা করলেন যে, মানুষ তাদের পবিত্রতা সম্পর্কে জানুক এবং তৃপ্তিহীন কামনা, বাসনা ও কষ্টভোগ না করুক।

বুদ্ধ নিজের ধারণাগত দিক থেকে সকল প্রকার শঠতা হতে মুক্ত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করলেন এবং এর ফলে তিনি প্রার্থনা করলেন যে, সকল মানুষ মানসিক প্রশান্তির কথা জানুক। যা সত্য কথা বলা থেকে অনুভব করা যায়।

তিনি শঠ কথা না বলার শিক্ষা গ্রহণ করলেন এবং প্রার্থনা করলেন যে, সকল মানুষ বন্ধুত্বের আনন্দ সম্পর্কে জানুক।

তিনি অপরকে অপবাদ না দেয়ার শিক্ষা গ্রহণ করলেন এবং প্রার্থনা করলেন যে, সকলের শান্ত মন থাকা প্রয়োজন যা অন্যকে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানে সাহায্য করে।

তিনি নিজেকে অমূলক কথাবার্তা বলা থেকে মুক্ত রাখলেন এবং প্রার্থনা করলেন যে, সকলে সমবেদনা মূলক অনুভূতি সম্পর্কে সম্যকভাবে অনুধাবন করুক।

বুদ্ধ লোভ থেকে মুক্ত থাকার জন্য শিক্ষা গ্রহণ করলেন এবং প্রার্থনা করলেন যে, লোভমুক্ত মন মানুষের মনে যে কতটুকু প্রশান্তি আনয়ন করতে পারে, মানুষ তা জানুক।

তিনি ক্রোধ চিত্ত ত্যাগ করলেন এবং প্রার্থনা করলেন যে; সকল প্রাণী একে অপরকে ভালোবাসুক।

তিনি অজ্ঞতা হতে মুক্তি লাভের শিক্ষা গ্রহণ করলেন এবং প্রার্থনা করলেন যে; সকল প্রাণী কার্য-কারণ নীতিকে অবজ্ঞা না করুক এবং কার্যকারণ নীতিকে

সম্যকভাবে উপলব্ধি করুক।

উল্লেখিত বর্ণনার মাঝে প্রাণী জগতের প্রতি বুদ্ধের করুণাচিত্তের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এবং তাদের শান্তিসুখের ব্যাপারে বুদ্ধের মনোভাবের প্রকাশ পেয়েছে। পিতা-মাতা যেভাবে ছেলে মেয়েদেরকে ভালোবাসে, বুদ্ধও সেভাবে মানুষকে ভালোবাসেন এবং তিনি প্রার্থনা করে থাকেন পৃথিবীর সকল প্রাণী জন্ম মৃত্যুর এই সমুদ্র থেকে মুক্তিলাভ করে পরম সুখে বসবাস করুক।

২

জীবজগতের মুক্তির জন্যে বুদ্ধের পথনির্দেশনা

১। মোহ ও আকাঙ্খার সংগ্রাম মুখর এই জীবজগতে বুদ্ধের গবেষণালব্ধ বাণীর আবেদন সৃষ্টি করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাই করুণাঘন বুদ্ধ নিজেই এই জগতে আবির্ভূত হয়েছেন এবং তিনি মুক্তির পথ প্রদর্শন করেছেন।

বুদ্ধ বললেন, "আমি তোমাদেরকে একটি নীতিগর্ভ রূপক কাহিনী শুনাব।" তা হলো, "একদা এক গ্রামে একজন ধনী ব্যক্তি বসবাস করতেন। একদিন তাঁর বাড়ীতে আগুন লেগেছিল। ধনী ব্যক্তিটি বাড়ীর বাহিরে কোন কাজে গিয়েছিলেন। হঠাৎ তিনি ফিরে এসে দেখলেন যে বাড়ীর ভিতরে তাঁর ছেলে মেয়েরা খেলায় নিবিষ্ট; আগুনের প্রতি তাদের কোন ভ্রুক্ষেপই নেই। এতে তিনি তীব্র আর্তনাদের সহিত ছেলেমেয়েদেরকে বাড়ীর ভেতর থেকে তাড়াতাড়ি বের হতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু ছেলে মেয়েরা তাঁর কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করলো না।"

উদ্বিগ্ন পিতা পুনঃ চিৎকার করে তাঁর ছেলে মেয়েদেরকে ডাকলেন এবং বললেন, "তোমাদের জন্যে আমার নিকট অনেক চমৎকার খেলনার সামগ্রী আছে, বাড়ী থেকে বের হয়ে আস এবং খেলনাগুলো নাও।" এতে ছেলে মেয়েরা আগুনে দগ্ধ ঘর হতে বের হয়ে আসলো।

চিরন্তনসত্য বুদ্ধ ও তাঁর মহিমা

এই পৃথিবীটাই হলো আগুনে প্রজ্জ্বলিত বাড়ী সদৃশ। মানুষেরা আগুনে দগ্ধ বাড়ীর মধ্যে অবস্থান করছে কিন্তু আগুনের প্রতি তাদের কোন ভ্রুক্ষেপই নেই। অথচ অসতর্কতার দরুন এই আগুনে দগ্ধ হয়ে মানুষ মৃত্যু মুখে পতিত হচ্ছে। তাই করুণাঘন বুদ্ধ এই অগ্নিদগ্ধ জীবজগতকে রক্ষার পথ আবিষ্কার করেছেন।

২। বুদ্ধ বললেন, "আমি তোমাদেরকে আরও একটি নীতিগর্ভ রূপ কাহিনী বলবো। একদা এক ধনী লোকের একমাত্র পুত্র তার পিতাকে ছেড়ে নিছক খেয়ালের বশে দূরে কোন এক স্থানে নিতান্ত গরীবের বেশে বসবাস করতো।"

"অনেক দিন পরে ধনী ব্যক্তিটি তার ছেলের খোঁজে বের হলো কিন্তু তার কোন হদিস পেলো না। সে তার সর্ব শক্তি নিয়োগ করেও ছেলের খোঁজ পেতে ব্যর্থ হলো।"

"বছর দশেক পরে ধনী লোকের ছেলেটি চরম দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে তার পিতার বাড়ীর পার্শ্বে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ঘুরাঘুরি করতে লাগলো।"

"পিতা তার পুত্রকে দেখা মাত্রই সনাক্ত করতে পেরেছিলো এবং জাঁকজমক পূর্ণ বাড়ী থেকে কর্মচারী পাঠিয়ে আগন্তুককে বাড়ীতে আসতে বললো; সে ঐ জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদটির অবস্থা দেখে আশ্চর্য হয়েছিল। এতে আগন্তুকটি আতঙ্কিত হলো এবং তারা প্রতারণা করছে ভেবে তাদের প্রতারণার হাত থেকে বাঁচার জন্যে বাড়ীতে যাবে না বললো। সে অনুভব করতে পারেনি যে ঐ প্রাসাদের মালিক স্বয়ং তার পিতা।"

"পিতা পুনঃ কিছু টাকা দিয়ে ছেলেকে ঐ বাড়ীর কর্মচারী হিসেবে নিয়োগের প্রস্তাব পাঠালেন। ছেলেটি এই বারে কর্মচারীদের প্রস্তাবে রাজী হলো এবং একজন কর্মচারী হিসেবে ঐ বাড়ীতে অবস্থান করতে শুরু করলো।"

"যতদিন পর্যন্ত বাড়ীর সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হিসেবে ছেলেকে দায়িত্ব দিতে না পারছে ততদিন পর্যন্ত পিতা ছেলেকে আস্তে আস্তে বুঝাতে শুরু

করলো। কিন্তু এতেও ছেলে তার পিতাকে নিজের পিতা হিসেবে চিনতে পারলো না।"

"পিতা তার পুত্রের বিশ্বস্ততায় খুশি হলেন এবং তার জীবনের শেষ পরিণতির দিন ঘনিয়ে আসার কারণে একদিন তার সকল আত্নীয় স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদেরকে ডেকে তার একমাত্র পুত্রকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললো, এখন থেকে আমার সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে সে।"

ছেলেটি তার পিতার এরূপ স্বীকৃতিতে অবাক হলো এবং বললো, "আমি শুধু আমার পিতাকে পেলাম না এখন থেকে সমস্ত সম্পত্তির মালিকও আমি।"

বুদ্ধ এ নীতিগর্ভ কল্প কাহিনীর মাধ্যমে ধনী হিসেবে বুদ্ধকে (চিরশ্বাশ্বতঃ বোধিজ্ঞানকে) উপস্হাপন করেছেন এবং উদ্দেশ্যবিহীন ভ্রমণকারী পুত্রকে এই জীবজগতের সাথে তুলনা করেছে। বুদ্ধের করুণা সমস্ত প্রাণী জগতের জন্যে; যা পিতা একমাত্র পুত্রের জন্যে করে থাকেন। পিতার ঐ ভালবাসায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়, যা শিক্ষা এবং উন্নতি সাধনের জন্যে অতীব মূল্যবান দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করে।

৩। বৃষ্টির জল যেমন সমস্ত উদ্ভিদের জন্যে, তেমনি বুদ্ধের করুণাও সকল জীবজগতের জন্যে। ইহার মধ্যে পার্থক্য শুধু এই উদ্ভিদজগত তাদের স্ব স্ব প্রয়োজনে জল গ্রহণ করে, আর জীবজগত তাদের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবে এবং পরিবেশে মহিমান্বিত হয় ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে।

৪। পিতা মাতারা তাঁদের সন্তানদেরকে সমভাবে ভালোবাসেন কিন্তু অসুস্হ দুর্বল সন্তানদের প্রতি তাঁদের বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ পায়।

এরূপে বুদ্ধের করুণাময় চিত্ত সবার জন্যে সমান, কিন্তু অবিদ্যার কারণে দুঃখভারাক্রান্ত মানুষের জন্যে বুদ্ধের বিশেষ মনোভাবও প্রকাশ পায়।

সূর্য পূর্বদিকে উদিত হয়ে সমস্ত পৃথিবী আলোকিত করে, এতে কোন অঞ্চল বিশেষের প্রতি তার পক্ষপাতের অবকাশ নেই। সেরূপ বুদ্ধের করুণাময় চিত্ত সকল প্রাণীকে পরিবেষ্টিত করে, তাদেরকে কুশল কাজে অনুপ্রাণিত করে এবং অকুশল কাজ থেকে বিরত থাকতে সহায়তা করে। এভাবে তিনি মানুষকে অবিদ্যার কালো ছায়া থেকে মুক্ত করে জ্ঞানের আলোর দিকে নিয়ে যায়।

বুদ্ধ তাঁর মৈত্রীর মধ্যে পিতার ন্যায় এবং করুণার মধ্যে মাতার ন্যায়। অবিদ্যা এবং পার্থিব আকাংখায় তাড়িত হয়ে মানুষ অত্যধিক ভাবাবেগে অনেক কিছুই করে বসে। বুদ্ধ নিজেও গভীর অনুভূতিপূর্ণ, কিন্তু তাঁর এই অনুভূতিতে কাজ করে সকল প্রাণীর প্রতি করুণাময় মনোভাব। প্রাণীজগত বুদ্ধের অপার করুণাময় চিত্তের কাছে ঋণী এবং অবশ্যই একদিন বুদ্ধ নির্দেশিত মুক্তি পথের যাত্রী তারা হবেনই; যেহেতু প্রাণীজগত তাঁর অনুসারী এবং তাঁর সন্তান/সন্ততি সদৃশ।

৩

চিরন্তনসত্য বুদ্ধ

১। সাধারণ জনগণ বিশ্বাস করে যে, বুদ্ধ একজন রাজপুত্র হিসেবে কিভাবে বোধিজ্ঞান অর্জন করা যায়, তা শিক্ষা করেছিলেন। আসলে বুদ্ধ সর্বদাই এই পৃথিবীতে অবস্হান করছেন যাঁর কোন শুরু এবং শেষ নেই।

অবিনশ্বর বুদ্ধ হিসেবে, তিনি সবার নিকট পরিচিত এবং তিনি মানুষের মুক্তির পন্হা হিসেবে সকল প্রকার পদ্ধতির ব্যবহার করেছেন।

বুদ্ধের অবিনশ্বর ধর্ম শিক্ষার মধ্যে কোন প্রকার ভুল ভ্রান্তি নেই। তিনি পার্থিব জগতের সমস্ত কিছু সম্পর্কে জানেন এবং ঐ শিক্ষা তিনি সবাইকে দিয়ে থাকেন।

এই পৃথিবীর প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করাটা সত্যিই কষ্টকর। যা সত্য বলে মনে হয় তা সত্য নয়; আর যা মিথ্যা বলে মনে হয় তা মিথ্যা নয়। অনভিজ্ঞ বা সাধারণ

চিরন্তনসত্য বুদ্ধ ও তাঁর মহিমা

মানুষ এ পৃথিবীর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে বুঝতে পারে না। একমাত্র বুদ্ধই এই পৃথিবীর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে পুরোপুরি বুঝতে সক্ষম। তাই তিনি এর স্বরূপ সম্পর্কে সত্য, মিথ্যা, ভালো, মন্দ ইত্যাদি মন্তব্য করেন না। তিনি সহজ ভাষায় এই পৃথিবীর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন।

বুদ্ধ যা শিক্ষা দিয়েছেন তা হলো এরূপ, সকল প্রাণী তাদের স্ব স্ব স্বভাব, কাজ এবং বিশ্বাসের মাধ্যমে কুশল কর্মের মূল অনুশীলন করা প্রয়োজন। এই শিক্ষা পৃথিবীর সকল প্রকার হাঁ সূচক এবং না সূচক মন্তব্যকে অতিক্রম করেছে।

২। বুদ্ধের শিক্ষা শুধুমাত্র বাক্যের মাধ্যমে নয়, তাঁর শরীরের মাধ্যমেও শিক্ষা দিয়েছেন। যদিও বুদ্ধের জীবন (বোধিময় জীবনাদর্শ) অবিনশ্বর তবুও প্রবল ভোগাকাংখীদের জন্য তাঁর মৃত্যু জাগতিক পরিণতির একটি কৌশল মাত্র।

এক সময় এক চিকিৎসক কোন কাজে বাড়ি থেকে বাইরে গিয়েছিলেন। তখন তাঁর ছেলে/মেয়েরা ঘটনাক্রমে বিষাক্ত ঔষধ সেবনে অসুস্থ হয়ে পড়লো। যখন তিনি ফিরে আসলেন তখন তাদের অসুস্থতা লক্ষ্য করলেন এবং তাদের জন্যে প্রতিষেধক তৈরী করলেন।

তাদের মধ্যে কেহ কেহ অল্প অসুস্থতার জন্যে প্রতিষেধক সেবন করে আরোগ্য লাভ করলো, এবং কেহ কেহ বেশী অসুস্থতার জন্যে প্রতিষেধক সেবন হতে বিরত থাকলো।

চিকিৎসক তার অগাধ পৈতৃক ভালোবাসার কারণে তাঁর অসুস্থ ছেলে মেয়েদেরকে আরোগ্য লাভের জন্য এক আশ্চর্য্যজনক উপায় উদ্ভাবন করলেন। তিনি তাদেরকে বললেন, "আমাকে অনেক দূরে ভ্রমণে যেতে হবে। আমি বয়োঃপ্রাপ্ত হয়েছি এবং একদিন মৃত্যু মুখে পতিত হবো। যদি আমি তোমাদের পাশে থাকতে পারতাম তাহলে তোমাদের সেবা যত্ন করতে পারতাম, কিন্তু দূরে যদি আমার মৃত্যু হয় তাহলে তোমাদের অবস্থা ক্রমান্বয়ে খারাপ হবে। তাই তোমরা যদি শুন যে, আমি মৃত্যুবরণ করেছি, তাহলে তোমাদের কাছে আমার

সনির্বন্ধ অনুরোধ, এই প্রতিষেধকগুলো সেবন করিও এবং বিষাক্রান্ত অসুস্হতা থেকে সুস্হতা লাভ করিও। তারপর চিকিৎসক অনেক দূরে ভ্রমণে বের হলেন এবং একদিন তিনি খবর পাঠালেন যে তিনি আর এই ধরাধামে বেঁচে নেই। পিতার এই দুঃসংবাদ পেয়ে ছেলে/মেয়েরা অত্যন্ত কষ্ট পেলো এবং বুঝতে পারলো যে তারা আর পিতার সহযোগিতা লাভ করতে পারবে না। অবশেষে পিতার শেষ অনুরোধের কথা দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে স্মরণ করলো এবং প্রতিষেধক সেবন করে আরোগ্য লাভ করলো।

চিকিৎসক পিতার এই সিদ্ধান্তকে মানুষের দোষারোপ করা উচিৎ নয়। বুদ্ধও ঐ পিতার ন্যায়। তিনিও যারা প্রবল তৃষ্ণার বন্ধনে আবদ্ধ তাদেরকে রক্ষার জন্যে জন্ম মৃত্যুর এই কাহিনীকে ব্যবহার করেছেন।

৩য় পরিচ্ছেদ

বুদ্ধের প্রকৃতি ও গুণাবলী

১

বুদ্ধের শরীরের ৩ প্রকার লক্ষণ

১। বুদ্ধকে উপলব্ধি করার জন্যে তাঁর দৈহিক অবয়ব এবং জাগতিক গুণাবলী সন্ধান করার প্রয়োজন নেই। দৈহিক অবয়ব অথবা জাগতিক গুণাবলী কোনটিই প্রকৃত বুদ্ধ নহে। শাশ্বতঃ বুদ্ধ হলেন সর্বজ্ঞতাজ্ঞান (চারি আর্য সত্য জ্ঞান)। প্রকৃত বুদ্ধকে জানতে হলে তাই সর্বজ্ঞতাজ্ঞানের সাধনা করতে হবে।

যদি কেহ বুদ্ধের পরম উৎকৃষ্ট দৈহিক অবয়ব দেখে মনে করে যে সে বুদ্ধকে দর্শন করেছে ; ইহা হবে তার ভুল চোখে দেখা। প্রকৃত বুদ্ধ অবয়ব দ্বারা বুঝা যায় না। বুদ্ধের গুণাবলীর জাগতিক বর্ণনার দ্বারাও তাঁকে বুঝা যায় না। বাহ্যিক জগতের ভাষায় তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করাও সম্ভব নহে।

যদিও আমরা বুদ্ধের অবয়বের ব্যাপারে কথা বলি। আসলে শাশ্বত বুদ্ধের কোন অবয়ব নেই। কিন্তু যে কোন অবয়বের মাধ্যমে আমরা তাঁকে প্রতীয়মান করতে পারি। যদিও আমরা তাঁর গুণাবলীর কথা বর্ণনা করি, আসলে শ্বাশ্বত বুদ্ধ কোন গুণাবলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কিন্তু তাঁকে পৃথিবীর যে কোন সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণাবলীতে শোভিত করা যায়।

সুতরাং যদি কেহ সাধারণ মানুষের চেয়ে স্বতন্ত্রভাবে বুদ্ধের অবয়বকে দর্শন করেন, স্বতন্ত্রভাবে তাঁর গুণাবলীকে অনুধাবন করেন, যদি সে বুদ্ধের অবয়ব ও গুণাবলীতে আসক্তিপরায়ণ না হন; তাহলে তিনি বুদ্ধকে দেখার ও বুঝার ক্ষমতা অর্জন করবেন।

২। বুদ্ধের মনটাই সর্বজ্ঞতাজ্ঞানে পরিপূর্ণ। এর কোন দৈহিক অবয়ব এবং বস্তুগত অস্তিত্ব নেই। তাই ইহা সর্বদা সর্বজ্ঞতার স্বরূপে স্হিতিশীল আছে এবং থাকবে। ইহা এমন কোন শারীরিক অবকাঠামো নয় যে খাদ্যের মাধ্যমে সংরক্ষন করতে হবে। ইহা এমন একটি শাশ্বত দেহ যার অবয়ব বোধি চিত্ত তথা জ্ঞান দ্বারা গঠিত। তাই এই ধর্মে কায়িক বুদ্ধের কোন ভয় নেই এবং রোগ নেই; তিনি শাশ্বত অবিনশ্বর।

অতএব, সর্বজ্ঞতাজ্ঞান অর্জিত হলে বুদ্ধ কখনও অর্ন্তধান হন না। সর্বজ্ঞতাজ্ঞান প্রজ্ঞার আলোর ন্যায় আগমন করে এবং তা প্রাণীজগতকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নতুন জীবনের পথনির্দেশনা দিয়ে থাকে। প্রজ্ঞার আলো, প্রাণীজগতকে বুদ্ধের জ্ঞানজগতে প্রবেশ করার জন্য অনুপ্রেরণা দান করে।

এই জ্ঞান যাঁদের মধ্যে উদয় হয় তাঁরাই বুদ্ধপুত্র হিসেবে পরিচিত হন এবং তাঁরা বুদ্ধের ধর্মকে রক্ষা করেন, সম্মান করেন, পরিশেষে ধর্ম তাঁদের দ্বাররক্ষী হিসেবে কাজ করে। বুদ্ধের শক্তির চেয়ে বিস্ময়কর শক্তি আর কিছুই নেই।

৩। বুদ্ধের শরীর তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশকে বলে ধর্মকায়া, দ্বিতীয় অংশকে বলে সম্ভাবনাময় কায়া বা সম্ভোগা কায়া এবং তৃতীয় অংশকে বলে নির্মিত কায়া।

ধর্মের অস্তিত্ব নিহিত রয়েছে এমন কায়াকে ধর্মকায়া বলা হয়। ইহার মধ্যে সত্যেরও অস্তিত্ব রয়েছে। সত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে বুদ্ধের কোন স্বরূপ অথবা রং নেই। স্বরূপ এবং রং না থাকার দরুন বুদ্ধের আগমন এবং প্রস্হানের স্হানও নেই। নীল আকাশের ন্যায় বুদ্ধ (জ্ঞান) সব জায়গায় অবস্হান করছেন, তাঁর অস্তিত্ব নেই এমন কোন স্হান নেই।

সাধারণ মানুষেরা মনে করে যে বুদ্ধের দৈহিক অস্তিত্ব বিদ্যমান কিন্তু আসলে অস্তিত্ব বিদ্যমান নয়। আবার মানুষেরা ভুলে যাওয়ার দরুন তিনি অন্তর্ধানও হন না। আসলে বুদ্ধের অস্তিত্বের এমন কোন অস্তিত্ব বা এর আগমন ও অন্তর্ধানের কল্পনা নিষ্প্রয়োজন। মানুষের সুখের সময়ে তার অস্তিত্বের কোন বাধ্যবাধকতা

নেই। আবার মানুষের অমনোযোগিতা এবং অলসতার দরুন অন্তর্ধানেরও কোন প্রয়োজন নেই। মানুষের সকল ধারণাকে তিনি অতিক্রম করেছেন।

সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে বুদ্ধের দৈহিক অস্তিত্ব দেখলে বলতে হবে তিনি সর্বস্হানে বিদ্যমান। তাঁর অস্তিত্ব সর্বকালের জন্যে। এমনকি বুদ্ধের প্রতি যাদের বিশ্বাস নেই অথবা তাঁর অস্তিত্বের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করে এমন লোকের জন্যেও।

৪। সম্ভাবনাময় কায়া বা সম্ভোগকায়া মানে যার মধ্যে করুণা এবং প্রজ্ঞা নিহিত রয়েছে কিন্তু তার মধ্যে কোন অবয়ব বা স্বরূপ দৃষ্ট হয় না। জন্ম মৃত্যুর প্রতীকের মাধ্যমে এবং প্রার্থনা ও বুদ্ধের পবিত্র নাম স্মরণ করার মাধ্যমে দুঃখ যন্ত্রণাময় এই পৃথিবী থেকে মুক্তির উপায় লাভের প্রেরণা উৎপাদক সম্ভোগকায়া প্রতীয়মান হয়।

এই কায়ার সারমর্ম হলো করুণা এবং এই করুণার মাধ্যমে মুক্তিলাভের সমস্ত উপায়ই বুদ্ধ মুক্তিলাভী সবার জন্যে রেখে গেছেন। ইহা আগুনের ন্যায়। যদি কোন দাহ্যবস্তুতে একবার আগুন ধরিয়ে দেয়া হয় তাহলে তা জ্বালিয়ে নিঃশেষ না করা পর্যন্ত জ্বলতে থাকবে। এরূপে বুদ্ধের করুণা ও জীবজগতের পার্থিব আবেগজাত ভোগাকাঙ্খা যতদিন নিঃশেষ না হবে ততদিন পর্যন্ত জীবজগতের উদ্ধারে বিদ্যমান থাকবে। প্রবল বাতাস যেমন ধূলাবালিকে দূরে সরিয়ে দেয় তেমনি বুদ্ধের করুণা নামক বাতাস মানুষের দুঃখ নামক সমস্ত ধুলাবালিকে মুছিয়ে দেয়।

নির্মিত বা নির্মাণ কায়া মানে, বুদ্ধ নির্দেশিত সম্ভাবনাময় মুক্তি লাভের পথ। শত দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যে থেকেও সম্যক পথে উদ্যম প্রচেষ্টা দ্বারা নিজে উদ্ধার পাওয়া যে সম্ভব, এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শনের জন্যেই বোধিসত্ত্ব স্ব শরীরে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং বুদ্ধত্ব লাভের পর অমিত পারমি শক্তির অধিকারী হয়ে, জনগণকে বুদ্ধের স্বভাব, প্রকৃতি, ক্ষমতাসহ আনুসাঙ্গিক জন্ম, গৃহত্যাগ, বুদ্ধত্ব লাভ, ধর্ম প্রচার, রোগ, উপদ্রব, বার্ধক্য ও মৃত্যু লাভের মাধ্যমে দর্শন দিয়েছিলেন। অর্থাৎ জনগণের স্বাভাবিক জীবনের পথ প্রদর্শক হিসেবে বুদ্ধ নিজের শরীরকে অসুস্হতা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত উদাহরণ স্বরূপ ব্যবহার করেছেন।

বুদ্ধের দেহ আসলে একটি ধর্মকায়া কিন্তু মানুষের ভিন্ন স্বভাব প্রকৃতির জন্যে বুদ্ধের দেহও ভিন্নতা লাভ করেছে। যদিও সাধারণ মানুষের বোধগম্য হতে বুদ্ধের এই দেহে বিভিন্ন ইচ্ছা আকাংখার ভিন্নতা দেখা যায় তার পরেও ইহা মানুষের কর্ম এবং কর্মদক্ষতার প্রেরণা দানের জন্যেই সৃষ্ট। বাস্তবতার দিক থেকে দেখলে ধর্মের সত্যতার মধ্যেই বুদ্ধের সম্পর্ক রয়েছে।

যদিও উপরোক্তভাবে বুদ্ধের ৩ টি স্বরূপ দেখা যায় কিন্তু তাঁর মূল শিক্ষা ও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন; আর তা হলো সমস্ত জীবজগতকে রক্ষা করা।

যে কোন পরিস্থিতিতে বুদ্ধ তাঁর বিশুদ্ধতার মধ্যে সুস্পষ্ট।

তথাপি, এই সুস্পষ্টতা মানে বুদ্ধ নয়, কারণ বুদ্ধ কোন অবকাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বুদ্ধত্ব মানুষকে জ্ঞানের অধিকারী করে। সত্য ধর্ম অনুসন্ধানকারীর সম্মুখে বুদ্ধ স্বয়ং সত্যজ্ঞান উপলব্ধির মধ্য দিয়ে উপস্থিত হন।

২

বুদ্ধের আবির্ভাব

১। ইহা বাস্তব যে এই পৃথিবীতে বুদ্ধের উৎপত্তি বড়ই দুর্লভ। কিন্তু এখনো বুদ্ধের শাসন বিদ্যমান। তাই বোধিজ্ঞান অর্জন সম্ভব, যাবতীয় সন্দেহের জাল ছিন্ন করা সম্ভব, তৃষ্ণার মূল উৎপাটন সম্ভব, অকুশল ধর্ম উৎপন্নের সমস্ত ছিদ্র ও বন্ধ করা সম্ভব। সম্পূর্ণ রূপে অনাবৃত অবস্থায় বুদ্ধ এখনো এই পৃথিবী প্রদক্ষিন করছেন। এই পৃথিবীতে বুদ্ধ ব্যতীত শ্রদ্ধার দ্বিতীয় কেহই নেই।

দুঃখ যন্ত্রণায় ভারাক্রান্ত পৃথিবীতেই বুদ্ধ আবির্ভূত হন। কারণ তিনি দুঃখ ক্লিষ্টকে পরিত্যাগ করতে পারেন না। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য মুক্তির বাণী বা ধর্ম প্রচার এবং সত্য ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে মানুষকে উপকৃত করা।

বুদ্ধের প্রকৃতি ও গুণাবলী

মিথ্যা ও অবিচারে পরিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মের প্রচার সত্যিই কঠিন। মানুষ যেখানে অসাচ্ছন্দ্য ও অতৃপ্ত কামনা পরিপূরনের অর্থহীন সংগ্রামে রত, সেখানেও ধর্মের প্রচার বড়ই কঠিন। বুদ্ধ নিজেও এ কঠিন বাস্তবতার মুখামুখি হয়েছিলেন। তাঁর মহামৈত্রী ও করুণার মাধ্যমে তা তিনি অতিক্রম করেছেন।

২। বুদ্ধ সকলের জন্যে একজন সর্ব্বোত্তম বন্ধু। যদি কেহ এই পৃথিবীর জাগতিক মহা দুঃখে কালাতিপাত করতে দেখেন, তাহলে বুদ্ধ তার পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়ান এবং করুণার মাধ্যমে তার দুঃখের ভার লাঘবে ব্রতী হন। যদি কেহ মোহের অন্ধকারে সঠিক পথ খুঁজে না পায়, তাহলে তিনি তাকে জ্ঞানের আলোর মাধ্যমে মোহ হতে মুক্তি লাভে সহায়তা করেন।

গরুর বাছুর যেমন তার মায়ের সাথে থেকে আনন্দ উপলব্ধি করে, তেমনি বুদ্ধের শিক্ষা যারা গ্রহণ করে তারাও শত প্রতিকুল পরিস্হিতিতে বুদ্ধের সান্নিধ্য পরিত্যাগ করতে পারে না; কারণ বুদ্ধের শিক্ষা তাদের জীবনে সেই আকর্ষণীয় সুখ শান্তি বয়ে আনে।

৩। যখন চন্দ্র অস্ত যায় তখন মানুষেরা বলে, চন্দ্র অস্ত গমন করেছে; আবার যখন চন্দ্র উদিত হয়, তখন সবাই বলে, চন্দ্র উদিত হয়েছে। আসলে চন্দ্র অস্ত গমনও করেনি এবং উদিতও হয়নি, চন্দ্র এই পৃথিবীর কক্ষপথে ওভাবে ঘুরপাক দিচ্ছে। কিন্তু সদা সর্বদা আকাশকে এই চন্দ্র আলোকিতই করে যাচ্ছে। বুদ্ধেরও ঠিক একই রূপ; তিনি আবির্ভূতও হননি আবার অর্ন্তধানও হননি। তিনি তাঁর মহামৈত্রী করুণার মাধ্যমে যে শিক্ষা মানুষকে দিয়ে গেছেন সেখানেই তিনি আবির্ভূত এবং অন্তর্ধান হচ্ছেন; মানুষ বুদ্ধের শিক্ষা অনুশীলন করলে বুদ্ধের আবির্ভাব হয়; এবং অনুশীলন না করলে বুদ্ধের তিরোধান হয়।

সাধারণ লোকেরা চন্দ্রের একটি পর্যায়কে পূর্ণচন্দ্র, আবার অন্য একটি পর্যায়কে অর্ধচন্দ্র হিসেবে বলে থাকে। কিন্তু বাস্তবতার দিক থেকে চন্দ্র সবসময় এক এবং গোলাকার; ইহা বৃদ্ধিও পাচ্ছে না; আবার ক্ষয়প্রাপ্তও হচ্ছে না। বুদ্ধও বিশেষ ক্ষেত্রে চন্দ্রের ন্যায়। মানব চোখে বুদ্ধ পরিবর্তিত হয়ে পুনঃ আবির্ভূত হচ্ছেন বলে ধারণা

করা হয়, কিন্তু আসলে বুদ্ধের কোন পরিবর্তন নেই; তিনি বিমুক্তি মার্গ প্রভাস্বর জ্ঞানাধার রূপে শাশ্বত ও চিরন্তন।

চন্দ্র ঝামেলাপূর্ণ শহর, নিদ্রিত গ্রাম, পাহাড় ও নদী সব জায়গায় আলোকিত করে। চন্দ্রকে পুকুরের গভীরে, জগের পানির ভেতরে, শিশির বিন্দুর ভেতরে এবং হেলানো পাতার মধ্যেও দেখা যায়। যদি কেহ ১০০ মাইল হাঁটে, চন্দ্রও তার সাথে সাথে থাকবে। সাধারণত মানুষেরা মনে করতে পারে, চন্দ্রের স্থান পরিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু আসলে তা নয়। বুদ্ধও চন্দ্রের ন্যায় অপরিবর্তিত; কিন্তু মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, এবং বাহ্যিক রূপের স্পষ্টতঃ পরিবর্তন হচ্ছে। সত্য কথা হলো, বুদ্ধ তাঁর শিক্ষার সারতত্ত্বের মধ্যে অবস্থান করছেন; সেখানেই তিনি শাশ্বত এবং চিরন্তন।

৪। বুদ্ধের উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি কার্য-কারণ সম্বন্ধের দ্বারা বর্ণনা করা যেতে পারে। যেমন- যখন কারণ এবং শর্তগুলো অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করে তখন বুদ্ধের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। আবার যখন কারণ এবং শর্তগুলো প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে তখন এই পৃথিবীতে বুদ্ধের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না।

বুদ্ধের উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি দুটি থাকলেও বুদ্ধাংকুর সর্বদা একই অবস্থায় থাকে। বুদ্ধ শিক্ষার এই মূল উপাদানগুলো জেনে, বুদ্ধত্ব প্রার্থীগণকে মুক্তির বাহ্যিক পরিবর্তন, পৃথিবীর পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনও মানুষের অস্থির চিন্তা ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে বোধি লাভে এবং প্রকৃত প্রজ্ঞা লাভে সচেষ্ট হতে হবে।

পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে বুদ্ধ মানে তাঁর শারিরীক অবয়ব নয়, জ্ঞান বা বোধিকেই বুঝতে হবে। আমরা শারীরিক অবয়বকে কিছু রাখার পাত্র হিসেবে ধারণা করতে পারি। যখন ঐ পাত্র বোধি বা জ্ঞান দ্বারা পরিপূর্ণ হয় তখন তাকে বুদ্ধ বলা যেতে পারে। সুতরাং কেহ যদি বুদ্ধের শারীরিক অবয়বের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে এবং তার অনুপস্থিতিতে কান্না কাটি করে, তার পক্ষে প্রকৃত বুদ্ধকে দর্শন করা সম্ভব নয়।

বাস্তবতার দিক থেকে দেখলে সমস্ত বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ ভালো-মন্দ, আসা-যাওয়া, এবং দৃশ্য-অদৃশ্যের উর্দ্ধে অবস্থান করছে। সমস্ত পার্থিব বস্তু অসার এবং সম্পূর্ণ

বুদ্ধের প্রকৃতি ও গুণাবলী

এক ও অভিন্ন।

ভ্রান্ত ধারণা বশে যাদের দ্বারা বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ দর্শন হয় না তাদের কারণেই এই প্রভেদদৃষ্টি সৃষ্টি হয়। তাই বুদ্ধের প্রকৃত অবয়বে প্রতীয়মান ও অপ্রতীয়মান কোনটিই লক্ষ্য করা যায় না।

৩

বুদ্ধের গুণাবলী

১। পাঁচটি গুণাবলীর দ্বারা বুদ্ধ এ বিশ্বব্রম্মাণ্ডের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে আছেন। এগুলো হলো ঃ ১) উচ্চতর মার্গের পথ প্রদর্শক; ২) উচ্চতর দৃষ্টি সম্পন্ন; ৩) সর্বজ্ঞতাজ্ঞান; ৪) উচ্চতর দেশক ও ৫) বুদ্ধের শিক্ষা ও অনুশীলনের দিকে মানুষকে ধাবিত করার আশ্চর্য্য ক্ষমতা।

এছাড়া আরও ৮টি গুণাবলী আছে যা বুদ্ধগণ প্রাণী জগতের সুখ শান্তি কামনায় প্রয়োগ করতে পারেন। এগুলো হলো ঃ ১) বুদ্ধের শিক্ষা অনুশীলনের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক এই পার্থিব জগতের উপকার সাধনের ক্ষমতা; ২) কুশল ও অকুশলের প্রকৃত স্বরূপ জানার ক্ষমতা; ৩) প্রাণী জগতের সর্বজ্ঞতাজ্ঞান লাভের জন্যে সঠিক পথ নির্দেশনার ক্ষমতা; ৪) সকলকে একই পথে পরিচালনা করার ক্ষমতা; ৫) অহংকার এবং দাম্ভিকতা পরিত্যাগ করার ক্ষমতা; ৬) বুদ্ধ দ্বারা যা ভাষিত হয়েছে তা পালন করার ক্ষমতা; ৭) তিনি যা করেছেন তা প্রকাশ করার ক্ষমতা এবং ৮) তিনি যা বলেছেন তা চর্চা করার ক্ষমতা। এই শর্তগুলো পরিপূর্ণ করার মাধ্যমে তাঁর করুণাঘন চিত্তের আশীর্বাদ পুষ্ট হওয়া যায়।

আবার ভগবান বুদ্ধ, ভাবনার মাধ্যমে আপন চিত্তকে তিনি সতেজ রেখে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা চিত্তের মাধ্যমে প্রাণী জগতকে উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত করেছেন। তিনি প্রাণী জগতের সকলের সাথে সমান ভাবে সম্পর্ক রাখেন, এবং তাদেরকে পাপমুক্ত চিত্ত তৈরী করতে সহযোগিতা করেন। তিনি

প্রাণী জগতের সকলের সমভাবে সুখময় জীবন কামনা করেন।

২। বুদ্ধ জগতের সকলেরই পিতা মাতা সদৃশ। শিশুর জন্মের ১৬ মাস পরে পিতা-মাতা খুবই সহজ সরল শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে আপন শিশুর সাথে কথা বলে। অতঃপর ধীরে ধীরে প্রাপ্ত বয়স্কদের ন্যায় কথা বলার শিক্ষা দিয়ে থাকে। এই বিশ্বব্রম্মাণ্ডের হিতকামী কর্তা হিসেবে বুদ্ধ তাই সর্বপ্রথমে পিতা মাতার চিত্তে সবার যত্ন নিয়ে থাকেন এবং পরে নিজেকে নিজে যত্ন নেয়ার জন্যে ছেড়ে দেন। তিনি প্রথমে মানুষকে নিজের ইচ্ছার উপরে ছেড়ে দেন সে ব্যক্তির আপন বিচার বুদ্ধির পরিমাণ নির্ণয়ে; পরে তাদেরকে শান্ত এবং নিরাপদ স্হানে নিয়ে আসেন।

বুদ্ধ নিজের ভাষায় যা বর্ণনা করেন না কেন, তা যদি বুঝতে কষ্ট হয় তাহলে জনসাধারণ নিজেদের মধ্যে সহজ ভাবে বুঝতে পারে এরূপ ভাষার মাধ্যমে তা প্রকাশ করার চেষ্টা করেন অসংখ্য উপমা, গল্প, রূপকথার মাধ্যমে।

বুদ্ধের চিত্তজগত মানুষের চিত্তজগত থেকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট; এর পরিপূর্ণ স্বরূপ আমাদের সাধারণ বর্ণনায় প্রকাশ করা অসম্ভব। তবে নীতিগর্ভ রূপক কাহিনীর মাধ্যমে তার ধারণা দেয়া যায় মাত্র।

গঙ্গার পানি ঘোড়া ও হাতির পায়ের দ্বারা ঘোলাটে হয়ে যায়। মাছের ও কাছিমের নড়া চড়ার দ্বারাও ঘোলাটে হয়ে যায়; কিন্তু তবুও নদীর জল প্রবাহিত হচ্ছে স্বচ্ছতার সাথে কারও বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ না করে। ঠিক সেরূপে বুদ্ধও একটি মহা নদী সদৃশ। মাছ এবং কাছিম পানির গভীরতার মাঝে সাতাঁর কাটে এবং স্রোতের বিপরীতে যাওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। কিন্তু মানব সমাজের কলুষিত প্রতিকুলতার সত্ত্বেও বুদ্ধের ধর্ম চির প্রবাহমান পুত পবিত্র এবং নিরুপদ্রব। এই ধর্ম আয়ত্বকরণের সামান্য চেষ্টাও তাই বৃথা যায় না; তা কর্মফলে পরিণত হয়।

৩। বুদ্ধের সর্বজ্ঞতাজ্ঞান সমস্ত সংস্কারকে ছিন্ন করেছে এবং ইহা বাস্তব সম্মত এক প্রকার জ্ঞান যা সাধারণ ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যেহেতু তিনি একজন সর্বজ্ঞ, সেহেতু তিনি সকলের ধ্যান ধারণা এবং অনুভূতি সহজেই অনুধাবন করতে সক্ষম।

বুদ্ধের প্রকৃতি ও গুণাবলী

স্বর্গীয় তারকারাজির আলোকচন্দ্রিমা যেমন প্রশান্ত সমুদ্রের মধ্যে প্রতিফলিত হয়, তদ্রুপ মানুষের চিন্তা ভাবনা, আচার-আচরণ, পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা বুদ্ধের প্রজ্ঞারূপ গভীর সমুদ্রের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। সে কারণেই বুদ্ধকে সর্বজ্ঞতাজ্ঞানের অধিকারী এবং সর্বজ্ঞ বলে সবাই জানেন।

বুদ্ধের প্রজ্ঞা, মানুষের অনুর্বর মনকে উর্বরতার দিকে ধাবিত করে এবং তাদেরকে প্রজ্ঞার আলোকে আলোকিত করে। এই পৃথিবীর গুরুত্ব, কার্যকারণ নীতি, উৎপত্তি এবং বিলয় সম্পর্কে ধারণা দিয়ে থাকে। সত্যিই বুদ্ধের প্রজ্ঞা ব্যতীত জনসাধারণ এই পৃথিবীকে সঠিকভাবে বুঝা কি সম্ভব ছিলো ?

৪। বুদ্ধ তাঁর বোধিজ্ঞান অর্জনের সাধনায় বোধিসত্ত্ব কালে সর্বদা বুদ্ধ হিসেবে প্রতীয়মান হন। সময়ে তিনি শয়তানের রূপ পরিগ্রহ করে আবির্ভূত হন; সময়ে তিনি মহিলা, দেবতা, রাজা, অথবা রাষ্ট্র পরিচালক হিসেবেও আবির্ভূত হন। আবার সময়ে তিনি বেশ্যালয় এবং জুয়ার আড্ডায়ও আবির্ভূত হন, এই সকল বিপথগামীদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে।

রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে তিনি রোগারোগ্যকর চিকিৎসক রূপে আবির্ভূত হন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে দুঃখ যন্ত্রণায় কাতর ব্যক্তিদের জন্যে তিনি করুণা প্রদর্শন করেন। এগুলো যারা বিশ্বাস করে তারা চির অমরত্ব লাভ করে। যারা দাম্ভিক ও আত্নবাদী, বুদ্ধ তাদের জন্যে অনিত্য বা অচিরস্থায়ী বা পরিবর্তনশীলতার শিক্ষা দিয়ে থাকেন। পৃথিবীর এই মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে যারা পার্থিব আনন্দ বোধ করছে তিনি তাদের জন্যে নম্রতা ও আত্নোৎসর্গের শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

বুদ্ধের কাজ হলো, সর্ব বিষয়ে এবং সকল সময়ে তাঁর প্রকৃত শিক্ষা (ধর্মস্কন্ধ) সকলকে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান করা। সুতরাং বুদ্ধের করুণা এবং মৈত্রীর জোয়ারে এই ধর্মস্কন্ধ হতে আবহমান কাল ধরে সীমাহীন আলো প্রজ্জ্বলিত হবে এবং ইহা মানব সমাজের মুক্তির সহায় হবে।

৫। এই পৃথিবী একটি জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ড সদৃশ প্রতিনিয়ত ধ্বংস প্রাপ্ত হচ্ছে এবং পুনরায় নির্মিত হচ্ছে। জনসাধারণ প্রতিনিয়ত নিজেদের অজ্ঞতার অন্ধকারে বিভ্রান্ত হচ্ছে। রাগজনিত কারণে তাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হচ্ছে, প্রতিহিংসাপরায়ণ হচ্ছে, কুসংস্কারপরায়ণ হচ্ছে এবং বৈষয়িক হয়ে উঠছে। শিশুর জন্যে যেমন মায়ের স্নেহের প্রয়োজন তদ্রুপ সবার জন্যে বুদ্ধের মৈত্রী ও করুণাময় ছায়ার প্রয়োজন।

বুদ্ধ হলেন এই ত্রিলোকের পিতা এবং সমগ্র প্রাণীজগত হলো তাঁর সন্তান সন্ততি। বুদ্ধ হলেন সকল পবিত্র ব্যক্তিদের পবিত্রতম। এই পৃথিবী আগুন ও মৃত্যুর ভারে জর্জরিত হয়ে ধ্বংসের শেষ অবস্থায় উপনীত হয়েছে। যেদিকে যায় না কেন সেদিকেই শুধু দুঃখের হাহাকার ধ্বনি শুনা যায়। কিন্তু সাধারণ মানুষ তা বুঝতে পারে না, তাই তারা বৃথা বৈষয়িক শান্তি সুখ অন্বেষণ করে।

বুদ্ধ দেখেছিলেন এই পৃথিবী একটি জ্বলন্ত অগ্নিপিন্ড সদৃশ। তাই তিনি সংসার ত্যাগ করে শান্ত সমাহিত অরণ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি তার মহাকরুণাভরা অন্তরে আমাদেরকে উদাত্ত আহ্বান করেছেনঃ "এই পৃথিবীর পরিবর্তন এবং দুঃখ কষ্টের কারণ আমি জেনেছি; তোমরা সবাই অবোধ এবং অমনোযোগী। আমিই একমাত্র তোমাদের দুঃখমুক্তির পথপ্রদর্শক।"

বুদ্ধ হলেন ধর্মরাজ। তিনি যেভাবে ইচ্ছা করেন সেভাবেই সকলকে ধর্মোপদেশ দিতে পারেন। এ পৃথিবীতে বুদ্ধের আগমন সকলের জন্যে আশীর্বাদ সদৃশ। জনগণের দুঃখমুক্তির জন্য তিনি ধর্মোপদেশ দিয়ে থাকেন কিন্তু স্থূল বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ লোভের দ্বারা প্রলোভিত হয়ে বুদ্ধের ঐ শিক্ষার প্রতি কর্ণপাত করে না।

যারা বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুনে এবং প্রতিপালন করার চেষ্টা করে, তাঁরা মোহ মুক্ত হয়ে দুঃখমুক্তি লাভ করে জীবন যাপন করেন। বুদ্ধ বলেন, "সাধারণলোক নিজেদের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে রক্ষিত হতে পারে না, কিন্তু যুক্তি সঙ্গত বিশ্বাসের মাধ্যমে তাঁরা আমার ধর্মে প্রবেশ করতে পারবে।" সুতরাং সকলকে বুদ্ধের শিক্ষা শ্রবণ

করতে হবে এবং ইহাকে সঠিকভাবে প্রতিপালন করতে হবে।

ধর্ম শিক্ষা

১ম পরিচ্ছেদ
কার্যকারণ সম্বন্ধ

১
চারি আর্য সত্য

১। এই বিশ্ব দুঃখে ভরপুর। যেমন জন্ম দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, বার্ধক্য দুঃখ, এবং মৃত্যু দুঃখ। একদা যাকে ঘৃণা করেছিল তার সাথে সাক্ষাত দুঃখ, প্রিয়জন হতে দূরে সরে যাওয়াটা দুঃখ, নিজের আত্মতুষ্টির জন্যে বৃথা কষ্ট সহ্য করাটা দুঃখ। সর্বোপরি মানুষ তৃষ্ণা ও আবেগ হতে মুক্ত নয়। তাই মানুষ সর্বদা নিদারুণ দুঃখ যন্ত্রণায় পতিত হয়। ইহাই দুঃখ সত্য।

মানুষের দুঃখ কষ্টের কারণ সন্দেহাতীতভাবে কায়িক ও মায়া মরীচিকাময় বৈষয়িক তৃষ্ণার মধ্যেই দেখা যায়। যদি তৃষ্ণা ও মায়া মরীচিকা তাদের উৎপত্তি স্হলের দিকে গমনাগমন করে তাহলে তাদেরকে কায়িক তৃষ্ণাজাত বলে ধরে নেয়া যায়। অতএব তৃষ্ণা তার প্রবল ইচ্ছা শক্তির উপর ভিত্তি করে বাঁচতে চায় এবং এই তৃষ্ণা তার পছন্দমত উপকরণ খোঁজ করে যদিও তা সময়ে মৃত্যুকেও আলিংগন করে। ইহাই দুঃখের কারণ সত্য।

যদি তৃষ্ণা যা বিশেষতঃ মানুষের কাম চিত্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকে, যদি তার মূল উৎপাটন করা যায় তাহলে তা সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং দুঃখের চির অবসান ঘটবে। ইহাই দুঃখ নিরোধ সত্য।

একটি নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হয়ে মানুষকে এমন এক স্তরে উপনীত হতে হবে যেখানে তৃষ্ণা নেই এবং এমনকি দুঃখও নেই। এই স্তরকে বৌদ্ধদের পরিভাষায় বলা হয় আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা পথ। এগুলো হলো ঃ ১) সম্যক দৃষ্টি, ২) সম্যক সংকল্প, ৩) সম্যক বাক্য, ৪) সম্যক ব্যায়াম, ৫) সম্যক আজীব ৬) সম্যক প্রচেষ্টা ৭) সম্যক

স্মৃতি ও ৮) সম্যক সমাধি। ইহাই দুঃখ মুক্তির একমাত্র পথ।

মানুষের উচিৎ এই সত্যগুলো পরিস্কারভাবে তাদের মানসপটে রক্ষা করা। এই পৃথিবী দুঃখে ভরা এবং যারা এই দুঃখ থেকে মুক্তিলাভের প্রত্যাশী তাদের জন্য এই সত্যগুলো অনুধাবন করা খুবই প্রয়োজন। তাদেরকে এই পৃথিবীর সমস্ত বৈষয়িক সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে যা দুঃখ কষ্টের একমাত্র কারণ। জীবন যাত্রা যা সমস্ত বৈষয়িক সম্পর্ক মুক্ত এবং সকল প্রকার দুঃখ মুক্ত তা একমাত্র সর্বজ্ঞতাজ্ঞানের মাধ্যমেই সম্ভব। আর এই সর্বজ্ঞতাজ্ঞান লাভ সম্ভব একমাত্র আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলনের মাধ্যমে।

২। যারা সর্বজ্ঞতাজ্ঞান লাভের প্রত্যাশী তাদের প্রয়োজন সর্বপ্রথম চারি আর্যসত্যকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করা। ইহা উপলব্ধি ছাড়া তারা সীমাহীন বিভ্রান্তিকর মায়া মরীচিকাময় জীবন যাপন করে থাকে। যারা এই আর্যসত্যকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে তাদেরকে ধর্মচক্ষু সম্পন্ন লোক হিসেবে ধারণা করা হয়।

অতএব, যারা বুদ্ধের শিক্ষাকে অনুশীলন করতে ইচ্ছুক তাদেরকে অবশ্যই চারি আর্যসত্যকে উপলব্ধি করার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে; এবং তাদেরকে ইহার সম্যক অর্থ পরিস্কারভাবে বুঝার চেষ্টা করতে হবে। সর্বকালে একজন সাধক যদি প্রকৃত সাধক হয়ে থাকে, তাহলে প্রথমে সে নিজেই সাধনার সম্যক অর্থ উপলব্ধি করবে এবং এর পরে অন্যকে তা শিক্ষা দেবে।

যখন একজন লোক সম্যকভাবে চারি আর্যসত্যকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে তখন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ তাকে লোভ থেকে মুক্ত হতে সহযোগিতা করবে। যদি কোন ব্যক্তি লোভ হতে মুক্তি লাভ করে তাহলে সে বৈষয়িক ব্যাপারে কলহ করবে না। সে প্রাণী হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, প্রতারণা, বিশ্বাসভঙ্গতা, চাটুকারীতা, ঈর্ষা ইত্যাদি হতে বিরত থাকবে। সে কখনও মানসিক ভারসাম্যতা হারাবে না; সে কখনও জীবনের নশ্বরতাকে ভুলে যাবে না এবং কখনও অযৌক্তিক কথা/বার্তা বলবে না।

৩। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গকে অনুসরণ করা মানে অন্ধকার ঘরে আলো হাতে নিয়ে প্রবেশ করার ন্যায়। আলো নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলে জমাট অন্ধকার ঘর থেকে পালিয়ে যাবে এবং পুরো ঘর আলোকিত হয়ে উঠবে।

মানুষের মধ্যে যারা আর্যসত্যের অর্থ উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গকে অনুসরণ করার কথা শিক্ষা করেছেন, তাঁরা প্রজ্ঞারূপ আলোর সন্ধান পেয়েছেন, যার দ্বারা অবিদ্যারূপ অন্ধকারকে তাঁরা ধ্বংস করতে সক্ষম।

বুদ্ধ মানুষের পথপ্রদর্শক সদৃশ। তিনি তাদেরকে সঠিকভাবে চারি আর্যসত্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেন। যাঁরা সম্যকভাবে ইহা উপলব্ধি করেন তাঁরা সর্বজ্ঞতাজ্ঞান লাভ করেন। তাঁরা অন্যজনকেও এই পৃথিবীর বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে পথপ্রদর্শক হয়ে সাহায্য করতে পারেন এবং তাঁরা পূত পবিত্র ও বিশ্বস্ত হতে পারেন। যখন সাধক এই চারি আর্যসত্যকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন তখন তিনি এই পৃথিবীর সমস্ত বৈষয়িক উপাদান হতে নিজেকে আলাদা করতে পারেন।

চারি আর্যসত্যকে সম্যকভাবে উপলব্ধির পর বুদ্ধের অনুসারীরা অন্যান্য সব আধ্যাত্মিক সত্যকে দর্শন করেন। তাঁরা প্রজ্ঞা এবং আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে সবকিছুর অর্থ অনুধাবন করতে সক্ষম এবং পৃথিবীর সবাইকে ধর্ম ভাষণ করার ক্ষমতা অর্জন করেন।

২

কার্যকারণ সম্বন্ধ

১। সকল মানুষের দুঃখ কষ্টের পিছনে কারণ আছে; আর এই দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তি লাভের পথও আছে। কারণ এই পৃথিবীর সমস্ত কিছুই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সংগঠিত সীমাহীন কার্য-কারণের ফল স্বরূপ। কার্য-কারণের পরিবর্তনের সাথে আবার ফলেরও পরিবর্তন এবং অবসান ঘটে।

কার্যকারণ সম্বন্ধ

বৃষ্টি পড়ে, বাতাস প্রবাহিত হয়, গাছ বড় হতে থাকে, গাছের পাতা পরিপক্কতা লাভ করে এবং ঝরে পড়ে। এই সব অবস্থা কার্য-কারণ নিয়মে একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত এবং এভাবে আবহমান কাল হতে চলে আসছে। আবার এই কার্য-কারণ নিয়মের পরিবর্তনের সাথে সাথে তাদের অবস্থারও পরিবর্তন এবং অবসান ঘটে।

এই দেহ পিতামাতার দ্বারা সৃষ্ট। আবার এই দেহ খাদ্যের মাধ্যমে যত্ন নেয়া হচ্ছে এবং ইহা শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পুষ্টি সাধিত হয়ে আসছে।

অতএব শরীর ও মন দু'টিই একে অন্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং অবস্থার পরিবর্তনে তাদেরও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

একটি জাল যেমন ধারাবাহিক সুতার গিঁটের মাধ্যমে তৈরী করা হয়, তদ্রুপ এই পৃথিবীর সমস্ত কিছুই ধারাবাহিক সুতার গিঁটে আবদ্ধ। যদি কেহ ধারণা করেন যে, জাল বুনানির ফাঁকগুলো এক একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র জিনিস; তাহলে তিনি ভুল করবেন।

ইহাকে জাল বলা হয় এই কারণে যে ইহা ধারাবাহিকভাবে বুনানির ফাঁকগুলোর মাধ্যমে একে অপরের সাথে সম্পর্ক যুক্তভাবে তৈরী করা হয়েছে; এবং প্রত্যেক ফাঁকের নির্দিষ্ট স্থান ও দায়িত্ব আছে যা এক ফাঁক অন্য ফাঁকের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

২। ফুলের কলি জন্মায় কারণ ইহা তার ধারাবাহিকতা, যা পরবর্তীতে প্রস্ফুটিত হয়। গাছের পাতা ঝরে পড়ে কারণ ইহাও তার ধারাবাহিকতা। পুষ্প কলি স্বাধীনভাবে জন্মায় না, তদ্রুপ গাছের পাতাও স্বাধীনভাবে ঝরে পড়ে না যখন পর্যন্ত তার সময় উপস্থিত না হয়। অতএব, এই পৃথিবীর সমস্ত কিছুই হঠাৎ করে স্বাধীন ভাবে জন্মও নেয় না এবং মৃত্যুও বরণ করে না। সমস্তই তার অবস্থার পরিবর্তনে পরিবর্তিত হচ্ছে মাত্র।

কার্যকারণ সম্বন্ধ

ইহাই পৃথিবীর চিরন্তন সত্য এবং অপরিবর্তনীয় নিয়ম যে, সমস্ত কিছুই ধারাবাহিক কার্য-কারণ নিয়মে সৃষ্টি হয়েছে এবং পুনঃ একই নিয়মে ধ্বংসও হবে। সব কিছুই পরিবর্তনশীল এবং কিছুই চিরদিন অবস্হান করবে না।

৩
প্রতিত্যুৎসমুদপাদ নীতি

১। মানুষের দুঃখ, শোক, বেদনা এবং নিদারুণ যন্ত্রণার উৎস কোথায় ? সচরাচর ইহা মানুষের ভোগ লালসার মধ্যে দেখা যায় কি না ?

দুর্দমনীয় ভাবে জীবন যাপনের জন্যে মানুষ সম্পদ ও সম্মান, আরাম-আয়েশ, আবেগ প্রবণ ও ভোগ পরায়ণতার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। উল্লেখিত বিষয়ের প্রতি অবিদ্যা জনিত কারণে আসক্ত হয়ে পড়াটাই মানুষের দুঃখ কষ্টের মূল কারণ।

ইহার শুরু থেকে পৃথিবী ক্রমান্বয়ে চরম দুর্দশায় পরিপূর্ণতা লাভ করে। ফলশ্রুতিতে অগ্রহণযোগ্য হলেও সত্য যে জ্বরা, বার্ধক্য ও মৃত্যুতে এ জগৎ যেন ভর্তি হয়ে গেলো।

কিন্তু কেহ যদি মনোযোগের সাথে এই সত্যগুলো বিশ্লেষণ করে তাহলে বুঝতে পারবে যে, সকল প্রকার দুঃখ কষ্টের মূলে প্রধান কারণ হিসেবে নিহিত রয়েছে তৃষ্ণা বা প্রবল আকাংখা। যদি লোভ লালসার এই তৃষ্ণা হতে মুক্ত হওয়া যায় তাহলে মানুষ দুঃখ কষ্ট হতে চিরতরে মুক্তি লাভ করতে পারবে।

লোভের মধ্যেই অবিদ্যা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যা মানুষের মনকে তৃপ্ত করে।

এই অবিদ্যা উৎপন্ন হয় মনের অসচেতনতার দরুন। আর এ অসচেতনতার দরুন বস্তুর ধারাবাহিক বিবর্তনের কারণও অজানা থেকে যায়।

কার্যকারণ সম্বন্ধ

অবিদ্যা ও লোভ হতে হঠাৎ অকুশল চিত্তের উৎপত্তি হয় এবং এতে বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বুঝা যায় না; কিন্তু মানুষ তারপরেও বিরামহীনভাবে এবং বেপরোয়াভাবে বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ খুজঁতে থাকে।

অবিদ্যা এবং লোভের কারণে মানুষ বৈষম্যমূলক আচরণ করে থাকে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সেখানে বৈষম্যের কোন স্থান নেই। জন্মগতভাবে মানুষের স্বভাবের মধ্যে কোন শুদ্ধ ও ভুলে এই বৈষম্য নেই; কিন্তু মানুষ অবিদ্যার কারণে, অনুমানের ভিত্তিতে শুদ্ধ ও ভুলের বৈশিষ্ট্য এবং স্বরূপ বিচার করে থাকে। অবিদ্যার কারণে তারা সর্বদা অকুশল চিন্তা করে থাকে এবং সর্বদা কুশল দৃষ্টি হতে দূরে সরে থাকে। তারা তাদের আত্মাবাদের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে; এতে তারা অকুশল কাজে নিয়োজিত হয়। এর ফলশ্রুতিতে তারা মোহের রাজ্যে অনুরক্ত হয়।

অহংবোধ মানুষের কর্ম সৃষ্টির ভূমি হিসেবে কাজ করে থাকে। মন বীজ হিসেবে বৈষম্যের কারণ হয়ে কাজ করে থাকে। অবিদ্যা দ্বারা মন আচ্ছাদিত হয়। এই মনকে উর্বর করে তৃষ্ণা রূপ বৃষ্টির জল। আর এই তৃষ্ণাকে ইন্ধন যোগায় আত্ম জাহির করার মত একগুয়েমি প্রবণতা। এগুলোর সাথে অকুশল যুক্ত হয় এবং এই অকুশল অবস্থা মোহ রূপে আবির্ভূত হয়ে অবস্থান করে।

২। সুতরাং বাস্তবতার দিক থেকে বলা যায়, নিজেদের মনই দুঃখ রূপ মোহ, অনুশোচনা, বেদনা এবং মৃত্যু যন্ত্রণার মূল কারণ।

মোহাচ্ছন্ন এই জগৎ কিছুই না; ইহা শুধু ছায়া স্বরূপ মনের মাধ্যমে বিভিন্ন কিছুর বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছে মাত্র। আবার সে একই মনের মাধ্যমে সর্বজ্ঞতাজ্ঞানও লাভ করা সম্ভব।

৩। এই পৃথিবীতে ৩টি ভুল ধারণা রয়েছে। যদি কেহ এই ভুল ধারণাগুলোর প্রতি আসক্ত পরায়ণ হয়ে পড়ে, তাহলে এই পৃথিবীর অন্যান্য সকল কিছুই তার সম্মুখে ভুল হিসেবে প্রতীয়মান হবে।

কার্যকারণ সম্বন্ধ

এই ভুল ধারণাগুলোর প্রথমটি হলো ঃ মানুষের সমস্ত কিছুই নিয়তির উপর নির্ভর; দ্বিতীয়টি হলো, এই পৃথিবীর সমস্ত কিছুই সৃষ্টি কর্তার দ্বারা সৃষ্ট এবং সমস্ত কিছুই তার ইচ্ছা শক্তির দ্বারা পরিচালিত এবং তৃতীয়টি হলো, সমস্ত কিছু কোন কার্য-কারণ ছাড়া সৌভাগ্যক্রমেই ঘটছে।

যদি সমস্ত কিছুই নিয়তির দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহলে ভাল কাজ এবং খারাপ কাজ করা দু'টিই পূর্বনির্ধারিত; সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্যও পূর্বনির্ধারিত; এমন কোন কিছুই সংগঠিত হতে পারে না, যা পূর্ব নির্ধারিত নয়। এরূপ হলে মানুষের উন্নতি ও অগ্রযাত্রার জন্যে গৃহীত সকল পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা অর্থহীন হয়ে পড়বে এবং মানব সমাজ আশাবিহীন হয়ে পড়বে।

অন্য দু'টি ভুল ধারণাও উল্লেখিতভাবে বুঝতে হবে। যদি সমস্ত কিছুই অদৃশ্য শক্তি বা অন্ধ ভাগ্যের উপর নির্ভর করতে হয়, তাহলে মানুষের আর কি অভিলাষ থাকতে পারে, শুধু মেনে নেয়া বাদে ? ইহা বিস্ময়ের কিছু নয় যে, যারা এই ভুল ধারণা নিয়ে অবস্থান করছে তারাও কিন্তু বাস্তবে আশাহীন এবং শ্রমবিমুখ নহে; তাদের দ্বারাও বিজ্ঞজনোচিৎ কাজ করা এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা সম্ভব হচ্ছে। কারণ, প্রয়োজনের বাস্তবতা তাদেরকে বাধ্য করছে।

অতএব উল্লেখিত ৩টি ধারণাই ভুল। সমস্ত কিছুই আনুক্রমিকভাবে হচ্ছে, যার উৎস হলো কার্য-কারণের সমষ্টি।

২য় পরিচ্ছেদ

মনস্তত্ত্ব ও বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ

১

অনিত্য ও অনাত্মা

১। যদিও শরীর ও মন উভয়ে যুক্ত কারণেই আবির্ভূত হয়, এর অর্থ এই নয় যে এখানে অহংবোধ কাজ করছে। এই মাংসপিন্ডবৎ শরীর, ধাতুর সমষ্টিমাত্র; সুতরাং ইহা অনিত্য।

যদি এই দেহ আমার আমিত্ব বোধের সমষ্টি হতো, তাহলে ইহা যা খুশী তাই করতে পারতো।

ধরুন, একজন রাজা তাঁর শক্তি বলে অন্যকে প্রশংসাও করতে পারেন, আবার শাস্তিও দিতে পারেন। কিন্তু সেই রাজাই আবার তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অসুস্হও হয়ে পড়েন, বার্ধক্যও হয়ে পড়েন, আবার মৃত্যুও বরণ করেন। দেখা যায় তাঁর ভাগ্য এবং আশা এই দু'ই খুব কমই পরিপূর্নতা লাভ করে।

এভাবে দেখলে বুঝা যাবে মনের মধ্যে কোন আমিত্ব বোধ নেই। মানুষের মন কার্য্য-কারণের সমষ্টি মাত্র। তাই ইহা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে।

যদি মন আমিত্ববোধের দ্বারা পরিচালিত হতো তাহলে তার ইচ্ছামত যা খুশী তাই করতো। কিন্তু মন অনবরত ভালো এবং মন্দের পেছনে পেছনে ঘুরছে। যদিও মনের ইচ্ছামত কিছুই ঘটছে না।

২। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে এই দেহ কি অবিনশ্বর নাকি নশ্বর, তাহলে সে অবশ্যই নীতিগতভাবে প্রত্যুত্তরে বলবে "নশ্বর"।

মনস্তত্ত্ব ও বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে নশ্বরতা কি সুখের না দুঃখের ? সাধারণত প্রত্যুত্তরে বলবে "দুঃখের" ।

যদি কেহ বিশ্বাস করে যে এই নশ্বরতা, পরিবর্তনশীলতা এবং দুঃখে পরিপূর্ণ পৃথিবীটাই স্থায়ী । এরূপ মনে করাটা মারাত্মক ভুল ।

মানুষের মনও নশ্বর এবং দুঃখে পরিপূর্ণ । এখানেও আমিত্ব নামের কিছুই নেই ।

আমাদের দেহ ও মন যা স্বতন্ত্র জীবন দ্বারা গঠিত, এবং যাকে ঘিরে আছে এই বাহ্যিক জগৎ, ইহা 'আমি' ও 'আমার' এই উভয় ধারণা হতে অনেক দূরে ।

খারাপ চিন্তা চেতনার মাধ্যমে স্বচ্ছ মনকে যেমন কলুষিত করা হয়, তদ্রুপ প্রজ্ঞার উৎপত্তিতে সকল বাঁধা মুক্ত হয় । একইভাবে, খারাপ চিন্তা চেতনার মাধ্যমে মনে একগুয়েমির ন্যায় 'আমি' ও 'আমার' নামক এই সকল ভাবেরও উদয় হয় ।

শুরু থেকেই এই দেহ ও তার চারিপার্শ্বের জিনিষগুলো কার্য্য-কারণ নীতির মাধ্যমে গঠিত এবং এগুলো প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে; যার কোন পরিসমাপ্তি নেই ।

মানবীয় মনের পরিবর্তন কোন সময়েও বন্ধ হবে না, ইহা নদীর পানির স্রোতের ন্যায় অথবা বাতির জ্বলন্ত অগ্নি শিখার ন্যায়, অথবা সারাক্ষণ লাফানো বানরের ন্যায়, যা এক মুহূর্তের জন্যেও স্থির থাকতে পারে না । একজন বিজ্ঞ ব্যক্তিকে এগুলো দেখে এবং শুনে শরীর অথবা মনের দ্বারা সৃষ্ট যে কোন আসক্তি থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা করা উচিৎ; যদি তিনি কোনদিন জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হন ।

৩। এই পৃথিবীতে ৫ প্রকার জিনিস আছে, যা এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণকারীরা কোন দিন কেহই অতিক্রম করতে পারেনি । এগুলো হলো ঃ প্রথমতঃ বার্ধক্য হতে মুক্তি লাভ; দ্বিতীয়তঃ শারীরিক অসুস্থতা থেকে চিরমুক্তি লাভ, তৃতীয়তঃ মৃত্যুর

হাত থেকে মুক্তি লাভ; চতুর্থতঃ ধ্বংসের হাত থেকে মুক্তি লাভ এবং পঞ্চমতঃ নিঃশেষিত অবস্হা থেকে মুক্তি লাভ।

সচরাচর মানুষ এগুলোর মাঝেই কালাতিপাত করছে এবং বেশীর ভাগ মানুষই পর্যায়ক্রমে দুঃখ ভোগ করে আসছে। কিন্তু যারা বুদ্ধের শিক্ষাকে বুঝেছে এবং চর্চা করছে তারা কষ্ট ভোগ করে না, কারণ তারা জানে এগুলোকে এড়ানো যায় না।

এই পৃথিবীতে চার প্রকার সত্য আছে। এগুলো হলো, প্রথমতঃ সমস্ত প্রাণী অজ্ঞানতা থেকে আবির্ভূত হয়েছে; দ্বিতীয়তঃ তৃষ্ণাজাত সমস্ত কিছুই অনিত্য, অনিশ্চিত এবং দুঃখ উৎপাদক; তৃতীয়তঃ এ পৃথিবীর সমস্ত জিনিসই অনিত্য, অনিশ্চিত এবং দুঃখদায়ক; চতুর্থতঃ এই পৃথিবীতে আমিত্ব বলতে কিছুই নেই এবং আমার বলতেও কিছুই নেই।

এই চারি প্রকার সত্যের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, এই পৃথিবীর সমস্ত কিছুই অনিত্য, ক্ষয়শীল এবং অনাত্মধর্মী; এতে বুদ্ধের উৎপত্তি অথবা অনুৎপত্তির কোন সম্পর্ক নেই। পৃথিবীতে এই চারি প্রকার সত্যের অবস্হান বিদ্যমান। বুদ্ধ এগুলোকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেছেন এবং সকলের জন্যে এই সত্য ধর্ম প্রচার করে গেছেন।

২

মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে

১। মোহ এবং সর্বজ্ঞতা দু'টিই মনের মধ্যে উৎপন্ন হয় এবং সমস্ত বস্তুর অস্তিত্বও মনের ক্রিয়ার দ্বারাই সৃষ্ট; যা যাদুকরের ডিগবাজীর ন্যায় বিভিন্ন আকার ধারণ করে।

মনের কার্যকলাপের কোন পরিসীমা নেই এবং মন আমাদের জীবনের পারিপার্শ্বিক অবয়বও তৈরী করে। অশোভন চিত্তের মাধ্যমে অশোভন কিছুর সৃষ্টি হয়; আবার শোভন বা সুন্দর চিত্তের মাধ্যমে সুন্দর কিছুর সৃষ্টি হয়। মনের

মনস্তত্ত্ব ও বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ

এই কার্য-কলাপের মধ্যে এবং পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে কোন সীমা পরিসীমা নেই।

যেমন একজন চিত্রকর একটি চিত্র অংকন করলো এবং এর চারিপার্শ্বে যা কিছু অংকিত হলো, তা তার মনের দ্বারাই সৃষ্ট। যদি বুদ্ধের দ্বারা চারি পার্শ্বে কোন কিছু সৃষ্ট হয়, তা হবে অনাবিল ও আসব মুক্ত। কিন্তু সাধারণ মানুষের দ্বারা সৃষ্ট বস্তু সেরূপ হয় না।

মন আপন চাতুর্য্যে বহুবিধ রূপ ধারণ করতে পারে, যেমন পারে একজন দক্ষ তুলিকার তার তুলির মাধ্যমে এই পৃথিবীর বিভিন্ন ছবি অংকন করতে। এই পৃথিবীতে এমন কিছুই নেই যা মনের দ্বারা সৃষ্ট হয়নি। ধরুন, একজন বুদ্ধও আমাদের মনের ন্যায়। সুতরাং এদিক থেকে জগতের সমস্ত প্রাণীই বুদ্ধ সদৃশ আমাদের মনেরই সৃষ্ট। অতএব, মন এবং প্রাণী জগতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, যদিও সমস্ত কিছুই যার যার গুনধর্ম বা কর্মানুসারেই সৃষ্ট।

পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর ধর্মতা ও গঠন প্রণালী এবং ইহার ধ্বংস, বুদ্ধ সম্যক দৃষ্টির মাধ্যমে জ্ঞাত হন। সুতরাং অন্য যারা এভাবে জ্ঞাত হবেন তারাই প্রকৃত বুদ্ধকে দর্শন করবেন।

২। কিন্তু মন তার চারিদিকে যা কিছু সৃষ্টি করছে তা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের স্মৃতি, ভয় ও অনুতাপ মুক্ত নয়। কারণ এগুলো অবিদ্যা এবং লালসা থেকে উৎপন্ন হচ্ছে।

এই অবিদ্যা এবং লালসা থেকে মোহ রাজ্যের সৃষ্টি এবং কার্য্য-কারণের সমস্ত জটিলতা মনের মাঝে স্হান দখল করে নেয়; যার ফলশ্রুতিতে আমাদের বর্তমান অবস্হান লক্ষ্য করা যায়।

জীবগণের জন্ম-মৃত্যু মনের মাধ্যমেই সৃষ্ট হয়; আবার তা মনের মাধ্যমেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। জন্ম-মৃত্যুর সাথে সম্পর্কিত মন যখন এগুলো থেকে আলাদা হয়ে যায় তখনই প্রাণীর চ্যুতি ঘটে।

জ্ঞানহীন জীবন থেকে যখন মনের উৎপত্তি ঘটে তখন ঐ মন নিজের স্বভাবজাত কারণে মোহ রাজ্যে বিভ্রান্তিকর অবস্থায় বিচরণ করে। যদি আমরা জ্ঞান অর্জন করতে পারি যে, মনের বাহিরে কোন মোহ রাজ্য নেই, তখনই এই বিচলিত মন শান্ত হবে। যেহেতু আমরা আমাদের চারিপার্শ্বের মোহ রাজ্য থেকে মুক্তি লাভ করবো; সেহেতু আমরা জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হবো।

এভাবেই মনের মাধ্যমে জন্ম-মৃত্যুর রাজ্য সৃষ্টি হয়েছে, যা মনের মধ্যে বন্ধিত, এবং মনের দ্বারা পরিচালিত; মন সমস্ত অবস্থায় প্রধান এবং পরিচালক। দুঃখ রাজ্য মোহ গ্রস্হ মনের দ্বারাই সৃষ্টি এবং আত্নপ্রকাশ করে।

৩। অতএব, সমস্ত কিছুই প্রাথমিকভাবে নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা এবং সৃষ্টি করে আসছে মন। ইহা গরুর গাড়ীর চাকার ন্যায়; গরুকে পিছনে পিছনে অনুসরণ করে। এরূপে দুঃখ ও দোষযুক্ত মনে যদি কেহ কিছু বলে এবং করে তা তাকে পিছনে পিছনে অনুসরণ করে।

কিন্তু কেহ যদি দোষবিহীন মনে কিছু বলে অথবা করে সুখ তাকে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করে। যদি কেহ খারাপ কিছু করে থাকে তাহলে তা তার মনে এই বলে জ্ঞাত হয় যে, "আমি খারাপ করেছি," এবং ইহা স্মৃতিতে ধারণ করে রাখা হয়, যা পরবর্তীতে ফল প্রদান করে থাকে। আবার যদি কেহ ভালো কিছু করে থাকে, তাহলে মনে এই বলে ধারণা করা হয় যে, "আমি ভালো করেছি," এবং মন ইহা স্মৃতিতে ধারণ করে রাখে, যা পরবর্তীতে সুখ প্রদান করে থাকে।

যদি দোষযুক্ত মন হয় তাহলে হোঁচট খেয়ে খেয়ে বিপদজনক পথ অতিক্রম করতে হবে এবং অনেক বার পদস্খলন হবে ও কষ্টভোগ করতে হবে। কিন্তু যদি মন দোষমুক্ত হয় তাহলে তার যাত্রা হবে খুবই আরামদায়ক এবং শান্তিময়।

যারা বুদ্ধাঙ্কুর হয়ে শরীর ও মনের বিশুদ্ধিতার মাধ্যমে জীবন যাপন করেন তাঁরা অহংবোধ, মিথ্যা দৃষ্টি এবং তৃষ্ণার জাল থেকে মুক্ত। যাঁর মন শান্ত-সমাহিত তিনি

দিবা-রাত্র বীর্যবন্ত হয়ে অবস্হান করেন।

৩
বস্তুর প্রকৃত অবস্হান বা স্বরূপ

১। এই পৃথিবী সৃষ্টির আদি কাল হতে সমস্ত বস্তু কার্য্য-কারণের দ্বারাই সৃষ্ট হয়েছে, যার সৃষ্টির পেছনে মৌলিক কোন পার্থক্য দেখা যায় না। মানুষের অযৌক্তিক ও পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই বাহ্যিক পার্থক্য দৃষ্টি গোচর হয়।

ধরুন, আকাশের মধ্যে পূর্ব-পশ্চিম বলে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু আমরা মানুষেরা নিজেদের সুবিধার্থে নিজের মনের মধ্যে এই পার্থক্যকরণ সৃষ্টি করেছি এবং তাকে চিরন্তন সত্য হিসেবে গ্রহণ করে আসছি।

গাণিতিক শাস্ত্রমতে ১ হতে অসংখ্য সংখ্যা এক একটি সম্পূর্ণ সংখ্যা, এবং এগুলো প্রত্যেকটিই কোন স্বতন্ত্র পরিমাণ বহন করে না। কিন্তু মানুষেরা নিজেদের সুবিধার জন্যে এগুলোকে শ্রেনীভেদ করছে এবং পরিমাণ নির্দেশক হিসেবে প্রকাশ করছে।

স্বাভাবিকভাবে জন্ম এবং মৃত্যুর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু মানুষেরাই একটিকে জন্ম এবং অন্যটিকে মৃত্যু বলে প্রভেদ করেছে। মূলত ভাল এবং মন্দ কাজের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। মানুষেরা নিজেদের সুবিধার জন্যে এগুলোকে চিহ্নিত করেছে মাত্র।

বুদ্ধের চিত্তে এগুলোর কোন পার্থক্য দেখা যায় না। উঁচু আকাশ থেকে পৃথিবীর দিকে তাকালে দেখা যায় মেঘ যেমন তার উপর দিয়ে ভেসে বেড়ায়; মনের এই প্রভেদকরণও ঠিক সেরূপ ভেসে বেড়াচ্ছে। বুদ্ধের কাছে সমস্ত কিছুই মায়া-মরীচিকাময়, তিনি জানেন যে, মনের মধ্যে যা কিছু উৎপন্ন হয় এবং বিলয় হয়, তা সমস্তই অনিত্য ও অসার। সুতরাং তিনি মরণফাঁদস্বরূপ ধারণা এবং প্রভেদ-

করণ দৃষ্টিভঙ্গি হতে মুক্ত।

২। মানুষেরা নিজেদের ধ্যান ধারণা মত বস্তুকে উপলব্ধি করে এবং প্রাচুর্য্য, মূল্যবান সম্পদ ও সম্মানকে আঁকড়ে ধরে। তারা দ্রুত ক্ষয়শীল এ জীবনকে জড়িয়ে ধরে থাকে।

তারা ইচ্ছামত স্থায়ী ও অস্থায়ী, ভাল ও মন্দ, সঠিক ও ভুল এর মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি করে। মানুষের জন্যে জীবন হলো পরম্পরা এবং আসক্তির ফসল স্বরূপ; যার দরুন তারা মায়ামরীচিকাময় দুঃখ ও বেদনার সম্মুখীন হয়।

একদা এক ব্যক্তি তার দীর্ঘ যাত্রা পথে একটি নদীর ধারে এসে পৌঁছালো। সে নিজেকে নিজে বললো, "নদীর এই পার হাঁটতে খুবই কষ্টকর এবং বিপদজনক, ওপার মনে হয় খুবই সহজ এবং নিরাপদ। কিন্তু কিভাবে আমি এই নদী পার হই?" পরে সে নদীতে ভাসমান খাগড়া দিয়ে ভেলা তৈরী করে নিরাপদে নদী পার হলো। তারপর সে ভাবলো, "এই ভেলা নদী পার হতে আমাকে খুবই সাহায্য করেছে, তাই আমি ইহা নদীর পাড়ে ফেলে যাব না, সাথেই নিয়ে যাব।" অতঃপর সে নিজে নিজেই অপ্রয়োজনীয় একটি সমস্যা বর্ধিত করলো। এমতাবস্থায়, ঐ লোকটিকে বিজ্ঞজন হিসেবে ধরা যায় কি?

এই নীতি কাহিনী শিক্ষা দেয়, যদিও ভালো জিনিস, যখন ইহার প্রয়োজনীয়তা নেই, তখন তা ত্যাগ করা উচিৎ। খারাপ কিছু হলে তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বর্জন করা উচিৎ। বুদ্ধ নিজের জীবনে ইহাকে নিয়ম হিসেবে গ্রহণ করেছেন, যাতে নিষ্ফল ও অপ্রয়োজনীয় আলোচনা সহসা ত্যাগ করা যায়।

৩। বস্তু নিজে কোন আসা যাওয়া করে না, এমনকি বস্তুর উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতিও নেই। সুতরাং কেহ কোন বস্তু লাভও করতে পারে না, আবার হারাতেও পারে না।

বুদ্ধের শিক্ষানুসারে বস্তুর উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি কোনটাই বিদ্যমান নয়;

মনস্তত্ত্ব ও বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ

যতক্ষণ পর্যন্ত বস্তুর এই 'হ্যাঁ' মূলক উপস্থিতি এবং 'না' মূলক অনুপস্থিতি এ দু'ই ধারণা অতিক্রম না করে। সুতরাং সমস্ত বস্তুর মধ্যে এই মিল দেখা যায় এবং ইহারা কার্য-কারণ নিয়মে বাঁধা। কোন বস্তু নিজে নিজে উৎপন্ন হতে পারে না। ইহাই বস্তুর অবিদ্যমানতা। আবার যেহেতু বস্তুর সাথে কার্য-কারণ নিয়মের সম্পর্ক রয়েছে তাই তাকে বস্তুর অবিদ্যমানতাও বলা যায় না।

বস্তুর প্রতি এঁটে লেগে থাকার কারণ তার প্রতি আসক্তি বা মোহ। বস্তুর আকার বা রূপকে আকঁড়িয়ে লেগে না থাকলে এ মিথ্যা ধারণা এবং অযৌক্তিক আসক্তিও উৎপন্ন হতো না। বিজ্ঞগণ ইহার সত্যতা দর্শন করেছেন এবং এরূপ মূর্খতাপূর্ণ আসক্তি হতে তাঁরা মুক্ত।

পৃথিবীর সমস্ত কিছুই অলীক স্বপ্ন এবং মরীচিকাময় প্রলোভনে ভরা। একটি ছবির প্রতি বাহ্যিকভাবে যে ধারণা জন্মায়, তেমনি অন্য যে কোন বস্তুও আসলে একই সত্যতায় বিদ্যমান। বস্তুতঃ এদের কোন অস্তিত্বই নেই অথচ উত্তপ্ত ধোঁয়ার ন্যায় এর অবস্হান লক্ষ্য করা যায়।

৪। বস্তুর এই ধারণার প্রতি বিশ্বাস জন্মানোর জন্যে এবং আরও অসংখ্য কারণে বস্তুর সৃষ্টি। বস্তুর প্রতি মানুষের এই ধারণা অনন্তকাল ধরে চলে আসছে, যা মারাত্নক ভুল এবং একেই বস্তুর বিদ্যমানতা তত্ত্ব হিসেবে বলা হচ্ছে। কিন্তু এই ধারণাও বড় ধরনের ভুল যে, বস্তু সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, যাকে বস্তুর অ-বিদ্যমানতা তত্ত্ব বলা হচ্ছে।

একইভাবে জীবন-মরণ, চিরস্হায়ী-অস্হায়ী, বিদ্যমানতা-অবিদ্যমানতা ইত্যাদি বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ নহে; কিন্তু মানুষেরা আসক্তিময় চক্ষে তাদের বাহ্যিক অবস্হা লক্ষ্য করে মাত্র। কারণ মানুষের তৃষ্ণাই মানুষকে বস্তুর এই বাহ্যিক অবস্হার সাথে সম্পর্কিত এবং সংযুক্ত করেছে। কিন্তু বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ হিসেবে তারা মুক্ত; কোন প্রকার বৈষম্যতা এবং আসক্তির মধ্যে আবদ্ধ নয়।

যেহেতু সমস্ত কিছুই কার্য-কারণ নিয়মের ধারাবাহিকতার দ্বারাই সৃষ্ট সেহেতু বস্তুর

স্বরূপ নিশ্চিতভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। এতে বুঝা যায় বস্তুর কোন সারতত্ত্ব নেই। ইহা বস্তুর আপাতঃ সত্তা বা অবস্হা মাত্র। এই কারণেই বস্তুর স্বরূপের নিশ্চিত পরিবর্তনকে আমরা মরীচিকাময় এবং কাল্পনিকতার সাথে দর্শন করি। কিন্তু অপরপক্ষে, বস্তুর স্বরূপের এই নিশ্চিত পরিবর্তন মৌলিক আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে স্হির এবং অপরিবর্তনীয়।

একজন সাধারণ মানুষের কাছে নদী সাধারণত নদীর মতই মনে হয়; কিন্তু একটি ক্ষুধার্ত দৈত্যের কাছে ঐ নদীর পানি আগুন হিসেবে দর্শিত হয়। সুতরাং একজন মানুষকে নদীর অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছু বললে তার ধারণা এবং দৈত্যের ধারণা সম্পূর্ণ বিপরীতই হয়।

একইভাবে, ধরা যেতে পারে বস্তুর মায়ামরীচিকাময়তাকে। বস্তুকে বিদ্যমান অথবা অ-বিদ্যমান কোনটিই বলা যায় না।

অধিকন্তু এও বলা যাবে না যে, এই পৃথিবীতে উৎপন্ন এবং বিলয়ের পরে আরও একটি পৃথিবী আছে যা নশ্বর এবং সত্য। এরূপ ধারণা, পৃথিবী যে নশ্বর অথবা অবিনশ্বর এই সম্পর্কে ভুল ধারণার জন্ম দেয়।

এই পৃথিবীর অজ্ঞ মানুষেরা এটাকে প্রকৃত পৃথিবী হিসেবে গ্রহণ করে এবং স্বভাববশতঃ অন্যায় অযৌক্তিক কাজে অগ্রসর হয়। যেহেতু এই পৃথিবী শুধুমাত্র মায়ামরীচিকায় ভরা, সেহেতু মানুষেরা যা করে সবই এই ময়ামরীচিকতার ভিত্তিতেই করে; যা মানুষকে নৈতিক ক্ষতি এবং দুঃখের দিকে ধাবিত করে।

অন্যদিকে একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি এগুলোকে ভালোভাবে বুঝেন এবং বাস্তবতাকে উপলব্ধি করেন, যথাযথ কর্ম সম্পাদন করেন এবং দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করেন।

৪

মধ্যম পথ

১। সংসার দুঃখ হতে মুক্তিকামীদের মধ্যে যারা পরম মুক্তির দিশারী তাদেরকে অবশ্যই দু'টি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে অতি সতর্কতার সাথে গ্রহণ করতে হবে। তাদের একটি হলো কাম তৃষ্ণাকে ত্যাগ করা এবং দ্বিতীয়টি হলো শীল বিনয়ের মাধ্যমে নিজের দেহ-মনকে সংবরণ করা।

চারি আর্যসত্য যা এ দু'টি সিদ্ধান্তকে অতিক্রম করেছে; যা মনকে পরম মুক্তির দিকে ধাবিত করে, এবং প্রজ্ঞা ও মানসিক প্রশান্তি লাভে সহযোগিতা করে তাকেই মধ্যম পথ বলা হয়। এ মধ্যম পথগুলো হলো ঃ (১) সম্যক দৃষ্টি, (২) সম্যক সংকল্প, (৩) সম্যক বাক্য, (৪) সম্যক কর্ম, (৫) সম্যক আজীব, (৬) সম্যক ব্যায়াম, (৭) সম্যক স্মৃতি ও (৮) সম্যক সমাধি।

উপরের বর্ণনানুসারে সমস্ত বস্তুর উপস্থিতি অথবা অনুপস্থিতি অসংখ্য কার্য-কারণ দ্বারাই সংগঠিত হয়ে আসছে। অজ্ঞ ব্যক্তিরা জীবনকে হয়ত অবিনশ্বর অথবা নশ্বর হিসেবে দর্শন করে থাকে। কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তিরা অবিনশ্বরতা এবং নশ্বরতা এ দু'য়ের উর্দ্ধেই জীবনকে নিয়ে ভাবার চেষ্টা করে। এভাবে ভাবাটাকেই মধ্যম পথ হিসেবে ধরা যায়।

২। ধরা যাক, একটি গাছের টুকরা নদীর পানিতে ভাসছে। যদি তা নদীর তলদেশে ডুবে না যায়; অথবা কারও দ্বারা নদী থেকে তুলে নেয়া না হয়; অথবা নদীর পানিতে নষ্ট না হয়; তাহলে তা অবশ্যই এক সময় সমুদ্রে পৌঁছাবেই। জীবন হলো বড় নদীর স্রোতের মধ্যে ধরা পড়া একটি গাছের টুকরার ন্যায়। যদি কোন ব্যক্তি নিজের আরাম আয়েশের প্রতি, অথবা মৃত্যুর প্রতি আসক্তিপরায়ণ না হয়, যদি কোন ব্যক্তি কৃচ্ছ্রসাধনের প্রতি আসক্তিপরায়ণ না হয়, যদি সে তার নিজের গুনাগুনের প্রতি আসক্তিপরায়ণ না হয়, যদি সে নিজের খারাপ কাজের প্রতি আসক্তিপরায়ণ না হয়, যদি সে মহামুক্তির অনুসন্ধানকারী হয়, তাহলে

মায়ামরীচিকাময় জাগতিক ঘৃন্যবস্তুর প্রতি আসক্তিপরায়ণ সে হবে না। অধিকন্তু, মায়ামরীচিকাময় জীবনের প্রতি ভীতি উৎপন্ন করবে। এভাবে যারা জীবন যাপন করে তারাই মধ্যম পথের অনুসারী।

মহামুক্তির পথযাত্রীদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, যে কোন ধরনের আসক্তি এবং জটলা থেকে দূরে থাকা। তার অর্থ হলো জীবনে সর্বদা শান্ত, স্হির, সুশৃঙ্খল, অবিরাম কর্মমুখর মধ্যমপথ অনুসরণ করা।

বস্তুর বিদ্যমানতা অথবা অবিদ্যমানতা, সমস্ত কিছুর স্বরূপকে স্বপ্নের ন্যায় স্মরণ করিয়ে দেয়। মহামুক্তিকামীকে আপন অহংকার অথবা সৎ কাজের জন্য প্রশংসা অথবা অন্য যে কোন ঝামেলাপূর্ণ আসক্তি ত্যাগ করা উচিৎ।

যদি কোন ব্যক্তি তৃষ্ণার জাল হতে মুক্তি লাভ করতে চায় তাহলে তাকে প্রাথমিকভাবে অবশ্যই শিক্ষা করতে হবে যে, বস্তুর প্রতি আসক্তিপরায়ণ না হওয়া এবং এ অবস্হার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়েও আসক্তিগ্রস্হ না হওয়া। তাকে অবশ্যই বস্তুর অবিনশ্বরতা এবং নশ্বরতার আসক্তি হতে মুক্ত হতে হবে; মনের অথবা দেহের ভিতর অথবা বাহিরের যে কোন ধরনের আসক্তি হতে অবশ্যই মুক্ত হতে হবে।

যদি মন যে কোন বস্তুর প্রতি আসক্তিপরায়ণ হয়, ঠিক সে মুহূর্তেই মরীচিকাময় জীবন শুরু হয়। মহামুক্তির পথযাত্রী মানে যিনি আর্য্য পথ অনুসরণ করেন তিনি 'দুঃখ'কে প্রতিপালন করেন না; এমনকি 'প্রত্যাশা মূলক' ইচ্ছাকেও তিনি প্রতিপালন করেন না। কিন্তু তিনি নিরপেক্ষ এবং শান্ত মনের সাথে যা কিছু উৎপন্ন হয় তাকে সম্যক জ্ঞানে দর্শন করেন।

৩। সর্বজ্ঞতাজ্ঞানের কোন প্রকার আকার বা স্বরূপ নেই, যার দ্বারা তাকে মানুষের সম্মুখে স্পষ্টতঃভাবে প্রতীয়মান করা যায়। সুতরাং সর্বজ্ঞতাজ্ঞানকে সবিস্তারে বর্ণনা করার কিছুই নেই।

মোহ এবং অবিদ্যার কারণেই সর্বজ্ঞতাজ্ঞানের উপস্হিতি। যদি তাদের বিনাশ ঘটে

তাহলে সর্বজ্ঞতাজ্ঞান উপলব্ধি হয়। অপর পক্ষে, ইহাও সত্য যে, সর্বজ্ঞতাজ্ঞান ব্যতিরেকে মোহ এবং অবিদ্যাকে যেমন ভাবা যায় না, তেমনি মোহ এবং অবিদ্যাকে ব্যতিরেকে সর্বজ্ঞতাজ্ঞানকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

সুতরাং সর্বজ্ঞতাজ্ঞানকে বস্তু হিসেবে ভাবার ধারণা এবং একে আঁকড়িয়ে ধরার প্রবণতা সম্পর্কেও সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। এগুলো মানসিক উৎকর্ষতা সাধনে বাঁধা স্বরূপ। যখন চিত্ত অন্ধকার হতে আলোর দিকে ধাবিত হয়, তখন উক্ত ধারণাগুলো দূরিভূত হয় এবং এর সাথে সাথে যাকে আমরা সর্বজ্ঞতাজ্ঞান বলি তাও অবস্থান্তরিত হয়।

যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষেরা সর্বজ্ঞতাজ্ঞানের প্রতি বাসনাপরায়ণ হয় এবং একে আঁকড়ে ধরে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত মোহ তাদের সাথে অবস্থান করে এরূপ বুঝতে হবে। অতএব, যারা মহামুক্তির পথযাত্রী তাদেরকে আসক্তি মুক্ত হতে হবে এবং যখন তারা সর্বজ্ঞতাজ্ঞান উপলব্ধি করবে তখন এ জ্ঞানের প্রতি আসক্তিপরায়ণ হয়ে অবস্থান করবে না।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে মুক্তিকামীরা যখন মুক্তির আস্বাদ পেয়ে থাকে তখন তারা নিজেরাই সমস্ত বস্তুর মাঝে মুক্তির সন্ধান খুঁজে পায়। সুতরাং মুক্তিকামীদেরকে মুক্তির পথ অনুসরণ করতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের চিন্তা-চেতনা, পার্থিব ধ্যান-ধারণা, এবং মহামুক্তি সম্বন্ধে স্ব-স্ব সংস্কার দ্বারা উৎপন্ন অবস্থাকে এক ও অভিন্ন রূপে দর্শন করার ক্ষমতা অর্জন না করে।

৪। বস্তুর এ পরমার্থিক অভিন্ন ধারণায়, এর এমন কোন অপরিহার্য্য বৈশিষ্ট্য নেই যে, কোন এক চিহ্নের মাধ্যমে তাকে স্বতন্ত্র করা যায়। একেই বলা হয় "বস্তুর শূন্যতাবাদ" যার অর্থ হলো সত্ত্বাহীন, জন্মহীন, আকার বিহীন এবং দ্বিত্বহীন। এর কারণ সত্ত্বার মধ্যে এমন কোন আকার বা বৈশিষ্ট্য নেই, যাকে আমরা বলতে পারি, এর জন্ম হচ্ছে অথবা মৃত্যু হচ্ছে। সত্ত্বার এমন কোন অপরির্হায্য স্বভাব নেই, যাকে আমরা প্রভেদ করতে পারি, যার কারণে বস্তুকে সত্ত্বাহীন বলা হয়।

মনস্তত্ত্ব ও বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, সমস্ত বস্তুর উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি কার্য্য-কারণ নিয়মেই সংগঠিত হচ্ছে। কোন কিছুই নিজে নিজে উৎপন্ন হচ্ছে না, কারণ এরা একে অপরের সাথে সম্পর্কিত।

যেখানে আলো আছে, সেখানে অন্ধকারও আছে। আবার যেখানে লম্বা কিছু আছে, সেখানে বেটে কিছুও আছে, এবং যেখানে সাদা আছে, সেখানে কালোও আছে। এরূপে বস্তুর স্বরূপ নিজে নিজে এককভাবে প্রতীয়মান হয় না বলেই তাকে সত্ত্বাহীন বলা হয়।

একইভাবে, সর্বজ্ঞতাজ্ঞান যেমন অবিদ্যা ব্যতীত প্রতীয়মান হয় না তেমনি আবার অবিদ্যা ব্যতীত সর্বজ্ঞতাজ্ঞানও উপলব্ধি করা দূরূহ। যে পর্যন্ত বস্তুর অপরিহার্য্য স্বভাবের মধ্যে প্রভেদ না ঘটে, সে পর্যন্ত সেখানে কোন দ্বিত্বতার স্থান নেই।

৫। সাধারণত মানুষেরা অভ্যাসগতভাবে ধারণা করে, জন্ম এবং মৃত্যু তাদের সাথে সম্পর্কিত, কিন্তু বাস্তবতার দিক থেকে এর কোন সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায় না।

যখন মানুষেরা এই সত্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়, তখন তারা জন্ম ও মৃত্যুর দ্বিত্বহীনতার বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারে।

এর কারণ হলো মানুষেরা সাধারণত অহংবোধকে প্রতিপালন করে আসছে; এবং এই অহংবোধ আপন মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কিন্তু মানুষের মধ্যে যদি এই অহংবোধের অবসান ঘটে, তাহলে মন আবরণ মুক্ত হয়। যখন মানুষ এই সত্যকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়, তখন তারা দ্বিত্বহীনতা তত্ত্বকে বুঝতে পারে।

মানুষেরা মনের মাঝে পবিত্র এবং অপবিত্র ভাবের প্রতিপালন করে; কিন্তু বস্তুর প্রকৃত স্বভাবের মাঝে এই ভাবের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। সাধারণত এই ভাব মানুষের ভুল এবং অযৌক্তিক ধারণাজাত।

মনস্তত্ত্ব ও বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ

এভাবে মানুষেরা ভাল এবং খারাপ এই দু'য়ের প্রভেদ করে। কিন্তু এই দু'টি আলাদা আলাদাভাবে অবস্হান করে না। যারা জ্ঞান সন্ধানের পথযাত্রী তাদের মাঝে দ্বিত্বতা বোধের কোন স্হান নেই। এই ভাব তাদেরকে সৎ কাজকে প্রশংসাও করতে বলে না, আবার অসৎ কাজকে নিন্দাও করতে বলে না; এমনকি ভালোকে অপ্রশংসাও করে না এবং খারাপকে ক্ষমাও করে না।

সাধারণত মানুষেরা দুর্ভাগ্যে আর্তনাদ করে এবং সৌভাগ্যে আনন্দিত হয়; কিন্তু যদি এই প্রভেদকে সতর্কতার সাথে ভাবা হয়, তাহলে দেখা যায় দুর্ভাগ্য প্রায় সময়েই সৌভাগ্যে পরিণত হয়, আর সৌভাগ্য পরিণত হয় দুর্ভাগ্যে। জ্ঞানীগণ এই পরিবর্তিত পরিস্হিতিকে নিরপেক্ষভাবে দর্শন করেন। তাই তারা সফলতায় গর্বিত যেমন হন না; বিফলতায় তেমনি মনভঙ্গও হন না। এরূপে বস্তুর দ্বিত্বহীনতা তত্ত্বকে উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

সুতরাং নিম্নে বর্ণিত শব্দগুলো দ্বিত্বতা সম্পর্কে ধারণা দিয়ে থাকে। যেমন- অবস্হান-অ-অবস্হান, পার্থিব কাম্যতা-নষ্কামতা, পবিত্রতা-অপবিত্রতা, ভাল-মন্দ, এই বৈষম্যমূলক পদগুলোর একটিও মানুষের মনে তাদের প্রকৃত স্বভাবের ধারণা বা উপলব্ধি জন্মাতে পারবে না। যখন মানুষেরা এই পদগুলোর বৈষম্যমূলক ধারণা থেকে মুক্ত হতে পারবে তখনই তারা বস্তুর শূন্যতা ধর্ম উপলব্ধি করবে এবং ইহাই 'চিরন্তন সত্য' বা 'শাশ্বত সত্য'।

৬। সুরভিত পদ্ম যেমন উন্নত দোআঁশ মাটিতে প্রস্ফুটিত না হয়ে কর্দমাক্ত জলাভূমিতে প্রস্ফুটিত হয়, তদ্রুপ এ পৃথিবীর পার্থিব ভোগ বিলাসময় আবর্জনা থেকেই বুদ্ধের সর্বজ্ঞতাময় জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। এমনকি প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী ধারণা এবং পার্থিব ভোগ বিলাসের দ্বারা প্রতারিত হওয়াও বুদ্ধত্ব লাভের বীজ স্বরূপ হতে পারে।

যদি একজন নাবিক প্রবাল এবং বদমেজাজী হাঙ্গরের বিপদজনক আক্রমনকে উপেক্ষা করে মুক্তাকে রক্ষা করার জন্যে সমুদ্রের তলদেশে জাহাজ পরিচালনা

করতে পারে; তদ্রুপ মানুষকেও মহামূল্যবান মুক্তা স্বরূপ সর্বজ্ঞতাজ্ঞান অর্জনে এ পৃথিবীর পার্থিব ভোগ বিলাসময় বিপদ হতে মুক্ত হতে হবে। সর্বপ্রথম তাকে বন্ধুর ও দূরারূহ পর্বতচূড়াময় আত্নাবাদ ও অহংবোধ থেকে মুক্ত হতে হবে। তবেই সে মুক্তির পথ দর্শন করতে পারবে; এবং যার মাধ্যমে সে জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হবে।

এখানে একজন সাধকের কাহিনী উল্লেখ করা যেতে পারে। একদা একজন সাধক যিনি সত্যপদ সন্ধানে অতীব উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন, তিনি একদা একটি খাড়া পাহাড়ের উপরে উঠে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন; যা তাঁর অভিষ্ঠ লাভের জন্যেই করেছেন। যিনি বা যাঁরা এরূপ ঝুঁকি ও বিপদজনক জেনেও এপথকে বেছে নেন, তিনি বা তাঁরা দ্বেষময় আগুনের মাঝেও খড়গের ন্যায় খাড়া পাহাড়ের উপরে সুশীতল সমীরণের সন্ধান লাভ করেন। অবশেষে তিনি বা তাঁরা আত্নাবাদ এবং পার্থিব ভোগ বিলাস যেগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন এবং যন্ত্রণাভোগ করেছিলেন সেগুলোর মধ্যেই জ্ঞানের সন্ধান লাভ করেন।

৭। বুদ্ধের শিক্ষা আমাদেরকে একই বস্তুর দু'টি পরস্পরবিরোধী ধারণার দ্বিত্বহীনতা শিক্ষা দিয়ে থাকে। একটি বস্তুর মাঝে সঠিক ও নির্ভুলের সন্ধান লাভ করা এবং পুনঃ একই বস্তুতে ভালো ও খারাপ প্রত্যক্ষ করা মানুষের ভুল ধারণা।

যদি মানুষেরা তৃষ্ণাবশতঃ দৃঢ়তাসহকারে বলে, সমস্ত বস্তু অনিত্য এবং অসার; পরিবর্তনহীন এবং শাশ্বত; এ ধারণাও মহাভুলের সমষ্টি মাত্র। যদি কেহ আত্নাবাদে আসক্ত হয়ে পড়ে, ইহা তাকে অতৃপ্তির যন্ত্রণায় কষ্ট দেয়। যদি সে ধারণা করে যে, আত্নাবাদের কোন অস্তিত্ব নেই, এ ধারণাও তাকে কষ্ট দেয় এবং সত্য পথের অনুশীলন তার জন্যে তখন অর্থহীন হয়ে পড়ে। যদি কেহ দাবী করে যে, জাগতিক সমস্ত কিছুই দুঃখময় ইহাও ভুল; আবার যদি বলে শান্তিময়; তাও ভুল। বুদ্ধ এ প্রতিকুল ধারণা বা সংস্কার উত্তরণের জন্যে মধ্যম পথের শিক্ষা দিয়েছেন; যেখানে দ্বিত্বতা একাত্বতার মাঝে প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

৩য় পরিচ্ছেদ

বুদ্ধের স্বরূপ

১

পরিশুদ্ধ মন

১। মানুষের মধ্যে নানা প্রকারের মানসিকতা সম্পন্ন মানুষ বিদ্যমান। এর মধ্যে কেহ জ্ঞানী, কেহ অজ্ঞানী, কেহ ভালো স্বভাবের, কেহ খারাপ স্বভাবের, কেহ সহজ সরল, কেহ কুটিল-জটিল, কেহ পবিত্র মনের অধিকারী আবার কেহ নোংরা মনের। কিন্তু মনের এসকল ভিন্নতা জ্ঞান উপলব্ধির ফলে উপেক্ষনীয় হয়ে যায়। এ ধরা পদ্ম পুকুরের ন্যায়, যা নানা জাতের উদ্ভিদে পরিপূর্ণ; যেখানে নানা বর্ণের ফুল প্রস্ফুটিত হয়। এগুলোর মধ্যে কোন কোন ফুল সাদা, আবার কোন কোন ফুল বেগুনী; কোন কোন ফুল নীল, আবার কোন কোন ফুল হলুদ। কিছু কিছু ফুল পানির নীচে প্রস্ফূটিত হয়; আবার কিছু কিছু ফুল পানির মধ্যেই প্রস্ফূটিত হয়; কিছু কিছু ফুল আবার পানির উপরেই প্রস্ফূটিত হয়। মানব সমাজের মধ্যেও ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন, ছেলে-মেয়ে, স্বামী-স্ত্রী, যুবক-যুবতী যার ভিন্নতা অত্যাবশ্যকীয় নয়। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পেলে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই জ্ঞান লাভে সক্ষম।

একটি হাতীর প্রশিক্ষক হতে হলে তাকে পাঁচটি গুনের অধিকারী হতে হয়। যেমন, ১। সুস্বাস্থ্যবান, ২। বিশ্বাসী, ৩। অধ্যবসায়ী, ৪। উদ্দেশ্যের প্রতি গভীর আগ্রহ এবং ৫। প্রাজ্ঞতা। বুদ্ধের জ্ঞান উপলব্ধির জন্যেও একই গুণাবলীর প্রয়োজন। যদি উক্ত গুণাবলীগুলো কারও মধ্যে নিহিত থাকে, তাহলে সে অবশ্যই জ্ঞান উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। বুদ্ধের ধর্ম শিক্ষা করতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয় না; কারণ সকলের স্বভাবে বুদ্ধত্বজ্ঞান উপলব্ধির বীজ নিহিত রয়েছে।

২। জ্ঞান উপলব্ধির পথ অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষেরা নিজের চক্ষে বুদ্ধের দর্শন লাভ করে এবং নিজের মনের মধ্যে বুদ্ধের প্রতি বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। যে চোখের দ্বারা বুদ্ধকে দর্শন করে এবং যে মনের মধ্যে বুদ্ধের প্রতি বিশ্বাস উৎপন্ন হয় এ চোখ

এবং মন এক ও অভিন্ন, যা জন্ম-মৃত্যুর সময়েও এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়।

যদি একজন রাজা দস্যু দ্বারা উৎপাতের সম্মুখীন হন, তাহলে দস্যুদেরকে আক্রমনের পূর্বে তাদের অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত হতে হবে। একইভাবে, একজন ব্যক্তি যখন পার্থিব ভোগ-লালসায় আক্রান্ত হয়, তখন তাকে সর্বপ্রথমেই এগুলোর মূল সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

যখন একজন লোক ঘরের ভিতরে তার চোখ উন্মোচন করে, তখন সে ঘরের আভ্যন্তরীণ বস্তুগুলো দর্শন করে এবং পরে জানালার মাধ্যমে বাহিরের দৃশ্য দর্শন করে। ঠিক একইভাবে, বাহিরের বস্তু দর্শনের পূর্বে আমাদেরকে ঘরের ভিতরের বস্তু অর্থাৎ অর্ন্তজগতের বস্তুকে দর্শন করা প্রয়োজন।

যদি আমাদের শরীরের মধ্যে মনের অবস্হান থাকে; তাহলে প্রথমেই শরীরের ভিতরের অংশগুলো জানা প্রয়োজন। কিন্তু সাধারণত মানুষেরা বাহ্যিক বস্তুতেই আকৃষ্ট হয় বেশী এবং অর্ন্তঃজগতকে জানা বা যত্ন নেয়ার ব্যাপারে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করে না।

যদি মন শরীরের বাহিরে থাকে, তাহলে শরীরের প্রয়োজনীয়তার সাথে মনের কোন সম্পর্ক না থাকার কথা। কিন্তু লক্ষ্য করা যায়, শরীরে যা অনুভূত হয় মন তা জানে আগে এবং মন যা জানে শরীরেও তা পরে অনুভূত হয়। সুতরাং বলা যাবে না যে, মন শরীরের বাহিরে অবস্হান করে। তাহলে প্রশ্ন জাগে মনের সত্ত্বা কোথায় অবস্হান করে ?

৩। সুদূর অজানা অতীত হতে মানুষেরা অবিদ্যা জনিত কর্ম সংস্কারের কারণে ২টি প্রধান মৌলিক ভুল ধারণার জন্যে ভ্রান্তপথে চালিত হয়ে আসছে।

এর প্রথমটি হলো, মানুষেরা বিশ্বাস করে যে প্রভেদীকরণ মন যা জন্ম-মৃত্যুর মূল, তাই তার আসল রূপ এবং দ্বিতীয়টি হলো, তারা জানে না যে, প্রভেদীকরণ মনের পশ্চাতে লুকায়িত একটি পুত পবিত্র মন রয়েছে, যা তার প্রকৃত স্বরূপ।

বুদ্ধের স্বরূপ

যখন একজন মানুষ হাত মুষ্টিবদ্ধ করে এবং বাহু উত্তোলন করে চোখ তা দর্শন করে এবং মন প্রভেদ করে। কিন্তু মনের এ প্রভেদীকরণ তার প্রকৃত রূপ নয়।

প্রভেদীকরণ মন শুধু প্রভেদই করে এবং কল্পনার মাধ্যমে বৈষম্যও করে; যার ফলে আকাংখাও মনের অন্যান্য অবস্থার সাথে আত্নাবাদেরও সৃষ্টি হয়। প্রভেদীকরণ মনই হলো কার্য্য-কারণের মূল, এতে কোন সত্ত্বা নেই যা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু যখন থেকে মানুষেরা বিশ্বাস করে যে, এটিই মনের আসল রূপ, ঠিক তখন থেকেই কার্য্য-কারণের সাথে মোহ যুক্ত হয়ে দুঃখের সৃষ্টি করে।

একজন মানুষ যখন নিজের হাতের মুষ্টি খোলে, তখন মন তা উপলব্ধি করে। কিন্তু হাতের এ চালনা শক্তিটি কি ? একে কি মন, নাকি হাত বলা হবে ? অথবা দু'টির কোনটিই নয় ? যদি হাত নড়ে তাহলে মনও একইভাবে নড়ে এবং একইভাবে তদ্বিপরীতও করে। কিন্তু এ চলন মন শুধুমাত্র ভাসা ভাসা মনেরই অবস্হা। ইহা প্রকৃত বা প্রধান মন নয়।

৪। মৌলিক দিক থেকে প্রত্যেকে পবিত্র মনের (প্রভাস্বর চিত্তের) অধিকারী। কিন্তু ইহা সচরাচর পার্থিব ভোগ লালসার দ্বারা কলুষিত হয়, যা নিজের পারিপার্শ্বিকতা থেকে সৃষ্টি হয়। এ কলুষিত মন নিজের প্রকৃত অপরিহার্য্য মন নয়-এতে কিছু মিশ্রিত হয়ে আছে, যার প্রবেশের অধিকার নেই বা কোন একটি বাড়ীতে নিমন্ত্রণবিহীন অতিথির আগমন স্বরূপ।

চন্দ্র প্রায় সময় মেঘের মধ্যে লুকিয়ে থাকে কিন্তু ইহা কখনও মেঘের দ্বারা স্হান পরিবর্তন করে না এবং চন্দ্রের শুভ্রতারও কোন পরিবর্তন হয় না। অতএব, কলুষিত মনই 'প্রকৃত মন' মানুষের এ ভুল ধারণা পোষণ করা উচিৎ নয়।

এ ধারণা মনে রেখে সদা সতর্ক ও জাগ্রত মন নিয়ে প্রকৃত ও মৌলিক অপরিবর্তনীয় মনের মাধ্যমে সর্বজ্ঞতাজ্ঞান লাভে অগ্রসর হতে হবে। পরিবর্তনের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে, কলুষিত মন এবং বিকৃত ধ্যান-ধারণার দ্বারা ভ্রান্ত পথে চালিত হয়ে মানুষেরা এ পৃথিবীর মোহান্ধে নিমর্জ্জিত হয়ে ঘুরপাক খেতে থাকে।

পারিপার্শ্বিকতা পরিবর্তনের জন্যে লোভ এবং তার প্রতিক্রিয়া থেকে মানুষের মনে অশান্তি ও মলিনতার জন্ম নেয়।

যে মন নানা কিছু উৎপত্তির পরেও বিব্রতবোধ করে না, সর্বমুহূর্ত্তে স্হির অবস্হায় অবস্হান করে, তাহাই প্রকৃত মন এবং এরূপ মন তৈরী করাই শ্রেয়।

যেমন, পান্হশালায় লোক না থাকায় পান্হশালা নেই এটা বলা যাবে না। তেমনি পারিপার্শ্বিকতা পরিবর্তনের জন্যে উৎপন্ন মলিন চিত্তের মাধ্যমে প্রকৃত চিত্ত বিলীন হয়েছে এটাও বলা যাবে না। ঐ পরিবর্তিত অবস্হা মনের প্রকৃত স্বরূপ নহে।

৫। ধরা যাক, একটি বক্তৃতা মঞ্চের কথা, যা সূর্যের আলোয় আলোকিত হয় এবং সূর্যের অস্তাগমনে অন্ধকার হয়ে যায়।

এতে আমরা ভাবতে পারি সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে আলোও চলে যায় এবং অন্ধকারের সাথে সাথে রাত্রির আগমন ঘটে। কিন্তু মনের উপলব্ধিজাত এই আলো এবং আঁধার আমরা ভাবতে পারি না। মন ঐ আলো এবং আধাঁর ধারণে সমর্থ যা অন্য কাউকেও ফিরিয়ে দেয়ার মত নয়। ইহা কেবল মাত্র মৌলিক সত্যকে বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে দেখা মাত্র।

সূর্য উদিত হওয়ার সময় আলোকিত হয় এবং অস্ত যাওয়ার সময় অন্ধকার নেমে আসে। এই পরিবর্তন ক্ষণিকের জন্যে মনে উৎপন্ন হয় মাত্র।

ক্ষণে ক্ষণে জীবন এবং পারিপার্শ্বিকতার পরিবর্তনের ফলে মনের মধ্যেও এই পরিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করা যায়। এই পরিবর্তন মনের প্রকৃত রূপ নয়। আলো এবং আধাঁরকে উপলব্ধি করতে পারে এমন মনই প্রকৃত মন এবং ইহাই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ।

বাহ্যিক অবস্হার পরিবর্তনের ফলে ক্ষণিকের জন্যে মানুষেরা কুশল ও অকুশল, ভালো লাগা এবং মন্দ লাগা ইত্যাদি অনুভব করে। ক্ষণিকের প্রতিক্রিয়া থেকেই

এগুলো মানুষের মনে উৎপন্ন হয়; যার কারণ পুঞ্জিভূত আসক্তি।

তৃষ্ণা, বৈষয়িক আসক্তি যা মনকে ঘিরে অবস্থান করে এগুলোকে ত্যাগ করতে পারলেই মনের স্বচ্ছতা আসে এবং এটাই মনের প্রকৃত স্বরূপ।

পানি যে কোন একটি গোলাকার পাত্রের মধ্যে রাখলে গোলাকার দেখায় এবং বর্গাকার পাত্রের মধ্যে রাখলে বর্গাকৃতি দেখায়। কিন্তু পানির নিজের কোন সুনির্দিষ্ট আকার নেই। সাধারণত মানুষেরা এই সত্যকে ভুলে যায়।

মানুষেরা সচরাচর ইহা ভালো, ইহা খারাপ, এটি পছন্দ করি বা এটা পছন্দ করি না, এবং বস্তুর স্হায়ীত্ব ও অস্হায়ীত্বের মধ্যে পার্থক্য করে। যার ফলশ্রুতিতে তারা আসক্তির বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে যায় এবং পরিশেষে দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করে থাকে।

যদি মানুষেরা কাল্পনিক এবং মিথ্যা ধারণাজাত এ বৈষম্যমূলক আসক্তি ত্যাগ করতে পারে এবং তাদের প্রকৃত স্বচ্ছ মন সৃষ্টি করতে পারে, তাহলে তাদের শরীর ও মন আসক্তি ও দুঃখ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। এভাবে তারা বুঝতে পারে যে মনের প্রশান্তি এ মুক্তির মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

২

বুদ্ধের স্বরূপ

১। আমরা পূর্বেই পবিত্র ও প্রকৃত মনের বর্ণনা করেছি যা মনের মৌলিক অবস্হা। ইহাই বুদ্ধের স্বরূপ যা বুদ্ধাঙ্কুর সদৃশ।

সূর্যের আলোতে একটি ধাতব কাঁচ ধরলে তার মধ্য দিয়ে আগুন পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ঐ আগুনের উৎপত্তি স্হল কোথায় ? ধাতব কাঁচটি থেকে সূর্য অনেক অনেক দূরে; কিন্তু তবুও ঐ কাঁচের মাধ্যমে আগুনের আবির্ভাব ঘটে। আবার ধাতব

কাঁচটি যদি তীক্ষ্ণ প্রখরতা প্রাপ্ত না হয়, তাহলে আগুনের আবির্ভাব হয় না।

ঠিক একইভাবে যদি মানুষের চিত্তে বুদ্ধের জ্ঞান রূপ আলো সমাহিত হয়, (যার আসল রূপ বুদ্ধাঙ্কুর স্বরূপ এবং যার আলোকে আলোকিত হয় মানুষের মন এবং প্রকৃত শ্রদ্ধা জাগ্রত হয় বুদ্ধের প্রতি) বুদ্ধই তখন আলোকবর্তিকা হয়ে তাঁর জ্ঞানের আলো নিয়ে মানুষের সামনে উপস্থিত হন এবং তাদের শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করেন।

২। মানুষেরা সাধারণত নিজের প্রকৃত মনকে বুদ্ধের "সর্বজ্ঞতাজ্ঞান উপলব্ধি সমৃদ্ধ মন" থেকে ভিন্ন বলে ধারণা করে থাকে। এ ধারণা থেকে বৈষয়িক আসক্তির জন্ম নেয় এবং এ আসক্তি ভালো ও খারাপানুসারে মনের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি করে। যার দরুন, অনুতাপের মাধ্যমে দুঃখ কষ্টে পতিত হয়।

মানুষেরা কেন এই স্বাভাবিক ও পুত-পবিত্র মনের অধিকারী হয়ে এখনও নিজেকে মায়ামরীচিকাময় জগতে, বুদ্ধাঙ্কুরকে আবৃত করে বুদ্ধ প্রজ্ঞা স্বরূপ আলোর সন্ধান না করে দুঃখ কষ্টের মধ্যে অবস্থান করছে?

একদা এক ব্যক্তি আয়নার বিপরীতে তার চেহারা দেখতে চেষ্টা করলো। কিন্তু আয়নাতে তার চেহারা এবং মাথা দেখতে না পেয়ে পাগল হয়ে গেল। কি আশ্চর্য! এভাবে সে পাগল না হলেও তো পারতো। এটা তার বোকামীতার জন্যেই হলো।

তদ্রুপ একজন বোকা লোকও দুঃখে নিমজ্জিত হয়; কারণ সে সর্বজ্ঞতাজ্ঞান উপলব্ধি করেনি। সর্বজ্ঞতাজ্ঞানের মধ্যে কোন ব্যর্থতা নেই; ব্যর্থতা আছে শুধু তাদের মধ্যে, যারা দীর্ঘ দিন ধরে তাদের মনের মধ্যে প্রতিনিয়ত প্রভেদীকরন দৃষ্টির মাধ্যমে সর্বজ্ঞতাজ্ঞানকে স্থান দিয়েছে। স্বচ্ছ মনের অনুপস্থিতি ও ধারণাজাত কারণে মনে লোভ এবং মায়ামরীচিকার উৎপত্তি হয় যা প্রকৃত মনকে আড়াল করে রাখে।

যদি পুঞ্জীভূত মিথ্যা ধারণা মানুষের মন থেকে অপসারণ করা যায় তাহলেই সর্বজ্ঞতাজ্ঞানের আবির্ভাব হয়। কিন্তু ইহাও অস্বাভাবিক কিছু নয় যে, যখন কেহ

সর্বজ্ঞতাজ্ঞান উপলব্ধি করে থাকেন তখন তাঁরা অনুধাবন করতে পারেন যে, মিথ্যা ধারণা ব্যতিরেকে কোন সর্বজ্ঞতাজ্ঞানই নেই।

৩। বুদ্ধাঙ্কুর এমন কিছু নয় যার পরিসমাপ্তি আছে। যদিও মানুষ তাদের কর্মগুণে প্রাণীজগতে উৎপন্ন হয় অথবা ক্ষুধার্ত প্রেতলোকে উৎপন্ন হয় অথবা নরকে পতিত হয়; কিন্তু তবুও তারা বুদ্ধাঙ্কুর বিহীন নয়।

এই কলুষিত দেহ সমাধিস্থ হলেও, অথবা কামনা-বাসনার জগতে মোহগ্রস্থ হয়ে লুকায়িত অবস্থায় থাকলেও, বোধি লাভের সম্পর্ক হতে সম্পূর্ণ নির্বাসিত করা যায় না।

৪। সে অনেক দিন পূর্বের কথা। এটি মাদকাসক্ত অবস্থায় শায়িত এক বৃদ্ধের গল্প। বৃদ্ধলোকটির এক বন্ধু যতটুকু সম্ভব তার সংগী হলো। কিন্তু মাদকাসক্ত বৃদ্ধলোকটির বন্ধু তার ব্যবহার্য এক মূল্যবান বস্তু কোন কারণে লুকিয়ে রাখতে বাধ্য হলো; এ কারণে সে ভয়ে বৃদ্ধলোকটিকে ত্যাগ করে চলে গেল। মাদকাসক্ত বৃদ্ধলোকটি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেও তার বন্ধু যে গতরাত মূল্যবান বস্তুটি লুকিয়ে রেখেছিল তা বুঝে উঠতে পারেনি। বৃদ্ধলোকটি অভাব এবং ক্ষুধার্ত অবস্থায় এদিক ওদিক ঘুরা ফেরা করছিল। অনেকদিন পর দু'জনে পুনঃ মিলিত হলে, পূর্বের ঘটনাটি প্রকাশ করলো এবং মূল্যবান বস্তুটি সন্ধান করতে উপদেশ দিল।

এই ভব সমুদ্রে মানুষেরা জন্ম এবং মৃত্যুর মাধ্যমে দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করে ঘুরে বেড়ায়। তাদের অজ্ঞানতার বিপরীতে যে পূত পবিত্র এবং অমূল্য সম্পদ স্বরূপ বুদ্ধত্বের বীজ নিহিত রয়েছে তা তারা বুঝতে পারে না; তাই তারা দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করে থাকে।

এভাবে অসতর্কতার দরুন তারা যতই অমর্যাদাপূর্ণ এবং অবিদিত কাজ করুক না কেন বুদ্ধ তাদের নিকট থেকে বিশ্বাস হারান না। কারণ তাদের মধ্যে সম্ভাবনাময় বুদ্ধাঙ্কুর নিহিত আছে।

বুদ্ধ, যারা অজ্ঞানতা দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়ে নিজের মধ্যে নিহিত বুদ্ধাঙ্কুর দর্শন করতে পারে না, তাদের মধ্যে আলোকবর্তিকা হয়ে উপস্থিত থেকে, তাদেরকে মোহের বেড়াজাল হতে বেড়িয়ে আসার পথ নির্দেশনা দেন এবং এও শিক্ষা দেন যে, তাদের সাথে বুদ্ধত্বের কোন প্রভেদ নেই।

৫। বুদ্ধ হলেন তিনিই যিনি জ্ঞান উপলব্ধি করেছেন। মানুষ হলো তারাই যারা বুদ্ধত্ব লাভে সক্ষম। এ দু'য়ের মাঝে ইহাই শুধু পার্থক্য।

কিন্তু একজন মানুষ যদি দাবী করে যে সে জ্ঞান অর্জন করেছে, তাহলে সে নিজেই নিজেকে প্রশংসা করছে। যদিও সে ঐ পথের পথিক, কিন্তু এখনও সে বুদ্ধত্বজ্ঞান অর্জনে সক্ষম হননি।

বুদ্ধের স্বরূপ অধ্যবসায়ী এবং নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছাড়া আর কারো কাছে আবির্ভূত হয় না এবং বুদ্ধত্বজ্ঞান অর্জন ছাড়া তিনি তাঁর অবস্থান থেকে চ্যুত হন না।

৬। এক সময় এক রাজা কিছু অন্ধ লোককে এক হাতীর সামনে হাজির করে, হাতী দেখতে কেমন তা জিজ্ঞাসা করলেন। একজন হাতীর দাঁত স্পর্শ করে বললো, 'হাতী দেখতে বৃহদাকার গাছের ন্যায়'; অন্যজন হাতীর কান স্পর্শ করে বললো, 'হাতী দেখতে বড় পাখার ন্যায়'; অন্য আরেকজন হস্তিশুঁড় স্পর্শ করে বললো, 'হাতী দেখতে মানুষের মত'। পুনঃ অন্য একজন হাতীর পা স্পর্শ করে বললো, 'হাতী দেখতে থমের ন্যায়'; আবার আরেকজন হাতীর লেজ ধরে বললো, 'হাতী দেখতে দড়ির ন্যায়'। তাদের একজনও হাতীর প্রকৃত স্বরূপ রাজাকে বলতে পারলো না।

একইভাবে, একজন মানুষের আংশিক স্বরূপ হয়তো বর্ণনা করা যেতে পারে, কিন্তু তার প্রকৃত স্বরূপ বা বুদ্ধের প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা করা যায় না।

একটি মাত্র সম্ভাবনাময় পথ আছে, যার দ্বারা মানুষের চিরন্তন স্বভাব বা বুদ্ধের স্বরূপকে পরিপূর্ণভাবে বুঝা সম্ভব, তাহলো বুদ্ধ এবং বুদ্ধের শিক্ষাকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করা।

৩

অনাত্মা

১। এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা বুদ্ধের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, যা বর্ণনা করার মত ছিল। এখন যা অন্যান্য শিক্ষার ন্যায় অস্তিত্ব আছে বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা নয়, সে আত্মা নিয়ে আলোচনা করবো।

আমিত্বের ধারণা এমন একটি জিনিস যা মনের বৈষম্যমূলক আচরণের মাধ্যমে সৃষ্ট হয় এবং এর প্রতি মন রমিত হয়। কিন্তু মনের এ অবস্থা ত্যাগ করা উচিৎ। অপরদিকে, বুদ্ধের স্বরূপ এমন একটা অবস্থা যা আমরা বর্ণনা করতে অক্ষম; ইহা প্রথমে নিজেকেই আবিষ্কার করতে হবে। এক দৃষ্টিতে, একে আমরা আমিত্বের সাথে তুলনা করতে পারি কিন্তু ইহা 'আমি' ও 'আমার' এ অর্থে আমিত্ব নয়।

আত্মার স্থায়ীত্বকে বিশ্বাস করা ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। এ ধারণা অনাত্মাকে বিদ্যমানতা হিসেবে প্রতীয়মান করে, যা বুদ্ধের স্বরূপকে অর্থাৎ অনাত্মাকে আত্মা হিসেবে ভুল ধারণা দিয়ে থাকে।

ইহা একটি গল্পের মাধ্যমে বর্ণনা করা যেতে পারে। এক মা তার অসুস্থ্য শিশুকে ডাক্তারের নিকট নিয়ে গেলো। ডাক্তার শিশুকে দেখার পর ঔষধ দিয়ে তার মাকে বললেন, 'ঔষধ সেবনের পর যতক্ষণ পর্যন্ত তা হজম না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত যাতে স্তন্যপান না করান '।

মা তার স্তন্যে কিছু তিক্ত পদার্থ লেপন করে শিশুটিকে স্তন্য পানে বিরত রাখলো। অতঃপর ঔষধ হজম হওয়ার পরে মায়ের স্তন্য পরিস্কার করে ধৌত করার পর শিশুটিকে পান করতে দিলো। মায়ের এ পদ্ধতি তার স্নেহজাত। কারণ সে তার শিশুকে খুবই ভালবাসে।

উক্ত গল্পের মায়ের ন্যায় বুদ্ধ ভ্রান্ত ধারণা ও আত্মাবোধের আসক্তি থেকে মুক্তি

লাভের জন্যে আত্মাবোধের অস্হিত্বকে অস্বীকার করেছেন। যখন এ আত্মাবোধের ভ্রান্ত ধারণা দুরিভূত হবে তখনই প্রকৃত মনের সন্ধান পাওয়া যাবে; যা বুদ্ধের প্রকৃত স্বরূপ।

আত্মাবোধের আসক্তিগ্রস্ত ব্যক্তি মোহের দ্বারা পরিচালিত হয়, কিন্তু নিজের মধ্যে বুদ্ধের স্বরূপ নিহিত রয়েছে, এরূপ ধারণা মানুষকে সর্বজ্ঞতার দিকে নিয়ে যায়।

ইহা বর্ণিত গল্পের মহিলাটির ন্যায়, যে তার স্তন্য দান করেছিল। এ স্তন্য দানের মধ্যে যে স্বপ্ন লুপ্ত ছিল তা ঐ মা ছাড়া অন্য কেহ উপলব্ধি করতে পারবে না। তদ্রুপ বুদ্ধ মানুষের মনকে আলোকিত করেন এবং পবিত্র বুদ্ধের স্বরূপকে মানুষের সম্মুখে উপস্হাপন করেন।

২। প্রশ্ন করা যেতে পারে, যদি প্রতিটি মানুষের অন্তরে বুদ্ধের স্বরূপ নিহিত থাকে তাহলে কেন একে অপরকে প্রতারণা করে এবং দুঃখ দেয় ? কেনইবা মানুষে মানুষে খুনাখুনি করে ? আবার কেনই বা বিভিন্ন পদমর্যাদা, সম্পদ, ধনী এবং গরীবের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান ?

একজন মল্লযোদ্ধার গল্প এখানে উপস্হাপন করা যেতে পারে। মল্লযোদ্ধাটি সবসময় তার কপালে একটা মূল্যবান পাথর ব্যবহার করতো। একদা মল্লযুদ্ধ করার সময় তার কপালের মূল্যবান পাথরটি কপালের মাংসের সাথে মিশে গেল। এতে মল্লযোদ্ধাটি মনে করলো, তার মূল্যবান পাথরটি হারিয়ে গেল। তাই সে একজন শৈল্যচিকিৎসকের নিকট গিয়ে ক্ষত স্হানটি নিরাময়ের জন্য অনুরোধ জানালো। যখন শৈল্যচিকিৎসক তার ক্ষত স্হান নিরাময়ের জন্য আসলেন তখন দেখতে পেলেন যে, মূল্যবান পাথরটি কপালের মাংস এবং রক্তের দ্বারা আবৃত অবস্হায় আছে। ডাক্তার একটি আয়নার মাধ্যমে মল্লযোদ্ধাকে পাথরটি দেখালেন।

বুদ্ধের প্রকৃতি এ গল্পের মূল্যবান পাথর সদৃশ। বুদ্ধের বীজ সবার মাঝে নিহিত আছে, কিন্তু তা নানা আবর্জনার দ্বারা আবৃত। ফলে সাধারণ মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারে না। কিন্তু একজন দক্ষ শিক্ষক তা উপলব্ধি করে সবাইকে দর্শন করাতে

সক্ষম।

প্রত্যেকের মাঝেই বুদ্ধের বীজ নিহিত আছে, তা যতই লোভ, দ্বেষ ও মোহের গভীরে থাকুক না কেন; অথবা নিজের কাজের দ্বারা বিলীন হয়ে যাকনা কেন। বুদ্ধাঙ্কুর কখনও বিলীন হওয়ার মত নয়। যখন সকল অজ্ঞানতা দুরিভূত হয়, তখন পুনঃ বুদ্ধাঙ্কুর আবির্ভূত হয়।

উপরের গল্পে মাংস এবং রক্তের মাঝে মিশ্রিত হয়ে যেমন মূল্যবান পাথরটি লুকায়িত ছিল-যা আয়নার দ্বারা প্রদর্শিত হয়েছিল; তদ্রুপ মানুষের পার্থিব কামনা-বাসনার আড়ালে বুদ্ধাঙ্কুর নিহিত রয়েছে-যা বুদ্ধের জ্ঞানালোকের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়।

৩। আমাদের চারিপাশে বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ থাকলেও বুদ্ধাঙ্কুর সদা পবিত্র এবং স্নিগ্ধময়। গাভীর রং লাল, সাদা এবং কালো হলেও দুধ কিন্তু সর্বদা সাদাই হয়ে থাকে; তেমনি মানুষেরা তাদের চিন্তা এবং কাজে যাই করুক না কেন বুদ্ধাঙ্কুর কিন্তু সর্বদা অপরিবর্তনীয়।

ভারতের একটি রূপকথায় দেখা যায় যে, হিমালয়ের পাদদেশে দীর্ঘ ঘাসের দ্বারা আবৃত অবস্থায় কিছু রহস্যপূর্ণ বনজ ঔষধ ছিল। দীর্ঘদিন ধরে অনেকে চেষ্টা করেও তার অনুসন্ধান পেলো না। কিন্তু অবশেষে একদিন এক বিজ্ঞ ব্যক্তি আস্বাদের মাধ্যমে তার সন্ধান খুঁজে বের করলেন। বিজ্ঞ লোকটি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন ঔষধ সংগ্রহ করে একটি টিউবের ভেতর রাখতেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর অন্য কেহই আর ঐ পর্বত হতে বনজ ঔষধ সংগ্রহ করতে পারল না। এদিকে টিউবের মধ্যে রক্ষিত ঔষধগুলোও ধীরে ধীরে অম্লযুক্ত হওয়ায় সেবনের অনুপযুক্ত হলো।

একইভাবে বুদ্ধাঙ্কুর সবার তীব্র পার্থিব কামনা বাসনার মাঝেই লুকায়িত অবস্থায় আছে যা সহজে অনুমান করা যায় না। কিন্তু বুদ্ধ ইহা প্রথমে নিজে দর্শন করেছেন এবং পরে তা অন্যকেও দৃষ্টিগোচর করিয়েছেন-যা বিভিন্ন জন বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের

মাধ্যমে উপলব্ধি করেছেন।

৪। হীরক হলো বস্তুর মধ্যে সবচেয়ে শক্ত। একে সহজে ভাংগা যায় না। বালি অথবা পাথরকে সহজেই পাউডারের ন্যায় গুড়া করা যেতে পারে; কিন্তু হীরাকে তা করা কষ্টকর। বুদ্ধাঙ্কুরও তদ্রুপ; একে সহজে নষ্ট করা যায় না।

মানুষের স্বরূপ-মানে শরীর এবং মন দু'টোই বিচ্ছিন্ন হতে পারে, কিন্তু বুদ্ধাঙ্কুর বিচ্ছিন্ন হওয়ার মত নয়। বুদ্ধাঙ্কুর হলো মানুষের জ্ঞানের উৎকর্ষতার সবচেয়ে উৎকৃষ্টাংশ। বুদ্ধ বলেছেন, "মানুষের স্বরূপের মধ্যে স্ত্রী, পুরুষ ইত্যাদির প্রভেদ থাকলেও বুদ্ধাঙ্কুরের মাঝে এর কোন প্রভেদ দেখা যায় না"।

খাঁটি স্বর্ণ পেতে হলে যেমন আকরিকের মাধ্যমে গলিয়ে অন্য পদার্থগুলোকে পৃথক করা হয়, তদ্রুপ মানুষেরা তাদের মনকে পার্থিব কামনা-বাসনার হাত থেকে এবং আমিত্ববাদের হাত থেকে পৃথক করতে পারে। এভাবে তারাও পবিত্র বুদ্ধাঙ্কুরের দর্শন লাভ করতে পারে।

৪র্থ পরিচ্ছেদ
কলুষিত পথ

১
মানবীয় কলুষিত পথ

১। এ পৃথিবীতে ২টি পার্থিব আবেগ আছে। এগুলোর দ্বারা পবিত্র বুদ্ধের স্বরূপ কলুষিত এবং অদৃশ্য হয়ে যায়।

প্রথমটি হলো, বিশ্লেষণ এবং আলোচনাধর্মী যার দ্বারা সাধারণ মানুষ কোন কিছু সিদ্ধান্ত নিতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। এবং দ্বিতীয়টি হলো, ভাবাবেগ জনিত অভিজ্ঞতা যার দ্বারা সাধারণত মানুষের শ্রদ্ধাবোধের মধ্যে বিভ্রান্তির জন্ম দেয়।

সকল মানুষের কলুষিত চিন্তাকে আমরা দু'ভাবে লক্ষ্য করি। একটি হলো, আসক্তি এবং অন্যটি হলো, আসক্তির মাধ্যমে কোন কিছু করা। কিন্তু এর মূলে দু'টি আদি পার্থিব অবস্থার বিদ্যমানতা লক্ষ্য করা যায়। এদের একটি হলো অজ্ঞানতা এবং অন্যটি হলো তৃষ্ণা।

আসক্তির কারণ নির্ভর করে অজ্ঞানতার মাঝে এবং আসক্তির দ্বারা তাড়িত হয়ে কিছু করা নির্ভর করে তৃষ্ণার মাঝে। সুতরাং লক্ষ্য করা যায় যে, এ দু'টিই আসলে একটি এবং এরা একত্রে সকল দুঃখের কারণও বটে।

যদি কোন ব্যক্তি অজ্ঞানতার মাঝে অবস্হান করে তাহলে সে কোন সময়েই সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে না। তার ভব তৃষ্ণা, লোলুপতা, কোন কিছুকে আঠার মত আঁকড়িয়ে ধরা এবং সবকিছুর মধ্যে আসক্তিপরায়ণ হয়ে বাস করাটা স্বাভাবিক। দর্শনে ও শ্রবণে এরূপ লাগামহীন আকাংখা মানুষকে মোহগ্রস্ত করে তোলে। এতে অনেকে তাদের দেহচ্যুতিও কামনা করে থাকে।

এরূপ প্রাথমিক উৎস হতেই সকল প্রকার লোভ, দ্বেষ, মোহ, ভুল বুঝাবুঝি, অসন্তুষ্টি, ঈর্ষা, তোষামোদ, প্রতারণা, অহংকার, ঘৃণা, প্রমত্ততা ও স্বার্থপরতা ইত্যাদি উৎপন্ন হয়।

২। লোভের উৎপত্তি হয় ভুল ধারণাজাত পাওয়ার ইচ্ছা, উপভোগের ইচ্ছা ইত্যাদি সন্তুষ্টি হতে; দ্বেষের উৎপত্তি হয় নিজের অহংবোধ এবং পারিপার্শ্বিক প্রতিকুলতা-জাত ভুল ধারণা হতে এবং মোহের উৎপত্তি হয় কোনটি সঠিক তা নির্ধারনে অক্ষম-তার দরুন।

লোভ, দ্বেষ এবং মোহ এ তিনটিকে পৃথিবীর আগুন বলা হয়। যারা লোভের দ্বারা আক্রান্ত, তারা লোভের আগুনে দগ্ধ হয়; যারা দ্বেষের দ্বারা আক্রান্ত, তারা দ্বেষের আগুনে দগ্ধ হয়; আবার যারা মোহের দ্বারা আক্রান্ত হয়, তারা মোহের আগুনে দগ্ধ হয়। কারণ তারা বুদ্ধের শিক্ষা শ্রবণ এবং চর্চা করে না।

এরূপে এ বিশ্ব নানা আকারে, নানা প্রকারের আগুনের দ্বারা দগ্ধ হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এ আগুন হলো, লোভ আগুন, দ্বেষ আগুন, মোহ আগুন, বুদ্ধি ভ্রষ্ট ও আমিত্বের আগুন, জ্বরা-জীর্ণতার আগুন, অসুস্হতা ও মৃত্যুর আগুন, দুঃখ দায়ক আগুন, আর্তনাদ করার আগুন ও নিদারুন অশান্তি যন্ত্রণার আগুন ইত্যাদি অন্যতম। জীবনের প্রায় প্রতিটি মুহূর্তে এ আগুন কোন না কোন ভাবে জ্বালাতন করছে। এ আগুন শুধু নিজেকে ধ্বংস করছে না; অন্যের দুঃখের কারণও হচ্ছে, এবং তাদেরকে শরীর, মন এবং বাক্যের দ্বারা খারাপ কাজেও প্রভাবিত করছে। এ আগুনের দ্বারা আক্রান্ত ক্ষতস্হানে সংক্রামক বিষাক্ত পূঁজ হয়, এবং ক্রমে সমস্ত মন ও শরীরকে আক্রান্ত করে। অন্য যারা এ আগুনের নিকটবর্তী হয়, তারাও এ আক্রমণের স্বীকার হয় এবং বিপথগামী হয়।

৩। তৃপ্তির চাহিদা থেকে লোভের উৎপত্তি, অতৃপ্তি থেকে দ্বেষের উৎপত্তি এবং মোহের উৎপত্তি হয় অকুশল চিন্তা থেকে। লোভের মধ্যে কিছুটা অকুশল জড়িত থাকে যা সহজে ত্যাগ করা যায় না। আবার দ্বেষের মাঝে অনেক অকুশল জড়িত থাকলেও তা সহজেই ত্যাগ করা যায়। মোহের মাঝে সবচেয়ে বেশী অকুশল নিহিত

থাকে যা ত্যাগ করা অতীব কঠিন ব্যাপার।

অতএব, এ আগুন মানুষের মনে যখন যেভাবেই উৎপন্ন হউক না কেন সঠিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে, অতৃপ্তিকে তৃপ্তির মাধ্যমে এবং বুদ্ধের মৈত্রী, করুণার শিক্ষা দ্বারা এগুলোকে ত্যাগ করা প্রয়োজন। যদি মন প্রজ্ঞা, পবিত্রতা এবং অহংকার হীনতার দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে; তাহলে মনে পার্থিব ভোগ বিলাসের কোন স্থান থাকবে না।

৪। লোভ, দ্বেষ এবং মোহ মানুষের শরীরে জ্বরের ন্যায় কাজ করে। যদি কেহ এ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে নিজের বাড়ীতে কিছু না করেই অবস্থান করে, তাহলে অনিদ্রা জনিত কারণে সে নিদারুন যন্ত্রণা ভোগ করবে।

আর যারা এ জ্বরে আক্রান্ত হয়নি তারা সমস্যাবিহীনভাবে সুখে ঘুমাতে পারে, তারা তীব্র শীতের রাতে পাতলা পাতার দ্বারা আবৃত ঘরে অথবা তীব্র গরমের রাতে ছোট্ট ঘরেও মহাসুখে নিদ্রায়িত হয়।

অতএব, লোভ, দ্বেষ ও মোহ এ তিনটি মানুষের সর্ব দুঃখের মূল। এ দুঃখের মূল উৎপাটন করতে হলে অবশ্যই সকলকে শীল, সমাধি এবং প্রজ্ঞার চর্চা করতে হবে। শীল অনুশীলনের মাধ্যমে লোভের পরিসমাপ্তি হয়, সম্যক সমাধির মাধ্যমে দ্বেষের পরিসমাপ্তি হয় এবং প্রজ্ঞার উৎপত্তির মাধ্যমে মোহের পরিসমাপ্তি হয়ে থাকে।

৫। মানুষের তৃষ্ণা অফুরন্ত। ইহা তৃষ্ণার্ত মানুষের লবণাক্ত জল সেবনের ন্যায়; যা তৃষিতের তৃপ্তিদানে অক্ষম এবং যা তৃষ্ণাকে শুধু বাড়িয়েই দেয়।

সুতরাং যারা এ তৃষ্ণাকে চরিতার্থ করতে আগ্রহী, তারাই শুধু অতৃপ্তির মহাসাগরে পতিত হয় এবং তাদের দুঃখ দুর্দশা দ্বিগুনাকারে বর্ধিত হয়।

তৃষ্ণার চরিতার্থকরন কখনও তৃপ্তিদায়ক নয়; যার পশ্চাতে সর্বদা চঞ্চলতা ও অস্বস্তিকর অবস্থা বিরাজ করে। এমনকি তাকে সহজে উপশমও করা যায় না।

আবার যদি কেহ সে তৃষ্ণার চরিতার্থকরণে কোন বাঁধার সম্মুখিন হয়, তাহলে এ বাঁধা তাকে উন্মাদ পাগলের ন্যায় করে তোলে।

তৃষ্ণাকে চরিতার্থ করার জন্যে মানুষেরা শত প্রতিকুলতার মধ্যেও একে অন্যের সাথে ঝগড়া করছে, রাজায় রাজায় দ্বন্ধ বাঁধছে, প্রজায় প্রজায় দ্বন্ধ বাঁধছে, পিতা-মাতার সাথে ছেলে-মেয়েদের দ্বন্ধ, ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্ধ, বোনে বোনে দ্বন্ধ, বন্ধুতে বন্ধুতে দ্বন্ধ লেগেই আছে। এমনকি নিজের তৃষ্ণাকে চরিতার্থ করার জন্যে একে অপরকে হত্যা করতেও দ্বিধা বোধ করে না।

মানুষেরা নিজেদের তৃষ্ণাকে চরিতার্থ করার জন্যে এমনকি নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে কুন্ঠাবোধ করে না। তারা চুরি, প্রতারণা ও ব্যভিচার করে এবং অভিযুক্ত হয়, ফলে অনুতপ্ত হয় ও অপকর্মের জন্যে শাস্তি ভোগ করে।

তারা নিজেদের শরীর, মন এবং বাক্যের দ্বারা অকুশল উৎপন্ন করে। তাদের সঠিকভাবে জানা উচিৎ যে, এ অকুশলজাত তৃষ্ণার চরিতার্থকরণ কেবল অশান্তি ও দুঃখই সৃষ্টি করে ও মনকে অপবিত্র করে এবং বিভিন্ন প্রকার শারীরিক ও মানসিক দুঃখ কষ্ট মানুষকে এ পৃথিবীতে যেমন ভোগ করতে হয়, তেমনি মৃত্যুর পরেও তা তাকে অনুসরণ করে।

৬। পার্থিব যত প্রকার আসক্তি আছে তাদের মধ্যে লোভই হলো সর্বপ্রধান। অন্যান্য সব আসক্তি লোভের দ্বারাই পরিচালিত হয়।

লোভ মাটির ন্যায় এবং অন্যান্য আসক্তি মাটির দ্বারা প্রচুর পরিমাণে বর্ধিত হয়। লোভ পিশাচের ন্যায়, যা এ পৃথিবীর সকল মূল্যবান বস্তু ভক্ষণ করে ফেলে। লোভ ফুলের আড়ালে লুকিয়ে থাকা বিষধর সর্পের ন্যায়, যা সৌন্দর্য অনুসন্ধানকারীকে দংশন করে। লোভ দ্রাক্ষালতার ন্যায় গাছের শাখা প্রশাখা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে; যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ গাছটি শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় মৃত্যুবরণ না করে। যতক্ষণ পর্যন্ত মন নির্জীব না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত লোভ কৌশলে মানুষের অনুভূতি নামক নরম অংশটিকে আঁকড়ে ধরে এবং মনের সকল উত্তম ধারণাগুলো ধ্বংস করে দেয়।

কলুষিত পথ

লোভ হলো অশুভ দৈত্যের বড়শির টোপ বিশেষ; যাতে অদূরদশী লোকেরা ধরা পড়ে এবং ফলশ্রুতিতে বিষম নরক যন্ত্রণা ভোগ করে।

যদি কোন একটি হাড় রক্তের প্রলেপে আবৃত থাকে, তাহলে তা কুকুর চিবাবে; যতক্ষণ পর্যন্ত না কুকুরটি পরিশ্রান্ত না হয় এবং নৈরাশ্য না হয়। তদ্রুপ লোভও যে কোন ব্যক্তির জন্যে ঐ কুকুরের হাড় চিবানোর ন্যায় যতক্ষণ পর্যন্ত না সে এই ব্যগ্র লালসা সম্পূর্ণ রূপে চরিতার্থ করতে পারবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত এতে অনুরক্ত থাকবে।

যদি দু'টো হিংস্র প্রাণীর সম্মুখে একটি মাংসের টুকরা ছুঁড়ে ফেলা হয় তাহলে তাদের মধ্যে তীব্র হিংস্রতার দ্বারা ঝগড়া বাঁধবে এবং তীক্ষ্ণ নখের মাধ্যমে মাংসের টুকরাটি নিজের বাগে আনার চেষ্টা করবে। একজন মানুষও তার বোকামির দ্বারা বায়ুর প্রতিকূলে মশাল ধরে নিজেকে দ্বগ্ধ করে। এ দু'টি হিংস্র প্রাণী এবং বোকা মানুষটির ন্যায় সাধারণত আমরাও নিজেদেরকে ব্যথিত করি এবং পার্থিব আসক্তির মাধ্যমে প্রতিনিয়ত দ্বগ্ধ হই।

৭। বাহিরের বিষাক্ত তীরের আক্রমন থেকে যদিও নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব, কিন্তু নিজের মনের ভেতর সৃষ্ট বিষাক্ত তীরের আক্রমন থেকে নিজেকে রক্ষা করা বড়ই কঠিন। লোভ, দ্বেষ, মোহ ও আমিত্বের দ্বারা বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে কাজ করা মানে, বিষাক্ত তীরের দ্বারা বিদ্ধ হয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হওয়া।

যদি মানুষ লোভ, দ্বেষ এবং মোহের দ্বারা আক্রান্ত হয়, মিথ্যা বলে, প্রতারণা করে, অপব্যবহার করে এবং এক মুখে দু'কথা বলে তাহলে তারা হত্যা, চুরি এবং ব্যভিচারের মাধ্যমে তাদের আসল রূপ প্রকাশ করে।

মনের দ্বারা তিন প্রকার অকুশল, বাক্যের দ্বারা চার প্রকার অকুশল এবং শরীরের দ্বারা তিন প্রকার অকুশল কর্ম সর্বমোট এই ১০ (দশ) প্রকার অকুশল কর্মের মাধ্যমেই অকুশল কর্মের সৃষ্টি।

কলুষিত পথ

যদি মানুষেরা মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত হয়, তাহলে তারা মনের অজান্তেই সব সময়ে মিথ্যা বলে থাকে। তারা দুর্নীতিপরায়ণ হওয়ার পূর্বেই মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত এবং যখন থেকে তারা মিথ্যা বলতে শুরু করে, তখন থেকে তারা নির্বিকারভাবে দুর্নীতিপরায়ণ হয়।

লোভ, লালসা, ভয়, রাগ, দুর্ভাগ্য এবং অসুখী অবস্হা সবই মোহ থেকে উৎপত্তি। অতএব, এ মোহই বিষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট।

৮। তৃষ্ণা হতে কাজ করার ইচ্ছা, আবার বিভিন্ন কাজ থেকে দুঃখের সৃষ্টি। কাজেই তৃষ্ণা, কাজ এবং দুঃখ চাকার ন্যায় অনন্ত কাল ধরে এ সংসারে ঘুরপাক খাচ্ছে।

ঘুরন্ত অবস্হায় চাকার শুরু যেমন দেখা যায় না, তেমনি শেষও দেখা যায় না। জন্মান্তরেও মানুষ তার সন্ধান পাবে না। পুনঃজন্মের নিয়মানুসারে এক জন্ম থেকে অন্য জন্মে এভাবে অনাদি অনন্তকাল ধরে চললেও তার পরিসমাপ্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না। যদি কেহ এ ধরাধামে তার জন্মান্তরের ভষ্মিত ছাই এবং হাড়গুলো কোথাও স্তুপাকারে রক্ষা করতো, তাহলে তা পর্বত সমান উঁচু হতো। আবার যদি কেহ পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে, যে পরিমাণ মাতৃ দুগ্ধ পান করেছিল তা সংগ্রহ করে রাখতো, তাহলে তাও গভীরতম সমুদ্রের জলের চেয়েও বেশী হতো।

যদিও সবার মাঝে বুদ্ধাঙ্কুর নিহিত আছে, কিন্তু ইহা পার্থিব আসক্তির গভীরে অবস্হান করার দরুন দীর্ঘদিন ধরে এর সন্ধান কেহই পায়নি। এই কারণেই মানুষেরা দুঃখ যন্ত্রণা অনিবার্য্যভাবে ভোগ করে আসছে এবং দুর্দশাগ্রস্হ জীবনের পরিসমাপ্তিও খুঁজে পাচ্ছে না।

কিন্তু আমরা যদি লোভ, দ্বেষ ও মোহের নিকট আত্নসমর্পন করি; তাহলে এ গুলোর দ্বারা অকুশল কর্মের সৃষ্টি হবে, যা পুনঃজন্মের হেতু হিসেবে কাজ করবে। সুতরাং বুদ্ধের প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে অকুশল কর্মের সমস্ত শিখর উৎপাটন করতে হবে এবং দুঃখের সংসারে পুনঃজন্ম রোধ করতে হবে।

২
মানুষের প্রকৃতি বা স্বরূপ

১। মানুষের প্রকৃতি বা স্বরূপ ঘন ঝোঁপের ন্যায়; যেখানে প্রবেশ করার কোন পথ নেই এবং যাকে বুঝা খুবই কঠিন। যদি আমরা পশুর সাথে তুলনা করি তাহলে পশুর প্রকৃতি বা স্বভাব বুঝা অনেকটা সহজতর। তবুও সাধারণত মানুষের প্রকৃতিকে বা স্বভাবকে ৪ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ কিছু মানুষ আছে যারা মিথ্যা দৃষ্টির দরুন কঠোর ব্রত পালন করে; যার দরুন কষ্ট ভোগ করে। দ্বিতীয়তঃ কিছু মানুষ আছে যারা নির্দয়তার দ্বারা, চুরির দ্বারা, হত্যার দ্বারা অথবা অন্য অমানবিক কাজের দ্বারা অপরকে কষ্ট দিয়ে থাকে। তৃতীয়তঃ কিছু মানুষ আছে যারা নিজেদের সাথে অন্যদেরকেও কষ্ট ভোগ করতে বাধ্য করে। চতুর্থতঃ আবার এমন কিছু মানুষ আছে নিজেরা কষ্ট ভোগ করলেও অন্যকে কষ্ট ভোগ করা থেকে বিরত থাকতে সাহায্য করে। বুদ্ধের শিক্ষানুসারে এ শেষোক্ত লোকেরাই লোভ, দ্বেষ ও মোহের বাহিরে অবস্হান করে এবং মৈত্রী ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে হত্যা এবং চুরি করা থেকে বিরত থেকে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করে থাকে।

২। এ পৃথিবীতে তিন প্রকারের মানুষ আছে। প্রথমতঃ যারা পাথরের উপর খোদাই করা বর্ণের ন্যায়; তারা সহজেই রাগ এবং রাগজাত চিন্তা পাথরের উপর খোদাই করা বর্ণমালার ন্যায় তাদের মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না। দ্বিতীয় প্রকারের মানুষেরা হলো বালুর উপর লিখিত বর্ণের ন্যায়। যদিও তাদের মনে রাগ থাকে, সে রাগ বালির ন্যায় ক্ষণভংগুর হয়। তৃতীয় প্রকারের মানুষেরা হলো চলন্ত পানির উপর লিখিত বর্ণের ন্যায়; যারা সাধারণত গত হতে চলেছে এমন কিছুকে ধরে রাখে না, অপব্যবহার এবং অস্বস্তিপূর্ণ গল্পগুজবে মনোযোগী হয় না। তাদের মন সবসময় পবিত্র ও শান্তিপূর্ণ অবস্হায় অবস্হান করে থাকে।

আবার ভিন্ন তিন প্রকারের মানুষ দেখা যায়। এদের প্রথমটি হলো, অহংকারী,

যারা তাড়াহুড়ার মধ্যে কাজ করে এবং তারা কখনও সন্তুষ্ট হতে পারে না। তাদেরকে খুব সহজেই বুঝা যায়। দ্বিতীয়টি হলো, তারা সাধারণত বিনয়ী এবং বিবেচনার মাধ্যমে কাজ করে থাকে। আবার তাদের স্বভাব বুঝতে কষ্ট হয়। তৃতীয় প্রকারের লোক, যারা তৃষ্ণাকে অতিক্রম করেছে। তাদেরকেও বুঝা খুবই কষ্টকর।

এভাবে মানুষকে বিভিন্নরূপে শ্রেনীবদ্ধ করা যায়। কিন্তু তাদের স্বভাব বুঝা খুবই কষ্টকর ব্যাপার। কেবল মাত্র বুদ্ধই তাদেরকে বুঝতে সক্ষম এবং তাঁর প্রজ্ঞা দ্বারা বিভিন্ন শিক্ষার মাধ্যমে তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে পারেন।

৩
মানব জীবন

১। মানব জীবন নিয়ে একটি রূপক কাহিনী আছে, যেখানে তার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। একদা এক ব্যক্তি নদীতে নৌকার দাঁড় টানছিল। নদীর পাড় থেকে কোন একজন লোক তাকে বিপদের সংকেত দিয়ে বললো, "দ্রুতগতিতে নৌকা চালানো বন্ধ কর; অনতিদূরে জলপ্রপাত আছে এবং একটি বিপদজনক ঘূর্ণিস্রোত আছে। ঐখানে কিছু কুমির ও দৈত্য পাথরের খাদের মধ্যে অপেক্ষা করছে। তুমি দ্রুতগতিতে নৌকা চালানো অব্যাহত রাখলে প্রান হারানোর ভয় আছে।"

এ রূপক কাহিনীর "দ্রুতগতি" হলো জীবনের ভোগ-লালসা; "দ্রুতগতিতে দাঁড় টানা" মানে আবেগের লাগামহীনতা স্বরূপ; "জলপ্রপাত" মানে দুঃখ-যন্ত্রণা অত্যাসন্ন; "ঘূর্ণি স্রোত" মানে কামনাসক্ত এবং "কুমির ও দৈত্য" মানে জীবনাবসানের কথা উপস্থাপন করা হয়েছে, যা ভোগ-লালসা এবং অসংযমতার দ্বারা সৃষ্ট। "নদীর পাড়ের একজন" মানে তিনি স্বয়ং বুদ্ধ।

এখানে অন্য একটি রূপক কাহিনী উপস্থাপন করা যাক। এক অপরাধী লোক

ছুটাছুটি করছে যা কয়েকজন প্রহরী লক্ষ্য করলো। সে নিজেকে লুকানোর জন্য একটি কূপে নেমে পড়লো, যেখানে দ্রাক্ষালতার ঝোঁপ ছিল। সে কূপে নামার পরে দেখলো যে, কূপের তলদেশে এক বিষধর সর্প। তাই সে দ্রাক্ষালতার সাহায্যে নিজেকে রক্ষা করার জন্যে উপরে উঠার চেষ্টা করলো। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল তার বাহু দুর্বল হয়ে আসছে। সে মুহূর্তে দেখা গেল দু'টো ইঁদুর। এদের একটি সাদা অন্যটি কালো। ইঁদুরগুলো দ্রাক্ষালতা চিবিয়ে খাচ্ছে।

এমতাবস্হায় দ্রাক্ষালতা যদি ছিঁড়ে পড়ে তাহলে সে বিষধর সর্পের উপর গিয়ে পড়বে এবং এতে তার জীবন শেষ হবে। হঠাৎ উপরের দিকে তাকাতেই সে একটি মধু পোকার বাসা দেখলো, যেখান থেকে মাঝে মাঝে এক ফোঁটা আধ ফোঁটা করে মধু ঝরে পড়ছে। লোকটি তার সমস্ত বিপদের কথা ভুলে গিয়ে আনন্দের সাথে মধু পান করতেছিল।

এখানে "এক জন মানুষ" মানে যে একা জন্মগ্রহণ করে, একা মৃত্যুবরণ করে, তার কথাই বলা হয়েছে। "প্রহরী" এবং "বিষধর সর্প" মানে শরীরের সকল প্রকার তৃষ্ণাকে বুঝানো হয়েছে। "দ্রাক্ষালতা" মানে বহমান জীবনের কথা বলা হয়েছে। "সাদা এবং কালো দু'টি ইঁদুর" দ্বারা দিন-রাত এবং সময় ক্ষেপনের কথাকে বুঝানো হয়েছে। "মধু" মানে জীবনের আনন্দময় অবস্হার কথা বুঝানো হয়েছে; যা বছরের পর বছর মানুষকে দুঃখ-কষ্টের দ্বারা প্রতারিত করে আসছে।

২। এখানে আরও একটি রূপক কাহিনী বর্ণনা করা যাক। এক রাজা ৪টি বিষধর সাপ একই বাক্সের মাঝে রেখে, তাঁর একজন চাকরকে এদের রক্ষনাবেক্ষণের কাজে নিয়োগ করলেন। রাজা সাপগুলোকে যথাযথ যত্ন করতে বললেন এবং তাকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন যে, সে যদি কোন একটা সাপের সাথে রাগ করে তাহলে তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে। এ কথা শুনে চাকরটি ভয়ে বাক্সটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল।

রাজা ৫জন পাহারাদার পাঠিয়ে তাকে ধরার ব্যবস্হা করলেন। পাহারাদারগণ তাকে খুঁজে বের করে, প্রথমে বন্ধু সুলভ আচরণ করে, তার নিকটবর্তী হলেন এবং

তাকে নিরাপদে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যেতে চাইলো। কিন্তু চাকরটি তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণে বিশ্বাস স্থাপন করতে না পেরে অন্য একটি গ্রামে পালিয়ে গেল।

হঠাৎ একদিন সে গায়েবী শব্দ শুনতে পেল যে, ঐ গ্রাম তার জন্যে নিরাপদ নয়। এও জানলো যে ঐ গ্রামে ৬জন জলদস্যু বাসা বেঁধে অবস্থান করছে এবং তাকে আক্রমন করার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। সুতরাং সে ভয়ে দৌঁড়ে ঐ গ্রাম ছাড়লো এবং গভীর এক নদীর ধারে এসে পৌঁছালো যেখানে তার যাত্রা বন্ধ হলো। সে কিছুক্ষণ পর বিপদের কথা মনে করলো। অবশেষে সে একটি ভেলা তৈরী করে প্রচন্ড বিক্ষোভপূর্ণ নদী পার হয়ে নিজের নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ স্থানে পৌঁছাল।

এ গল্পের "চারি বিষধর সাপ" মানে চারি মহাভূত-মাটি, পানি, আগুন ও বাতাস যার দ্বারা এ দেহ গঠিত। এ দেহ ও মন ভোগ লালসার দ্বারা তাড়িত হয়। সুতরাং মন শরীর থেকে বের হয়ে সর্বদা বাহিরে দৌঁড়াতে চেষ্টা করে।

"পাঁচজন পাহারাদার" যারা বন্ধুসুলভ কপটতায় তার নিকট এসেছিল, তারা হলো, পঞ্চস্কন্ধ, রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান-যার দ্বারা এ দেহ ও মন গঠিত।

"নিরাপদ বাসস্থান" মানে ষড়ায়তন, যা আসলে নিরাপদ নয়; এবং "৬ জন দস্যু" মানে ষড়ায়তনের ৬টি উদ্দেশ্য। অতএব, যখন সে ষড়ায়তন দ্বারা বিপদ অনুভব করলো তখন দৌড়ে অন্য একটি স্থানে গিয়ে পৌঁছালো; যেখানে প্রচন্ড বিক্ষোভপূর্ণ নদীর স্রোত ছিল। ঐ স্রোত এখানে পার্থিব আসক্তিরই বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করা হচ্ছে। অতএব, সে নিজেকে বুদ্ধের শিক্ষার মাধ্যমে ভেলা তৈরী করে প্রচন্ড বিক্ষোভপূর্ণ নদী পার হয়ে নিরাপদ স্থানে গমন করলো।

৩। এ পৃথিবীতে ৩ প্রকার বিপদাবস্থায় সন্তানেরা মাকে এবং মা সন্তানদেরকে সাহায্য করতে পারে না। এগুলো হলোঃ অগ্নিকান্ড, জলোচ্ছাস এবং সিদ কাটিয়ে চুরির সময়ে। যদিও এ বিপদ এবং দুঃসময়ে একে অপরকে সাহায্য করতে পারে না তবুও সহযোগিতা করার মত একটি সুযোগ থাকে।

কলুষিত পথ

কিন্তু ৩ প্রকার সময়ে মা সন্তানদেরকে এবং সন্তানেরা মাকে সাহায্য করতে পারে না। এগুলো হলো ঃ অসুস্হতার সময়, বয়োঃ বার্ধক্যতার সময় এবং মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্হায়।

মা যখন বয়োঃবৃদ্ধ হন তখন সন্তানেরা কিভাবে তাঁকে এই বার্ধক্যতা হতে মুক্ত করতে পারে ? আবার সন্তানেরা যখন অসুস্হ হয় তখন মা কিভাবে সন্তানের এই রোগ না হওয়ার নিশ্চয়তা দিতে পারেন ? অথবা যে কোন একজন যখন মৃত্যুর সম্মুখিন তখন অন্যজন কিভাবে তার মরণকে রোধ করবে ? এ অবস্হায় যে যতই একে অপরকে ভালবাসুক না কেন অথবা তাদের সম্পর্ক যতই গভীর হউক না কেন, কেহই কাকেও প্রকৃত পক্ষে সাহায্য করতে পারে না।

৪। এক সময় নরকের পৌরাণিক রাজা য্যামা অকুশল কর্মের ফলে নরকে পতিত এক লোককে জিজ্ঞাসা করলেন যে, জীবিত অবস্হায় সে কোন দিন ৩ জন স্বর্গের দূতকে দর্শন করেছিল কি ? লোকটি প্রত্যুত্তরে বললো, "না প্রভু ! আমি কোনদিন এরূপ কারও সাক্ষাত পাইনি।"

তখন য্যামা রাজা আবার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কোন দিন বয়সের ভারে নুয়ে পড়ে লাঠিতে ভার দিয়ে চলাফেরা করে এরূপ কোন মানুষকে দর্শন করেছো কি ? তখন লোকটি বললো, "হ্যাঁ প্রভু ! এরূপ লোক আমি প্রায় সময় দর্শন করতাম।" অতঃপর য্যামা রাজা তাকে বললেন, "তুমি বর্তমানে সেই অপরাধের শাস্তি হিসেবে এ কষ্ট ভোগ করছো। কারণ তুমি যখন ঐ বৃদ্ধ লোকটিকে দর্শন করেছিলে, তখন তাকে স্বর্গের দূত হিসেবে দর্শন করে, নিজেরও একই পরিণতির কথা যদি ভাবতে, তাহলে আজ তোমার এরূপ কষ্টভোগ করতে হত না।"

য্যামা রাজা পুনঃ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কোনদিন গরীব রোগী এবং অসহায় মানুষ দর্শন করেছ কি ?" লোকটি বললো, "হ্যাঁ প্রভু ! আমি এরূপ অনেক লোক দর্শন করেছি।" তখন য্যামা রাজা তাকে বললেন, "তুমি তাদেরকে স্বর্গের দূত হিসেবে দর্শন করোনি, যা তোমাকে সতর্ক করার জন্যে পাঠানো হয়েছিল।"

য্যামা রাজা লোকটিকে আরো একটি প্রশ্ন করলেন, "তুমি কোন দিন মৃত্যু দর্শন করেছ কি ? লোকটি বললো, "হ্যাঁ প্রভু ! অনেকবার দর্শন করেছিলাম এবং আমি নিজেও অনেকবার মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছিলাম।" য্যামা রাজা বললেন, "তুমি মৃত্যুকে স্বর্গের দূত হিসেবে মনে করোনি, করলে তোমার চিন্তা ধারার মাঝে পরিবর্তন আসতো এবং আজ নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হতো না।"

৫। একদা এক গ্রামে কৃশা গৌতমী নামের এক যুবতী তার ধনকুবের স্বামীর সাথে বাস করতো। সে তার পুত্রহারা হয়ে শোকে পাগলের মত হয়ে গিয়েছিল। সে মৃত পুত্রকে নিয়ে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে তার মৃত পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা চাইলো।

অবশ্য কেহই এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করতে পারলো না। অবশেষে বুদ্ধের এক অনুসারী তাকে বুদ্ধের দর্শন করতে বললো। সে সময়ে বুদ্ধ জেতবনে অবস্হান করছিলেন। মহিলাটি তার পুত্রের মৃত দেহটিকে নিয়ে বুদ্ধের সম্মুখে উপস্হিত হলো।

তখন বুদ্ধ করুণাময় দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এ মৃত শিশুটিকে প্রাণ দান করতে আমার কিছু সরিষার বীজ প্রয়োজন; তুমি ৪/৫টি সরিষার বীজ আন। বীজগুলো অবশ্যই এমন বাড়ী থেকে আনবে যে বাড়ীতে কোন দিন মৃত্যু আগমন করেনি।"

অতঃপর কৃশা গৌতমী মৃত্যু হয়নি এমন বাড়ী খুঁজতে লাগলো। কিন্তু মৃত্যু হয়নি এমন বাড়ী সে একটিও খুঁজে বের করতে পারলো না। শেষ পর্যন্ত সে বুদ্ধের নিকট গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলো। কিছুক্ষণ শান্ত থাকার পরে, সে নিজেই বুদ্ধের কথা উপলব্ধি করতে পারলো যে, জীবিতের মরণ নিশ্চিত। তখন সে মৃত দেহটিকে নিয়ে সমাধিস্হ করে, বুদ্ধের নিকট দীক্ষিত হয়ে তাঁর শিষ্যা হলো।

৪

মানব জীবনের বাস্তবতা

১। এ পৃথিবীর মানুষ অহংকার প্রবণ এবং সমবেদনাহীন। তারা একে অপরকে ভালবাসতে এবং সম্মান করতে জানে না। তারা তুচ্ছ ব্যপার নিয়ে তর্ক করে এবং ঝগড়া করে। ফলশ্রুতিতে নিজের ক্ষতি করে, কষ্টভোগ করে এবং জীবন অসুখী ও বিষন্ন করে তোলে।

মানুষ ধনী হউক বা দরিদ্রই হউক তারা সবসময়েই অর্থলিপসু হয়। কেহ বা দারিদ্রতার জন্যে, আবার কেহবা প্রাচুর্য্যতার কারণেই দুঃখ ভোগ করে থাকে। কারণ তাদের জীবন পরিচালিত হচ্ছে লোভের দ্বারা, তারা কখনও সন্তুষ্টতা লাভের চেষ্টা করে না।

ধনীলোক সবসময় তার ভূ-সম্পত্তি নিয়ে দুঃচিন্তায় থাকে। সে তার বৃহৎ বাসভবন এবং অন্যান্য সব সম্পত্তির ব্যাপারে চিন্তিত থাকে। সে আকস্মিক দুর্ঘটনায় পড়তে পারে, এমন দুঃশ্চিন্তাও তার থাকতে পারে। যেমন তার বৃহৎ বাসভবনে অগ্নিকান্ড ঘটতে পারে, ডাকাতি হতে পারে, এমনকি স্বয়ং তাকেও অপহরণ করে নিয়ে যেতে পারে ইত্যাদি। সে মৃত্যু এবং সম্পত্তির স্হানান্তরের কথা ভেবেও কষ্ট পান। অথচ মৃত্যুর সময় সে একাই মৃত্যুবরণ করে এবং কিছুই সে সাথে নিয়ে যেতে পারে না।

অপর দিকে, একজন দরিদ্রলোক সবসময় অপ্রতুলতায় ভোগে এবং অসংখ্য তৃষ্ণার জন্ম দেয়। যেমন ভূসম্পত্তি এবং বাড়ীঘর। সে ব্যগ্র লালসার দ্বারা তাড়িত হয়ে শরীর ও মনকে বহ্নিমান করে এবং মধ্যবয়সে মৃত্যু বরণ করে।

সমস্ত পৃথিবীকে সে নরক হিসেবে দর্শন করে। যদিও সে দীর্ঘদিন জীবিত ছিল, কিন্তু মৃত্যুর সময়েও সে একা মৃত্যুবরণ করে এবং কেহই তার পাশে থাকে না।

২। এ পৃথিবীতে ৫টি অকুশল কর্ম আছে। প্রথমটি হলো, নির্দয়তা-যা সমস্ত প্রাণীর

মধ্যেই আছে এবং যার দ্বারা একে অপরকে কষ্ট দেয়। সবল দুর্বলকে আঘাত করে, দুর্বলেরা সবলকে প্রতারণা করে। এভাবে প্রায় সকল জায়গায় দ্বন্দ্ব এবং নির্দয়তা চিরন্তন হয়ে বিরাজ করছে।

দ্বিতীয়টি হলো, পিতা-পুত্র, বড় এবং ছোট, স্বামী ও স্ত্রী, বয়োজৈষ্ঠ্য আত্নীয় এবং কনিষ্ঠের মধ্যে অধিকারের কোন সুনির্দিষ্ট নিশ্চয়তা নেই। প্রায় সময়েই দেখা যায় যে, প্রত্যেকেই শুধু নিজের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সুযোগ সুবিধার কথাই ভেবে থাকে। তারা একে অন্যকে প্রতারণা করে এবং তাদের মধ্যে আন্তরিকতার অভাব লক্ষ্য করা যায়।

তৃতীয়টি হলো, পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের আচরণ কিরূপ হওয়া উচিৎ এ ব্যাপারে তেমন কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। প্রায় সকলেই সময়ে অকুশল কাম চিন্তার দ্বারা তাড়িত হয়ে এমন কিছু করে বসে, যা তাকে মানুষের প্রশ্নের সম্মুখিন হতে হয়; যা প্রায়ই তর্ক, ঝগড়া, অবিচার এবং বিদ্বেষভাবের সৃষ্টি করে।

চতুর্থটি হলো, মানুষেরা সাধারণত একে অন্যের অধিকারকে সম্মান করে না। তারা নিজেদের প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে, কিন্তু অপরের প্রয়োজনীয়তাকে সেভাবে চিন্তা করে না। তাদের এরূপ মনোভাব অন্যকে অশালীন বাক্য প্রয়োগ, প্রতারণা, মিথ্যা অপবাদ এবং অপব্যবহার করতে সহায়তা করে।

পঞ্চমটি হলো, মানুষেরা সাধারণত অপরের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের অবহেলা করে। তারা সবসময় নিজেদের আরাম-আয়েশের কথা এবং তাদের তৃষ্ণাকে চরিতার্থ করার কথাই ভাবে। তারা যে সাহায্য পেয়েছিল তা ভুলে যায় এবং অপরের বিরক্তির কারণও তারা বুঝতে চায় না, যা মহা অবিচারের নামান্তরও বটে।

৩। মানুষকে বুঝতে হবে, একে অপরের প্রতি আরও বেশী সহানুভূতিশীল হওয়া উচিৎ। তাদের উচিৎ একে অপরকে সম্মান করা, ভাল কাজের প্রশংসা করা এবং বিপদের সময়ে একে অপরকে সহযোগিতা করা। কিন্তু বিপরীতে তারা স্বার্থপর

এবং কর্কশভাষী হিসেবে প্রতীয়মান হয়। তারা একে অপরের অনুপস্থিতিতে অবজ্ঞা করে এবং উন্নতিতে ঈর্ষাপরায়ণ হয়। সময়ে এ বিরূপতা সাধারণত খারাপের দিকে মোড় নেয় এবং সহ্যের বাহিরে চলে যায়।

ঘৃণার এই অনুভূতি হিংস্রতার মাধ্যমে কোন কিছু করলেও শেষ হয় না। এই বিষাক্ত অনুভূতি মানুষের জীবনে ঘৃণা ও রাগের জন্ম দেয়, যা মনের গভীরে দাগ কাটে। ফলে, ইহা মানুষকে সংসারাবর্তে পুনঃজন্ম লাভে সহায়তা করে থাকে।

ইহা সত্য যে, এই পৃথিবীতে মানুষ একা জন্মগ্রহণ করে এবং একা মৃত্যুবরণ করে। কেহই তার আপন কর্মের ফল এড়াতে পারে না। ইহা ইহজগতেই হোক বা পরজগতেই হোক।

কার্য্য-কারণ নীতি চিরন্তন সত্য। প্রত্যেকেরই নিজেদের পাপের বোঝা নিজেদেরকেই বহন করতে হবে এবং অবশ্যই নিজেকে এর ফল ভোগ করতে হবে। একইভাবে কুশল কর্ম মানুষকে কুশল ফল দিয়ে থাকে; সহানুভূতি ও ভালবাসাপূর্ণ সুখী জীবন হচ্ছে এই সুখময় কুশলের ফসল স্বরূপ।

৪। সময় যখন গত হয়, তখন মানুষেরা বুঝতে পারে যে কিভাবে তারা লোভের দ্বারা বঞ্চিত, অভ্যাসের দ্বারা পরিচালিত হয়ে দুঃখ ভোগ করছে। ফলে, তারা নিজেকে অসহায় ও যে কোন কাজে নিরুৎসাহবোধ করে। প্রায় কাজে নিরুৎসাহের কারণে তারা একে অন্যকে দোষারোপ করে, পরস্পরের সাথে ঝগড়া করে পাপের গভীরতায় তলিয়ে যায়, সৎ পথে অগ্রসর হওয়া থেকে পিছিয়ে পড়ে এবং পাপের পঙ্কিলতার মধ্যে অল্প বয়সেই জড়িয়ে পড়ে, আমৃত্যু দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করে। এভাবে তারা স্বর্গীয় জীবন যাপনের আশা ছেড়ে দিয়ে দুঃখ যন্ত্রণায় দিনযাপন করতে থাকে। এমনকি অকুশল কর্মের ফলে তাদেরকে এ পৃথিবীতে এবং মৃত্যুর পরে অপর জগতেও দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

ইহা অবশ্যই সত্য যে এই জীবনের সমস্ত কিছুই নশ্বর এবং অনিশ্চয়তায়

পরিপূর্ণ। এই সত্যটি উপলব্ধি না করাও অনুতাপের বিষয়। মানুষেরা সাধারণত সর্বদা আনন্দ ও তৃপ্তি সাধনেই ব্যস্ত।

৫। দুঃখে ভরপুর এই পৃথিবীতে ইহা স্বাভাবিক যে সকলেই আত্মকেন্দ্রীকতা এবং স্বার্থপরতার কথাই ভাবে। ফলশ্রুতিতে সকলেই সমভাবে দুঃখ-যন্ত্রণা ও দুর্দশাগ্রস্ত হয়।

মানুষেরা সাধারণত নিজের কথাই ভাবে অপরের কথা তেমন ভাবে না। তারা নিজেদের তৃষ্ণাকে কামনা ও লালসার দ্বারা তাড়িত হয়ে অকুশল কর্ম সম্পাদনে সহায়তা করে। এ কারণেও তাদেরকে অফুরন্ত কষ্ট ভোগ করতে হয়।

আরাম-আয়েশ ক্ষণস্থায়ী। ইহা সহজেই অতিক্রান্ত হয়। এ পৃথিবীর কিছুই চিরজীবন ভোগের নয়।

৬। সুতরাং মানুষের উচিৎ যখন তারা সমর্থবান এবং সুস্হাস্হ্যের অধিকারী, তখন পৃথিবীর পার্থিব ভোগ-লালসায় আকৃষ্ট না হয়ে গভীর আন্তরিকতার সাথে জ্ঞানানুসন্ধানী হওয়া; যার বাহিরে সুখের প্রকৃত আস্বাদ লাভ মোটেই সম্ভব নয়।

বেশীরভাগ লোকেরা এখনও অবিশ্বাস করে অথবা জানে না কার্য্য-কারণ নীতি কি ? তারা তাদের লোভ এবং অহংকারকে স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়। তারা আবার এও ধরে নেয় যে, ভালো কাজ সুখ বয়ে আনে এবং খারাপ কাজের দরুন দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়। তারা আন্তরিকভাবে এও বিশ্বাস করে না যে, এই পার্থিব জগতে যা কিছু করা হচ্ছে তার ফল ভবিষ্যতে ভোগ করতে হবে এবং এরই ফলশ্রুতিতে, পুণ্যবান ব্যক্তি পুরস্কৃত হবে এবং পাপী ব্যক্তি শাস্তি ভোগ করবে।

তারা তাদের বর্তমান কর্মের মর্মার্থ অনুধাবন করে না এবং বর্তমানের দুঃখ যন্ত্রণা যে তাদের দ্বারা সৃষ্ট এ ধারণাও ভুলে গিয়ে শুধু অনুতাপ করে এবং কান্নাকাটি করে থাকে। তারা শুধু বর্তমানের আশা-আকাংখা এবং দুঃখ-যন্ত্রণার কথাই ভাবে।

কলুষিত পথ

এই পৃথিবীতে স্থায়ী বলতে কিছুই নেই। সব কিছুই ক্ষণিক ও পরিবর্তনশীল এবং অকল্পনীয়। কিন্তু মানুষেরা অজ্ঞ এবং মোহ গ্রস্ত। ফলশ্রুতিতে, তারা কেবল মাত্র বর্তমানের আকাংখা এবং দুঃখ-যন্ত্রণাকে নিয়েই চিন্তা করে থাকে। তারা সঠিক শিক্ষাকে গ্রহণ করে না এবং তা উপলব্ধি করার চেষ্টাও করে না। তারা শুধু বর্তমানের ভোগ-লালসাযুক্ত চাহিদা এবং সম্পদের প্রতিই আকৃষ্ট।

৭। অনন্তকাল ধরে এই মোহময় এবং যন্ত্রণাময় পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব হয় এবং এখনও পর্যন্ত আবির্ভূত হচ্ছে। ইহা সত্যিই সৌভাগ্যের ব্যাপার যে, এখনও পর্যন্ত এ ধরাধামে বুদ্ধের ধর্ম শিক্ষা বিদ্যমান, যা মানুষেরা অনুসরণ করে উপকৃত হতে পারে।

এজন্যে সবাইকে গভীরভাবে চিন্তা করে মনকে সর্বদা লোভ, দ্বেষ ও মোহমুক্ত অবস্থায় এবং শরীরকেও এসব থেকে দূরে রেখে কুশল কর্মে নিয়োজিত রাখা প্রয়োজন।

সৌভাগ্যবশতঃ আমরা বুদ্ধের দর্শনের সন্ধান লাভ করেছি এবং এর প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রেখে ভবিষ্যতে আমরাও যাতে বুদ্ধত্বজ্ঞানের অধিকারী হতে পারি এরূপ প্রচেষ্টা থাকা প্রয়োজন। বুদ্ধের শিক্ষাকে অন্তর দিয়ে জানলে আমরা অন্যান্য তৃষ্ণা ও পাপময় পথ অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকবো এবং তাঁর শিক্ষাকে নিজে অনুসরণ করে অপরকেও অনুসরণে উৎসাহিত করতে পারবো।

৫ম পরিচ্ছেদ

বুদ্ধের দ্বারা নির্দেশিত মুক্তির পথ

১

অমিতাভ বুদ্ধের প্রার্থনা

১। পূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে যে মানুষেরা সচরাচর পার্থিব ভোগ-বিলাসের দ্বারা তাড়িত হয়ে পাপের উপর পাপ করে যাচ্ছে। এতে তারা অসহ্য যন্ত্রণায় দিনাতিপাত করছে। নিজের জ্ঞান শক্তির মাধ্যমে তৃষ্ণা এবং অসংযমতার যাঁতাকল থেকে বের হয়ে আসতে পারছে না। যদি তারা পার্থিব এ ভোগ বিলাস থেকে বের হয়ে আসতে না পারে তাহলে কিভাবে তারা নিজের মাঝে লুকায়িত বুদ্ধের স্বরূপ বুঝতে পারবে ?

বুদ্ধ মানুষের স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করে, তাঁর মহা করুণা দৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের কল্যাণের জন্যে সব কিছুই শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তিনি কঠোর সাধনা করে মানুষের ভয় এবং দুঃখমুক্তির পথ আবিস্কার করেছেন। এ মুক্তির পথ অনুসন্ধানে তিনি নিজেকে বোধিসত্ত্ব রূপে অনাদি অনন্তকাল ধরে এ ধরাধামে আত্নপ্রকাশ করেছেন এবং তাঁর পারমি সম্ভার পূর্ণতার সাধনাকালে নিম্নোক্ত ১০টি প্রার্থনা করে গেছেন ঃ

(ক) "যদিও আমি বুদ্ধত্বজ্ঞান উপলব্ধির সাধনা করছি, কিন্তু আমি পরিপূর্ণতা অর্জন করবো না, যতক্ষণ পর্যন্ত না এ ধরার সকলেই সর্বজ্ঞতা বা বুদ্ধত্বজ্ঞান উপলব্ধি না করে।"

(খ) "যদিও আমি বুদ্ধত্বজ্ঞান উপলব্ধির সাধনা করছি, কিন্তু ততদিন আমি পরিপূর্ণতা অর্জন করবো না, যতদিন পর্যন্ত আমার জ্ঞানের আলো সমগ্র পৃথিবীতে পৌঁছাবে না।"

বুদ্ধের দ্বারা নির্দেশিত মুক্তির পথ

(গ) "যদিও আমি বুদ্ধত্বজ্ঞান উপলব্ধির সাধনা করছি, কিন্তু ততদিন আমি পরিপূর্ণতা অর্জন করবো না, যতদিন পর্যন্ত না আমার প্রাণবায়ু থাকবে ততদিন পর্যন্ত আমি মানুষকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করাবো।"

(ঘ) "যদিও আমি বুদ্ধত্বজ্ঞান উপলব্ধির সাধনা করছি, কিন্তু ততদিন আমি পরিপূর্ণতা অর্জন করবো না, যতদিন পর্যন্ত দশ দিকের বুদ্ধের ন্যায় একত্রে আমার নামও উচ্চারিত হবে না।"

(ঙ) "যদিও আমি বুদ্ধত্বজ্ঞান উপলব্ধির সাধনা করছি, কিন্তু আমি পরিপূর্ণতা অর্জন ততদিন করবো না, যতদিন পর্যন্ত এই পৃথিবীর মানুষেরা আন্তরিকতার সাথে ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আমার পথনির্দেশিকা অনুসরণ করে আমার রাজ্যে জন্মাবে না।"

(চ) "যদিও আমি বুদ্ধত্বজ্ঞান উপলব্ধির সাধনা করছি, কিন্তু ততদিন আমি পরিপূর্ণতা অর্জন করবো না, যতদিন পর্যন্ত না প্রায় সব জায়গার মানুষেরা সর্বজ্ঞতাজ্ঞান উপলব্ধি করতে পারবে না, কুশল কর্ম সম্পাদন করবে না এবং আমার রাজ্যে জন্মগ্রহণ করবে না। তখন আমি তাদের মৃত্যুর পূর্বক্ষণে অসংখ্য বোধিসত্ত্বকে সাথে নিয়ে উপস্থিত হয়ে আমার রাজ্যে তাদেরকে স্বাগত জানাবো।"

(ছ) "যদিও আমি বুদ্ধত্বজ্ঞান উপলব্ধির সাধনা করছি, কিন্তু ততদিন আমি পরিপূর্ণতা অর্জন করবো না, যতদিন পর্যন্ত না মানুষেরা সর্বস্থানে আমার শিক্ষা সম্পর্কে জানবে না, আমার রাজ্য সম্পর্কে ভাববে না, আমার রাজ্যে উৎপন্ন হওয়ার কথা চিন্তা করবে না এবং শেষ পর্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তাদের সকল আশা-আকাংখা পরিপূরণে সহায়ক স্বরূপ কুশল কর্মবীজ বপন করবে না।"

(জ) "যদিও আমি বুদ্ধত্বজ্ঞান উপলব্ধির সাধনা করছি, কিন্তু ততদিন আমি পরিপূর্ণতা অর্জন করবো না, যতদিন পর্যন্ত না আমার রাজ্যে উৎপন্ন সবাই সর্বজ্ঞতাজ্ঞান উপলব্ধি করতে সক্ষম এবং আরও অনেককে ঐ পথ প্রদর্শনে

সক্ষম ও মহামৈত্রীর চর্চা না করে।”

(ঝ) “যদিও আমি বুদ্ধত্বজ্ঞান উপলব্ধির সাধনা করছি, কিন্তু ততদিন আমি পরিপূর্ণতা অর্জন করবো না, যতদিন পর্যন্ত না ত্রিলোকের মানুষেরা আমার মৈত্রীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের দেহ ও মনকে পরিশোধিত না করে এবং এই পার্থিব জীবনধারার উর্দ্ধে উঠে না আসে।”

(ঞ) “যদিও আমি বুদ্ধত্বজ্ঞান উপলব্ধির সাধনা করছি, কিন্তু ততদিন আমি পরিপূর্ণতা অর্জন করবো না, যতদিন পর্যন্ত না মানুষেরা সর্বত্র আমার শিক্ষাকে ধারণ করছে এবং জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করছে। পরিশুদ্ধ ও শান্ত মন সৃষ্টির মাধ্যমে পার্থিব আকাংখা এবং দুঃখ যন্ত্রণায় স্হির অবস্হায় অবস্হান করার প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করছে।”

এগুলোই হলো আমার প্রার্থনা। যতদিন পর্যন্ত এগুলো পরিপূর্ণ না হয় ততদিন আমি যেন পরিপূর্ণতা অর্জন না করি। আমি অসংখ্য আঁধারে আলোর অফুরন্ত উৎস হিসেবে পরিণত হই। আমার প্রজ্ঞা ও কুশল সম্পদ সবার জন্যে উন্মুক্ত। সমস্ত জগত আলোকিত হউক এবং সকল দুঃখ-যন্ত্রণাগ্রস্ত মানুষ মুক্তি পথের সন্ধান লাভ করুক।

২। যুগ যুগ ধরে অসংখ্য পুন্যরাশি সঞ্চিত করে তিনি অমিতাভ বুদ্ধ হিসেবে, অফুরন্ত আলোর বুদ্ধ হিসেবে বা অসংখ্য জন্মের বুদ্ধ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি তার পবিত্র বুদ্ধ রাজ্যে শান্ত স্নিগ্ধতার সাথে অবস্হান করে সমস্ত প্রাণীকে তাঁর রাজ্যে আগমনের জন্যে তাঁর শিক্ষার মাধ্যমে আলোকিত করেছেন।

বুদ্ধের এ পবিত্র রাজ্যে কোন প্রকার দুঃখ যন্ত্রণা নেই। ওখানে পরম সুখ এবং শান্তিতে ভরপুর। ঐ রাজ্যে যারা বসবাস করে তারা যখন ইচ্ছা তখনই পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যদ্রব্য এবং সকল প্রকার আকর্ষণীয় দ্রব্য সামগ্রী তাদের হস্তগত হয়। যখন মৃদু সমীরণ প্রবাহিত হয় তখন মণি-মুক্তা দ্বারা ভারাক্রান্ত বৃক্ষের শব্দ বুদ্ধের

বুদ্ধের দ্বারা নির্দেশিত মুক্তির পথ

পবিত্র শিক্ষার সুরেলা ধ্বনিতে ভরে যায় এবং ঐ শব্দ যারা শ্রবণ করে তাদের মনও কোমলতায় ভরে যায়।

পবিত্র এ রাজ্যে অসংখ্য সুরভিত পদ্ম ফুল যার প্রতিটিতে রয়েছে অপূর্ব পাপড়ি যা অবর্ণনীয় সৌন্দর্য্যে আলোকিত করে চারিধার। পদ্ম ফুলের রশ্মি প্রজ্ঞার পথকে আলোকিত করে এবং যারা বুদ্ধের পবিত্র শিক্ষা শ্রবণ করে তারাই পরম শান্তির দিকে অগ্রসর হয়।

৩। দশদিকের সকল বুদ্ধগণ অমিতাভ বুদ্ধের অসংখ্য আলো এবং অসংখ্য জীবনের প্রশংসা করছেন।

সুতরাং যে যতবেশী বুদ্ধের নাম শ্রবণ করবে এবং আনন্দের সাথে তা গ্রহণ করবে, তার মন এবং বুদ্ধের মন এক হবে। পরিশেষে সে মহা আনন্দময় এবং পবিত্রময় বুদ্ধ রাজ্যে তিনি আবির্ভূত হবেন।

যারা পবিত্র ঐ রাজ্যে উৎপন্ন হবেন, তাঁরা বুদ্ধের অসংখ্য জন্মের অংশীদার হবেন; এবং তাদের মন সবসময় সমস্ত দুঃখভোগী প্রাণীর প্রতি করুণাসিক্ত হবে এবং তাঁরা পরিস্কারভাবে বুদ্ধের মুক্তির পথ প্রচারে সক্ষম হবেন।

এ প্রার্থনায় অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা পার্থিব আসক্তি হতে দূরে থেকে এই পৃথিবীর অনিত্যতাকে অনুধাবন করবেন। ফলে তাঁরা তাঁদের অর্জিত সমস্ত পুন্যরাশি সকল প্রাণীর জন্যে উৎসর্গ করতে পারেন। তাঁরা তাঁদের জীবনের সাথে অন্যের জীবনের অখন্ডতা প্রকাশ করবেন, মায়া মরীচিকা এবং দুঃখযন্ত্রণার সময়ে, এমনকি এই পৃথিবীর আসক্তিরূপ বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের সময়েও তাদের এই অখন্ডতা বজায় থাকে।

তাঁরা এই জীবনের বাঁধা এবং অসুবিধার কথা জানেন, এমনকি বুদ্ধের অন্তরে সুপ্ত অসংখ্য করুণার কথাও তাঁরা বুঝেন। তাঁরা মুক্তভাবে বিচরণ করতে পারেন। এমনকি মুক্তভাবে বিচরণ করবেন কি করবেন না, তাও তাঁদের ইচ্ছার উপর নির্ভর

করে। কিন্তু তাঁরা বুদ্ধের করুণায় অনুপ্রাণিতদের জন্যে মৃত্যুর পরে অপেক্ষাও করতে পারেন।

সুতরাং যদি কেহ অমিতাভ বুদ্ধের নাম স্মরণ করে, তাকে তা সঠিক বিশ্বাসের মাধ্যমে স্মরণ করার জন্যে উৎসাহিত করা প্রয়োজন; যাতে সেও বুদ্ধের করুণা লাভে সক্ষম হয়। এই পৃথিবীর পার্থিব ভোগ বিলাসের মহা আগুনের মধ্যে অবস্থান করলেও সকলেরই উচিৎ বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করা এবং অনুসরণ করা।

যদি মানুষেরা সত্যিই আন্তরিকতার সাথে সর্বজ্ঞতাজ্ঞান লাভে আগ্রহী হয় তাদেরকে অবশ্যই বুদ্ধের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। সাধারণ মানুষের দ্বারা বুদ্ধের প্রকৃতি নির্ণয় করা বড়ই দুষ্কর ব্যাপার। এজন্য প্রয়োজন তাঁর শিক্ষা হতে সহযোগিতা নেয়া।

৪। বুদ্ধ অমিতাভ আমাদের থেকে দূরে নয়। তাঁর পবিত্র রাজ্য পশ্চিম দিকে বলে বর্ণনা থাকলেও তিনি ধার্মিক ব্যক্তির হৃদয়ের মাঝে অবস্থান করছেন।

যখন মানুষেরা মনে মনে বুদ্ধ অমিতাভের উজ্জ্বল সোনালী দীপ্ত প্রতিকৃতি অংকন করে, তখন ঐ ছবি চুরাশি হাজার প্রতিকৃতিতে পরিণত হয়। আবার প্রতিটি ছবি চুরাশি হাজার রশ্মির মাধ্যমে এই পৃথিবীকে আলোকিত করে। এই পৃথিবীতে যারা অমিতাভ বুদ্ধের নাম স্মরণ করে, তাদের কাউকে অন্ধকারে রাখা হবে না। তিনি সবাইকে মুক্তির আলো প্রাপ্তির জন্যে সহযোগিতা করে যাবেন।

বুদ্ধের প্রতিকৃতি দর্শনের মাধ্যমে আমরা তাঁর মনকে বুঝতে সক্ষম হবো। বুদ্ধের মন মহাকরুণায় ভরপুর, যারা তাঁকে বিশ্বাস করে তাদের মাঝে এবং যারা মূর্খ ও অমনোযোগী তাদের মাঝেও তাঁর মহাকরুণার স্পর্শ লক্ষ্য করা যায়।

যাদের মধ্যে বিশ্বাস আছে, তিনি তাদেরকে তাঁর পথে আসার শ্রেষ্ঠ সুযোগ প্রদান করেন। বুদ্ধের এই দেহ সর্বত্র সমান। যিনি বুদ্ধের কথা ভাবেন, বুদ্ধও তাঁর কথা ভাবেন এবং তাঁর মনের মাঝে সহজেই উপস্থিত হন।

বুদ্ধের দ্বারা নির্দেশিত মুক্তির পথ

তার অর্থ এই যে, যখন একজন ব্যক্তি বুদ্ধের কথা স্মরণ করেন; তখন তার চিত্তও বুদ্ধ চিত্তের ন্যায় পবিত্র ও সুখ শান্তিতে ভরে উঠে। অন্য কথায় বলতে গেলে তখন তাঁর মন বুদ্ধের মনের ন্যায় হয়ে যায়।

সুতরাং প্রত্যেকটি মানুষ পরিশুদ্ধ ও আন্তরিক বিশ্বাসের মাধ্যমে নিজের মনকে বুদ্ধের মনে পরিণত করতে পারে।

৫। বুদ্ধ বিভিন্ন মহিমায় আবির্ভূত হতে পারেন এবং মানুষের ভক্তি ও শ্রদ্ধার মাধ্যমে তিনি বিভিন্নরূপে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হন।

তিনি স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হওয়ার জন্যে সম্পূর্ন আকাশকে ঢেকে দেয়ার ন্যায় তাঁর দেহকে প্রসারিত করতে পারেন। তিনি নিজেকে প্রকৃতির মাঝে পরিমাণ অনুসারে ক্ষুদ্র, সময়ে আকৃতি, সময়ে শক্তিতে, সময়ে মনের মাঝে এবং সময়ে ব্যক্তিত্বের মাঝেও তাঁর মহিমাকে রূপান্তরিত করতে পারেন।

কিন্তু সময়ে তিনি শ্রদ্ধার সাথে যারা তাঁর নাম স্মরণ করেন, তাঁদের নিকট উপস্হিত হতে পারেন। ঐ সময়ে তিনি ২ জন বোধিসত্ত্বকে সাথে নিয়ে হাজির হন। তাঁদের একজন হলেন অবলোকিতেশ্বর, যিনি করুণাসম্পন্ন বোধিসত্ত্ব বলে মনে করা হয়; এবং অন্যজন হলেন মহাস্হমা প্রাপ্তা, যিনি প্রজ্ঞাসম্পন্ন বোধিসত্ত্ব বলে ধারণা করা হয়। বুদ্ধ অমিতাভের মহিমা পৃথিবীর সর্বত্রই বিদ্যমান, কিন্তু শুধুমাত্র শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিরা তা উপলব্ধি করতে সক্ষম।

যারা ইহজীবনে তাঁর এ মহিমা দর্শন করে, তারা অফুরন্ত সন্তুষ্টি এবং সুখ ভোগ করে থাকে। অধিকন্তু যারা প্রকৃত বুদ্ধের দর্শন লাভ করে তারা ধারণাতীত সৌভাগ্যবান এবং শান্তি সুখ উপলব্ধি করে।

৬। যেহেতু বুদ্ধচিত্ত সমস্ত প্রাণীর প্রতি সদয় এবং করুণা সম্পন্ন, সেহেতু তিনি সকলকে রক্ষা করবেনই।

বুদ্ধের দ্বারা নির্দেশিত মুক্তির পথ

তবে, বেশীর ভাগ পাপী মানুষ যারা অকল্পনীয় খারাপ কাজ করে, যাদের মন লোভ, দ্বেষ ও মোহে পরিপূর্ণ, যারা মিথ্যা বলে, গল্পবাজ, অপব্যবহার করে এবং প্রতারণা করে, যারা হত্যা করে, চুরি করে, ও ব্যভিচার করে, যাদের জীবন খারাপ কাজের মাধ্যমে অতিবাহিত হয়ে আসছে, তাদেরকে পৃথক পৃথক ভাবে অসংখ্য সময় ধরে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

একজন সৎ বন্ধু যেমন বিপদের সময়ে বন্ধুর পাশে এসে দাঁড়ায় এবং তাকে লক্ষ্য করে বলে, "তুমি এখন মৃত্যুর সম্মুখীন, তুমি তোমার পাপকর্মকে মুছে ফেলতে পারবে না। কিন্তু তুমি অসীম করুণাময় অমিতাভ বুদ্ধের নাম স্মরণ করে তাঁর পথ অনুসরণ করতে পারো।"

যদি পাপ কর্ম সম্পাদনকারীরা একাগ্রচিত্তে পবিত্র অমিতাভ বুদ্ধের নাম স্মরণ করে, তাহলে তাদের দ্বারা কৃত সব পাপকর্মের বিপাক হতে রেহাই পেয়ে মুক্ত হতে পারে।

যদি শুধু বার বার পবিত্র অমিতাভ বুদ্ধের নাম স্মরণ করে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অমিতাভ বুদ্ধের উপর তার একাগ্রতা চিত্ত উৎপন্ন করতে পারে, তাতেও তার পাপকর্ম মুক্ত হয়।

অতএব, জীবনের শেষান্তে যারা পবিত্র অমিতাভ বুদ্ধের নাম স্মরণ করবে, তারা বুদ্ধের সাক্ষাৎ পাবে এবং করুণা সম্পন্ন ও প্রজ্ঞাবান বোধিসত্ত্বেরও সাক্ষাৎ পাবে এবং তাদের মাধ্যমে বুদ্ধ ভূমিতে পথ নির্দেশনা দেয়া হবে, যেখানে তারা সবাই শুভ্র পদ্মের ন্যায় প্রস্ফুটিত হবে।

সুতরাং, তাদের সবার উচিৎ "নমো অমিতাভ বুদ্ধ" শব্দটি মনে রাখা অথবা সম্পূর্ণ অন্তর দিয়ে অফুরন্ত আলোর বুদ্ধও তাঁর সীমাহীন জীবনের উপর বিশ্বাস স্হাপন করা।

বুদ্ধের দ্বারা নির্দেশিত মুক্তির পথ

২

বুদ্ধভূমি শুদ্ধাবাস

১। অসংখ্য আলোকে আলোকিত বুদ্ধ সীমাহীন জীবন থেকে তাঁর শিক্ষা প্রচার করে আসছেন। তাঁর রাজ্যে কোন প্রকারের দুঃখ কষ্ট নেই, নেই কোন অন্ধকার এবং প্রতিটি মুহূর্ত্ত অতিবাহিত হয় আনন্দের মাধ্যমে। তাই এই ভূমিকে শুদ্ধাবাস বলা হয়।

এ শুদ্ধাবাসের মধ্যস্থলে পবিত্র জলে আবৃত একটি জলাধার আছে, ঐ জল স্বচ্ছ এবং ঝলমল করে, যার ঢেউ সোনালী বর্ণের বালুর তীরের সাথে মৃদু আঘাত করে। এদিকে সেদিকে রথের চাকার ন্যায় বড় বড় পদ্ম ফুল প্রস্ফুটিত হয়ে বিভিন্ন আলোকে আলোকিত হয়ে আছে। নীল বাতি থেকে নীল আলো, হলুদ বাতি থেকে হলুদ আলো, লাল বাতি থেকে লাল আলো, সাদা বাতি থেকে সাদা আলোয় পদ্ম ফুলগুলোকে দেখলে অপূর্ব মনে হয় এবং ফুলগুলোর সৌরভে বাতাসও সুরভিত হয়।

জলাধারের এক প্রান্তে স্বর্ণ, রৌপ্য, নীলকান্তমণি এবং স্ফটিক দ্বারা তৈরী কারুকার্যময় বৃহৎ চত্বর যেখান থেকে উজ্জ্বল মার্বেল পাথরের সিঁড়ি জল পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। অন্য প্রান্তে নীচু পাঁচিল এবং সূক্ষ্মাগ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভ বিশেষ পানির উপরে ঝুলছে এবং পাতলা কাপড়ের দ্বারা পরিবেষ্টিত মূল্যবান রত্ন। এ দুটির মাঝখানে সুগন্ধিযুক্ত তরু বিথীকা এবং কুসুম কানন।

স্হানটি সৌন্দর্য্যে ঝলমল করছে এবং বাতাসে স্বর্গীয় সুরের স্পন্দন শুনা যায়। দিবা রাত্রি ছয়বার আকাশ থেকে মনোমুগ্ধকর আভাযুক্ত ফুলের পাপড়ি পতিত হয় এবং ওগুলো লোকেরা সংগ্রহ করে ফুলদানিতে করে অন্যান্য সকল বুদ্ধভূমির জন্যে এবং দশসহস্র বুদ্ধের উদ্দেশ্যে পূজা করে থাকে।

২। এ বিস্ময়কর পৃথিবীতে অনেক পাখি আছে। যেমন তুষারের ন্যায় শুভ্র সারস পাখি, রাজহংস, জমকালো রংয়ের ময়ূর, ক্রান্তীয় ঋতুর স্বর্গীয় পশুপাখি এবং ছোট ছোট পাখিদলের মন মাতানো গানের মূর্ছনা সত্যিই উপভোগ্য। বুদ্ধভূমি শুদ্ধাবাসের পাখিরা তাদের সুমধুর গানের সুরে বুদ্ধের শিক্ষাকে প্রচার করছে এবং তাঁর গুণরাশির প্রশংসা করছে।

যারাই এ সুমধুর ধ্বনি শ্রবণ করেন তারাই স্বয়ং বুদ্ধের সুরলা মধুর ধ্বনি শ্রবণ করেন এবং বুদ্ধের অন্যান্য অনুসারীদের সাথে এক হয়ে নূতন বিশ্বাস, আনন্দ ও শান্তিতে উদ্ভাসিত হন।

পশ্চিমা মৃদু সমীরণ ঐ শুদ্ধাবাসের গাছের পাতার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। স্বর্গীয় উদ্যানের পর্দার ভিতর দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে সৌরভ এবং মধুর গানের মূর্ছনা।

মানুষেরা স্বর্গীয় এ গানের ক্ষীন প্রতিধ্বনির মধ্যে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের গুণের কথা শুনতে পায়। তখন এ সব গুণরাজির মহত্ত্বতাই শুদ্ধাবাসের মধ্যে বাস্তবে প্রতিফলিত হয়।

৩। কি কারণে এ শুদ্ধাবাসের বুদ্ধকে অমিতাভ বুদ্ধ বলা হয় ? কারণ তিনি অসীম আলোর উৎস এবং অসংখ্য জীবনের আঁধার। আরও উল্লেখ্য যে শুদ্ধাবাসের ভিতরে এবং বাহিরে বুদ্ধের অত্যুৎকর্ষ শিক্ষার আলো অব্যাহতভাবে বিকশিত হচ্ছে। ইহার কারণ তাঁর প্রানবন্ত করুণার বাণী কখনও অসংখ্য প্রাণী এবং মহাকালের মধ্যেও ক্ষীন হয় না।

শুদ্ধাবাসে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরা, এবং যাঁরা প্রকৃত পক্ষে সর্বজ্ঞতাজ্ঞান উপলব্ধি করেছেন তাঁরা পুনঃ এ মোহময় এবং অনিত্যময় জগতে জন্মগ্রহণ করবেন না।

এ কারণে যাঁরা বর্তমান বুদ্ধের শিক্ষার আলোকে আলোকিত হয়ে নূতন জীবন

শুরু করেছেন, তাঁরাও সংখ্যার দিক থেকে অনেক।

সুতরাং প্রত্যেক মানুষের উচিৎ একাগ্র চিত্তে বর্তমান বুদ্ধের শিক্ষার অনুশীলন এবং বুদ্ধ অমিতাভের নাম স্মরণ করা। এমনকি মৃত্যুর একদিন পূর্বে অথবা ৭ দিন পূর্বেও যদি কোন ব্যক্তি প্রকৃত শ্রদ্ধাচিত্তে বুদ্ধ অমিতাভের নাম স্মরণ করেন তাহলে ঐ সময়ে অমিতাভ বুদ্ধ তাঁর পবিত্র শিষ্যসংঘের মাধ্যমে পরিবৃত হয়ে মৃত্যু পথযাত্রীর সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে তাকে শুদ্ধাবাসে নিয়ে যাবেন।

যদি কোন ব্যক্তি অমিতাভ বুদ্ধের নাম শুনে তাঁর শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা উৎপন্ন করে, একাগ্র নিষ্ঠার সাথে তা অনুশীলন করে, তাহলে সে সর্বজ্ঞতাজ্ঞানও উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

অনুশীলন পদ্ধতি

১ম পরিচ্ছেদ
বিশুদ্ধিতা লাভের উপায়

১
মনের বিশুদ্ধিতা

১। মানুষেরা সাধারণত বৈষয়িক কাজে লিপ্ত, যা তাদেরকে মোহাসক্ত করে এবং দুঃখ কষ্টের দিকে নিয়ে যায়। বৈষয়িক আসক্তি হতে মুক্তির পথ ৫ (পাঁচ) প্রকার। এগুলো হলো নিম্নরূপ ঃ

প্রথমতঃ তাদেরকে এ বিশ্বের সকল বস্তু সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকতে হবে। ঐ ধারণা সতর্ক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে। এবং সঠিকভাবে বস্তুর কার্য-কারণ নীতির মর্মার্থ বুঝতে হবে। দুঃখের প্রকৃত কারণ হচ্ছে বৈষয়িক আসক্তি। ঐ আসক্তি জন্ম নেয় অহংকার মূলক ভ্রান্ত ধারণা থেকেই। এ কারণে মানুষ কার্য-কারণ নীতির মর্মার্থকে উপলব্ধি করতে পারে না। সুতরাং বৈষয়িক আসক্তির এ ভ্রান্ত ধারণার মূল উৎপাটনের মাধ্যমেই মনের প্রকৃত শান্তি আনয়ন সম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ মানুষেরা এ ভ্রান্ত ধারণা এবং বৈষয়িক আসক্তি থেকে সতর্কতা এবং সহিষ্ণুতার মাধ্যমে মানসিক সংযমতার দ্বারা বের হয়ে আসতে সক্ষম। কার্যকর মানসিক সংযমতার দ্বারা তারা চোখ, কান, নাক, জিহ্বা এবং শরীরের মাধ্যমে ক্রমাগত যে আসক্তির উৎপত্তি হয় তা বর্জন করতে পারে এবং এভাবে পরে বৈষয়িক আসক্তির মূল উৎপাটন করতে পারে।

তৃতীয়তঃ বস্তুর ব্যবহারেও তাদের সঠিক ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। ধরা যাক, খাদ্য দ্রব্য এবং কাপড়চোপড়ের কথা। এগুলোর ব্যবহার আরাম আয়েশের জন্য নয়, শরীরের প্রয়োজনে। কাপড় প্রয়োজন হয় শরীরকে গরম ও ঠান্ডা হতে রক্ষা করার জন্যে এবং লজ্জাজনক স্থান আচ্ছাদনের জন্যে। আর খাদ্যের প্রয়োজন হয় যখন সর্বজ্ঞতাজ্ঞান লাভের আশায় অনুশীলন করে তখন শরীরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে।

এভাবে চিন্তা করলে বৈষয়িক আসক্তি উৎপন্ন হয় না।

চতুর্থতঃ মানুষের সহিষ্ণুতা শিক্ষা করা উচিৎ। তাদের উচিৎ গরমে ও শীতে, ক্ষুধায় এবং তৃষ্ণায় সাময়িক কষ্ট হলেও তা দৃঢ়তার সাথে সহ্য করা। তাদের উচিৎ যখন তারা অপব্যবহার ও অবজ্ঞার সম্মুখিন হয় তখন ধৈর্য্য ধারণ করা। ইহাই সহিষ্ণুতা চর্চার নিয়ম। এ সহিষ্ণুতার দ্বারা বৈষয়িক আসক্তির আগুনে প্রতিনিয়ত প্রজ্জ্বলিত দেহকে প্রজ্জ্বলন থেকে রক্ষা করা সম্ভব।

পঞ্চমতঃ মানুষের উচিৎ সকল প্রকার বিপদকে জানা এবং ত্যাগ করা। যেমন বিজ্ঞ ব্যক্তি হিংস্র অশ্ব এবং পাগলা কুকুর থেকে দূরে থাকে, তেমনি মানুষের উচিৎ নয় খারাপ লোকের সাথে বন্ধুত্ব করা এবং বিজ্ঞজনেরা গমনাগমন করে না এমন স্থানও ত্যাগ করা উচিৎ। যদি কেহ সতর্কতা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে জীবন যাপন করে থাকে, তাহলে বৈষয়িক আসক্তিও সহজেই নির্বাপিত হয়।

২। এ পৃথিবীতে ৫ প্রকারে তৃষ্ণার উৎপত্তি হয়। যেমনঃ ক) দর্শনের মাধ্যমে, খ) শ্রবণের মাধ্যমে, গ) ঘ্রানের মাধ্যমে, ঘ) জিহ্বার মাধ্যমে এবং ঙ) স্পর্শের মাধ্যমে। এই ৫ প্রকার তৃষ্ণা ৫ প্রকার দরজার মাধ্যমে আমাদের শরীরে আরাম আয়েশ সৃষ্টি করে।

চক্ষুযোগলের দ্বারা দর্শন, কানের দ্বারা শ্রবণ, নাকের দ্বারা ঘ্রাণ, জিহ্বার দ্বারা আস্বাদন এবং স্পর্শ অনুভূতির দ্বারা তৃষ্ণার উৎপত্তি হয়। তৃষ্ণার কারণে শরীরের প্রতি ভালবাসা এবং আরাম-আয়েশ উক্ত পঞ্চদ্বারের মাধ্যমে আগমন করে।

বেশীরভাগ লোকেরা শারীরিক আরাম আয়েশের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এ আরাম আয়েশের পিছনে যে অকুশল বা দুঃখ জড়িত আছে তা বুঝতে পারে না। ফলে বনে শিকারী যেমন হরিণকে ফাঁদে ফেলে ধরে নিয়ে যায় এবং পরে কষ্ট দেয় তদ্রুপ অকুশলের বা দুঃখের ফাঁদে পড়ে মানুষ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করে। এ ৫ প্রকার তৃষ্ণার দরজার মধ্যে ইন্দ্রিয়জাত তৃষ্ণা সবচেয়ে বেশী বিপদজনক ফাঁদ। যখন মানুষেরা এদের ফাঁদে পড়ে তখন বৈষয়িক আসক্তির জালে আবদ্ধ হয়ে কষ্টভোগ করে।

বিশুদ্ধিতা লাভের উপায়

তাদের জানা উচিৎ যে কিভাবে এ মরণ ফাঁদের মূলোৎপাটন করা যায়।

৩। বৈষয়িক আসক্তির ফাঁদ থেকে মুক্তির পথ শুধু একটি নয়। যদি কেহ একটি সাপকে, একটি কুমিরকে, একটি পাখিকে, একটি কুকুরকে, একটি শৃগালকে অথবা একটি বানরকে ধরে এবং পরে একই রশিতে শক্ত করে আবদ্ধ করে ছেড়ে দেয়, তাহলে ৬টি প্রানী তাদের নিজেদের স্ব স্ব উপায়ে স্ব স্ব অবস্হানে ফিরে যেতে চেষ্টা করবে। সাপ তৃণাবৃত স্হানে, কুমির জলে, পাখি মুক্ত আকাশে, কুকুর গ্রামে, শৃগাল জংগলে, এবং বানর বনের গাছে ফিরে যেতে চেষ্টা করবে। যদিও তারা প্রত্যেকেই নিজস্ব গতিতে চলতে চাইবে, কিন্তু যেহেতু তারা একটি রশিতেই আবদ্ধ সেহেতু যার শক্তি যত বেশী তাকেই অনুসরণ করতে হবে অন্যান্যদেরকে।

এ গল্পের ন্যায় মানুষেরাও তার বিভিন্ন পদ্ধতিতে চোখ, কান, নাক, জিহ্বা, শরীর ও মন এ ৬ প্রকার তৃষ্ণা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে এবং যখন যেটার শক্তি প্রবল হয়ে দেখা দেয় তখন সেটার দ্বারাই প্রভাবিত হয় এবং পরিচালিত হয়।

যদি ঐ ৬ প্রকার প্রানীকে কোন স্তম্ভের সাথে বেঁধে রাখে তাহলে তারা মুক্ত হওয়ার জন্যে আপ্রান চেষ্টা করবে এবং পরিশ্রান্ত হয়ে নীরবে বসে পড়বে। একইভাবে মানুষেরা যদি তাদের মনকে সংযত করতে পারে তাহলে অন্য ৫টি ইন্দ্রিয়ও আপনাআপনি সংযত হতে বাধ্য। যদি মনকে দমন করা যায় তাহলে ইহলোকে এবং পরলোকেও শান্তি সুখ ভোগ করা যায়।

৪। মানুষেরা স্বার্থপরতায় আনন্দ পায়, তারা যশঃ এবং প্রশংসাকে ভালোবাসে। কিন্তু যশঃ এবং প্রশংসা সুগন্ধীর ন্যায় দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যায়। যদি মানুষেরা সম্মান ও প্রশংসার পিছনে ধাবিত হয়ে সত্য পথ থেকে সরে পড়ে তাহলে তারা অত্যন্ত বিপদজনক পথে অগ্রসর হয় এবং শীঘ্রই অনুতাপে পতিত হয়ে মনঃপীড়া ভোগ করে।

যদি কেহ যশঃ সম্পদ ও ভালোবাসার পিছনে ধাবিত হয় তাহলে সেটা হবে ধারালো ছুরির ফলা থেকে শিশুর মধু লেহনের ন্যায়। যখন সে মধুর আস্বাদন গ্রহণ

করবে তখন সে তার জিহ্বাকেও যন্ত্রণার মুখে ঠেলে দেবে। সেটা হলো প্রবল বাতাসের প্রতিকূলে মশাল বহনকারী মানুষের ন্যায়; যা তার হাত এবং মুখমন্ডলকে ঝলসিয়ে দেবে।

লোভ, দ্বেষ ও মোহতে পরিপূর্ণ নিজের মনকেও বিশ্বাস করা ঠিক নয়। নিজের মনকে তৃষ্ণার মাঝে ছেড়ে দেয়া মোটেই উচিৎ নয়। তাকে শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।

৫। সম্পূর্ণরূপে মনকে নিজের আয়ত্তে আনা সত্যিই কঠিন। যারা সর্বজ্ঞতাজ্ঞান লাভী তাঁদেরকে প্রথমেই সকল প্রকার তৃষ্ণার আগুন থেকে বের হয়ে আসতে হবে। তৃষ্ণা হলো ক্ষিপ্ত আগুনের ন্যায় এবং যারা সর্বজ্ঞতাজ্ঞানের অনুসন্ধানী তাদেরকে অবশ্যই এ তৃষ্ণা রূপ আগুন পরিত্যাগ করতে হবে। ইহা ভারী খড় বহনকারী একজন লোক আগুনের স্ফুলিঙ্গ থেকে খড়কে রক্ষা করার ন্যায়।

কিন্তু যদি কেহ সুন্দর বস্তুতে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে তাহলে সে বোকার মত কাজ করবে। মনই সমস্ত কিছুর প্রধান, যদি মনকে নিজের আয়ত্তের মাঝে রাখা যায় তাহলে দুর্বল তৃষ্ণা সহজেই অদৃশ্য হয়ে যায়।

সর্বজ্ঞতা লাভের পথ সত্যিই কঠিন কিন্তু ঐ পথ অনুসন্ধানের মানসিকতা না থাকলে ইহা আরো বেশী কঠিন হয়ে পড়ে। সর্বজ্ঞতাজ্ঞান ব্যতীত এ জীবনে এবং মৃত্যুর পরেও দুঃখের শেষ নেই।

যখন কোন ব্যক্তি সর্বজ্ঞতাজ্ঞান অর্জনে চেষ্টা করেন, তখন তা কাঁধের মধ্যে বলদের ভারী গাড়ী টানার ন্যায় মনে হয়। যদি বলদ অন্য কিছুতে মনোযোগ না দিয়ে এক মনে চেষ্টা করে, তাহলে কাদা মাটি অতিক্রম করে বিশ্রাম নিতে পারে। তদ্রুপ মনকে যদি সংযম করা যায় এবং সঠিক পথে ব্যবহার করা যায় তাহলে লোভমূলক কোন কাদায় পড়তে হবে না এবং যন্ত্রণাও ভোগ করতে হবে না।

৬। যারা সত্যিই সর্বজ্ঞতাজ্ঞান অর্জন করতে চায় তাদেরকে প্রথমে অবশ্যই

বিশুদ্ধিতা লাভের উপায়

সর্বপ্রকার অহংকার থেকে মুক্ত হতে হবে এবং বিনম্র শ্রদ্ধার সাথে বুদ্ধের শিক্ষাকে গ্রহণ করতে হবে। পার্থিব জীবনের সকল প্রকার সম্পদ, স্বর্ণালংকার, রূপা ও সম্মান এগুলোর সাথে প্রজ্ঞা ও সৎকর্ম জনিত পুণ্যের তুলনা করা যায় না।

সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া, পরিবারে শান্তি আনয়ন করা এবং প্রত্যেকের জন্যে শান্তি নিশ্চিত করতে হলে প্রথমে নিজেকেই নিয়মানুবর্তীতার মাধ্যমে জীবন যাপন করতে হবে। যদি কেহ তার মনকে সংযমতার মধ্যে রাখতে পারে, তাহলে সে সর্বজ্ঞতাজ্ঞান উপলব্ধির পথ খুঁজে পাবে এবং সকল প্রকার প্রজ্ঞা ও সৎকাজ জনিত পুণ্য আপনাআপনি তার কাছে উপস্থিত হবে।

ইহা পৃথিবীর অনাবৃত সম্পদের ন্যায়। পুণ্যের উৎপত্তি হয় সৎ কাজ থেকে এবং প্রজ্ঞার উৎপত্তি হয় পবিত্র ও শান্ত মন থেকে। নিরাপদ জীবনযাপনের জন্যে প্রজ্ঞাময় আলো এবং পুণ্যময় পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন হয়।

বুদ্ধের শিক্ষা মানুষকে লোভ, দ্বেষ, এবং মোহ পরিহার করতে শিক্ষা দেয়, যা একটি অতি উত্তম শিক্ষা। যারা এ শিক্ষা গ্রহণ করবে তারা জীবনে সুখ শান্তি ভোগ করবে।

৭। মানুষেরা সাধারণত নিজের চিন্তা প্রবণতার দ্বারা ধাবিত হয়। যদি তারা মনে লোভকে পোষণ করে তাহলে তারা প্রচন্ড লোভী হয়; যদি তারা রাগ চিত্ত পরায়ণ হয় তাহলে তারা প্রচন্ড রাগী হয়; আর যদি মোহপরায়ণ হয় তাহলে প্রচন্ড মোহান্ধ হয়ে পড়ে। এভাবে চিন্তা যে দিকে যায় শরীরও সে দিকে ধাবিত হয়।

ফসল সংগ্রহের সময় কৃষকেরা যেমন গরুর দলকে একটি নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে ঘিরে রাখে, যাতে ঐ সীমানা অতিক্রম করে অন্যের কিছু ক্ষতি সাধন করতে না পারে। আবার আবদ্ধ গরুগুলোর মৃত্যুর কারণ যাতে সৃষ্টি না হয়, তার উপরও সজাগ দৃষ্টি রাখে। ঠিক একইভাবে মানুষেরও উচিৎ সতর্কতার সাথে মনকে পাহারা দেয়া, যাতে মনে খারাপ কিছুর উৎপত্তি না হয় এবং দুর্ভাগ্যের কবলে পড়তে না হয়। তাদেরকে লোভ, দ্বেষ, ও মোহের চিন্তা পরিহার করে দানশীলতা ও দয়া-

দাক্ষিণ্যতার দিকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

যখন বসন্ত কাল আসে তখন পশুচারণ ভূমিতে প্রচুর সবুজ ঘাস দেখা যায়। কৃষকেরা তখন গরুর দলকে সহজেই ছেড়ে দেয়; কিন্তু তারপরেও সতর্ক দৃষ্টি রাখে। তদ্রুপ মানুষের মনও যতই সংযমতার মাঝে থাকুক না কেন সর্বদা পর্যবেক্ষনের মাঝে রাখা উচিৎ।

৮। এক সময় শাক্যমুণি বুদ্ধ কৌসাম্বীক নগরে অবস্হান করছিলেন। ঐ নগরে বুদ্ধের প্রতি অসন্তুষ্ট এবং উৎকোচ গ্রহণকারী এক পাপী লোক তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা গল্প প্রচার করতে লাগলো। এমতাবস্হায় বুদ্ধের শিষ্যদের পরিমাণমত খাদ্যদ্রব্য পেতেও অসুবিধা হচ্ছিল এবং পুরো শহর ব্যাপী তাঁদেরকে অপব্যবহার করা হচ্ছিল।

তখন আনন্দ বুদ্ধকে বললেন, "এরূপ শহরে আমাদের অবস্হান অনুচিত। আমাদের অন্য একটি উত্তম শহরে গমন করা উচিৎ। এই শহর আমদের ত্যাগ করা উচিৎ।"

বুদ্ধ প্রত্যুত্তরে বললেন, "মনে কর অন্য শহরটিও এরূপ হলো, তখন আমরা কি করবো ?"

আনন্দ বললেন, "তখন আমরা অন্য একটি শহরে গমন করবো।"

তখন বুদ্ধ বললেন, "না আনন্দ, এভাবে এ পথের সমাধান হবে না। আমাদের উচিৎ ধৈর্য্য সহকারে এই অপবাদের অবসান হওয়া পর্যন্ত এই শহরে অবস্হান করা এবং তারপরে অন্য শহরে গমন করা।"

"এ পৃথিবীতে লাভ-অলাভ, যশ-অযশ, নিন্দা-প্রশংসা, এবং সুখ-দুঃখ বিদ্যমান, কিন্তু সর্বজ্ঞ বুদ্ধ এই বাহ্যিক বস্তু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। এগুলো যেভাবে উদয় হয়েছে ঠিক সেভাবেই বিলয় হবে।"

২

চারিত্রিকতার সৎ দিকগুলো

১। যারা সর্বজ্ঞতাজ্ঞানের অনুসন্ধানী তাদেরকে সর্বদা অবিচলিতভাবে কায়, মন ও বাক্যের পবিত্রতা রক্ষা করতে হবে। শরীর পরিশুদ্ধিতার জন্যে, প্রাণ আছে এমন কিছু হত্যা হতে বিরত থাকতে হবে। চুরি করা এবং ব্যভিচার হতে বিরত থাকতে হবে। মনের পরিশুদ্ধিতার জন্যে তাঁকে সকল প্রকার লোভ, দ্বেষ ও মিথ্যা দৃষ্টি থেকে বিরত থাকতে হবে এবং পরিশেষে বাক্য পরিশুদ্ধিতার জন্যে তাকে মিথ্যা বলা, অপব্যবহার করা, প্রতারণা করা, এবং বাজে গল্প বলা থেকে বিরত থাকতে হবে।

যদি কারো মনের বিশুদ্ধিতা নষ্ট হয় তাহলে অবশ্যই তার কাজেও বিশুদ্ধিতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। যদি কলুষিত মনে কাজ করে, তাহলে দুঃখ তাকে গ্রাস করে। সুতরাং শরীর ও মনকে সর্বদা পরিশুদ্ধিতার মাঝে রাখাটাই সর্বোত্তম কাজ।

২। একদা এক দয়ালু, বিনয়ী ও ভদ্র বিধবা মহিলা এক শহরে বাস করতেন। তাঁর একজন গৃহ পরিচারিকা ছিল, যে জ্ঞানী ও পরিশ্রমী।

একদিন গৃহ পরিচারিকা চিন্তা করলেন, "আমার গৃহকর্ত্রীর ভালো সুনাম আছে; আমি আসলে জানতে চাই তিনি কি সত্যি সত্যিই সৎ প্রকৃতির মহিলা, নাকি তাঁর পারিপার্শ্বিকতার জন্যেই তাঁকে সুনাম করা হচ্ছে। আমি তাঁকে পরীক্ষা করবো এবং তা উদ্ঘাটন করবো।"

পরের দিন পরিচারিকা দুপুর পর্যন্ত তার গৃহকর্ত্রীর সম্মুখে উপস্থিত হলো না। গৃহকর্ত্রী এতে উত্তেজিত হয়ে উচ্চ কন্ঠে তাকে তিরস্কার করতে লাগলেন। তখন পরিচারিকা প্রত্যুৎত্তরে বললো, "যদি আমি ১/২ দিন অলসতা করি এতে আপনার অধৈর্য্য হওয়া উচিৎ নয়।" এই কথা শুনে গৃহকর্ত্রী ক্রোধান্বিত হলেন।

পরের দিন পুনরায় পরিচারিকা দেরীতে শয্যা ত্যাগ করলেন। এতে গৃহকর্ত্রী রাগান্বিত হয়ে তাকে লাঠি পেটা করলেন। এই ঘটনা সহসা সবার মুখে মুখে প্রচারিত হলো এবং ধনী বিধবার সুনাম ক্ষুন্ন হলো।

৩। সাধারণত এই মহিলার ন্যায় অনেক লোক আছে। যখন তাদের চারিপাশে সবকিছু ভালো থাকে তখন তারা দয়ালু, ভদ্র এবং শান্ত থাকে। কিন্তু বিজ্ঞতার সাথে যদি কেহ তাদেরকে কিছু জিজ্ঞাসা করে তাহলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তারা উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে।

অপবাদের সময়ে, ক্রোধভাব প্রদর্শনের সময়ে, খাদ্যাভাবের সময়ে, কাপড়-চোপড় ও বাস স্থানের সমস্যার সময়ে যদি কেহ পরিশুদ্ধ মন ও শান্ত দেহে সৎ কাজ করে যায় তখন তাকে আমরা সৎ লোক হিসেবে ধরে নিতে পারি।

সুতরাং যারা শুধুমাত্র পারিপার্শ্বিক ভালো সময়ে ভালো কাজ করে এবং সংযমতা অবলম্বন করে, তারা আসলেই সৎ লোক নয়। শুধু মাত্র যারা বুদ্ধের শিক্ষাকে গ্রহণ করে এবং ঐ শিক্ষাকে তাদের দেহ ও মনের মাধ্যমে চর্চা করে তারাই প্রকৃত সৎ, নম্র ও শান্তিপ্রিয় লোক।

৪। যথাযোগ্য সময়ে ব্যবহারের জন্য পাঁচ প্রকার জোড়া বিপরিতার্থক শব্দ রয়েছে। যেমন, শব্দ ব্যবহারের উপযুক্ত সময় এবং অনুপযুক্ত সময়; সঠিক শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে প্রকৃত অবস্থার বর্ণনা এবং তার বিপরীত; কোমল শব্দ ব্যবহার এবং কর্কশ শব্দ ব্যবহার; মঙ্গলকর শব্দ ব্যবহার এবং অমঙ্গলকর শব্দ ব্যবহার এবং সহানুভূতিপূর্ণ শব্দ ব্যবহার ও বিদ্বেষপূর্ণ শব্দ ব্যবহার।

যে কোন শব্দ ব্যবহারে আমাদেরকে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন কারণ এতে অনুপ্রাণিত হয়ে মানুষ ভালো এবং খারাপ কাজে অগ্রসর হয়। যদি আমাদের মন সহানুভূতি ও করুণাময় হয় তাহলে খারাপ কথা শুনলেও মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না। আমাদের মুখ দিয়ে কর্কশ শব্দ ব্যবহার না করলে অন্যের রাগ এবং দ্বেষ ভাব উৎপন্ন হবে না। আমরা যে শব্দ ব্যবহার করি তা সর্বদা

বিশুদ্ধিতা লাভের উপায়

সহানুভূতিপূর্ণ এবং জ্ঞানময় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

যেমন কোন ব্যক্তি একটি পুরো মাঠ থেকে সমস্ত কাদা সরিয়ে ফেলতে চায়, এ কাজে সে একটি কোদাল এবং ধুলা-বালি পরিস্কার করার জন্যে একটি কুলা ব্যবহার করে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে মাঠটি পরিস্কার করতে চাইলো। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা একটা অসম্ভব কাজ। এই নির্বোধের ন্যায় আমরা আমাদের সকল প্রকার আচার-ব্যবহারে সহানুভূতিপূর্ণ বাক্যের প্রয়োগ করতে পারবো, একথাও বলা যায় না। আমাদের উচিৎ মনে সংযমতা আনয়ন করা এবং অপরের প্রতি সহানুভূতি-পরায়ণ হওয়া। এরূপ হলে নিজের কথার দ্বারা অপরকে কষ্ট দেয়া হয় না এবং অপরের কাছ থেকেও কষ্টকর কথা শুনতে হয় না।

কেহ যদি জলের রং এর ন্যায় একটি ছবি নীল আকাশে অংকন করতে চায় তা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি বড় নদীর জলরাশিকে টর্চলাইটের রশ্মি দ্বারা জলশূন্য করাও সম্ভব নয়। অথবা দুই টুকরা ভালো চামড়ার ঘর্ষনের মাধ্যমে চটপট আওয়াজ সৃষ্টি করেও নদী জলশূন্য করা যায় না। তদ্রুপ সকলের উচিৎ নিজের মনকে সংযত করা; ফলে যেরূপ কথাই শ্রবণ করুক না কেন মনে অস্হিরভাব সৃষ্টি হবে না।

মানুষের উচিৎ তাদের মনকে পৃথিবীর ন্যায় প্রসারিত করা, আকাশের ন্যায় বিস্তার করা, গভীর নদীর জলের ন্যায় নিগূঢ় ধ্যানে নিমগ্ন রাখা এবং নরম উত্তম চামড়ার ন্যায় সোজা করে রাখা।

যদি কোন শত্রু কাকেও অসহ্য যন্ত্রণা দেয় এবং সে যদি এতে বিরক্তবোধ করে, তাহলে সে বুদ্ধের শিক্ষাকে অনুশীলন করছে না। যে কোন সময়ে চিন্তা করতে হবে যে, "আমার মন স্হির; আমার মুখ হতে দ্বেষযুক্ত এবং রাগযুক্ত বাক্য বের হবে না। আমি সহানুভূতি এবং সমবেদনার মাধ্যমে শত্রুদের মধ্যে অবস্হান করবো এবং এভাবে সমস্ত প্রাণীর প্রতি করুণাভাব প্রদর্শন করবো।"

৫। এক সময় এক ব্যক্তি একটি গল্প বললেন। গল্পটি হলো নিম্নরূপঃ লোকটি একটি উঁই পোকার ঢিবি দেখলেন; যা দিনের বেলায় জ্বলে এবং রাত্রিবেলা ধোঁয়ায়িত

হয়। তিনি একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট গিয়ে এ ব্যাপারে তাঁর উপদেশ প্রার্থনা করলেন। বিজ্ঞ লোকটি একটি খড়গের দ্বারা উঁইপোকার ঢিবিটি খুঁড়তে বললেন। অতঃপর লোকটি তাই করলেন। এতে প্রথমে তিনি একটি পুরানো দরজার খুঁটি দেখতে পেলেন। তারপর বুদবুদ করছে এমন কিছু জল; খড়নিক্ষেপনার্থ কাঁটাওয়ালা দণ্ডবিশেষ, একটি বক্স, একটি কচ্ছপ, একটি কসাই কাজের ছুরি, এক টুকরা মাংস এবং পরিশেষে একটি পৌরানিক দানব বের হয়ে আসলো। লোকটি যা দেখলেন তা বিজ্ঞ ব্যক্তিকে অবহিত করলেন। বিজ্ঞ লোকটি এগুলোর মর্মার্থ ঐ লোকটিকে বর্ণনা করলেন এবং বললেন, "পৌরাণিক দেবতা বাদে অন্যান্য সব ফেলে দিন এবং পৌরাণিক দেবতাকে কোন ঝামেলা না করে একা থাকতে দিন।"

এখানে "উঁইপোকার ঢিবি" মানে মানুষের শরীরকে বুঝানো হচ্ছে। "দিনের বেলায় জ্বলে" মানে দিনে মানুষেরা পূর্বরাত্রে যা ভাবে তা সম্পাদন করে থাকে একে বুঝানো হচ্ছে। "রাত্রে ধোঁয়ায়িত হয়" মানে দিনে সম্পাদিত আনন্দজনক এবং দুঃখময় কাজের কথা তারা রাত্রে ভাবে একে বুঝানো হচ্ছে।

এ গল্পে "এক ব্যক্তি" মানে যিনি সর্বজ্ঞতাজ্ঞান লাভের জন্যে চেষ্টা করছেন সেই বোধিসত্ত্বকেই বুঝানো হচ্ছে। "একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি" মানে স্বয়ং বুদ্ধকেই বুঝানো হচ্ছে। "একটি কোঁদাল" মানে প্রকৃত প্রজ্ঞাকেই বুঝানো হচ্ছে। "মাটি খোঁড়া" মানে উদ্যমতাকে বুঝানো হচ্ছে যার মাধ্যমে সর্বজ্ঞতাজ্ঞান অর্জন সম্ভব।

পুনঃ ঐ গল্পে "দরজার খুঁটি" মানে অবিদ্যার কথাকে, "বুদবুদ" মানে দুঃখ ও রাগকে বুঝানো হয়েছে। "কাঁটাওয়ালা দন্ড"দ্বারা অস্হিরতা এবং অস্বচ্ছন্দতাকে, "বক্সের" মাধ্যমে লোভ, দ্বেষ, মোহ, পরিবর্তনশীলতা, অনুশোচনা ও অলসতাকেই বুঝানো হয়েছে। "কচ্ছপের" মাধ্যমে শরীর এবং মনকে, "কসাইর ছুরি"র মাধ্যমে পঞ্চস্কন্ধের কথা, এবং "একটি মাংসের টুকরা"র মাধ্যমে লালসা চরিতার্থকরণে মানুষের তৃষ্ণাকে বুঝানো হচ্ছে। এগুলো সবই মানুষের জন্যে দুঃখ উৎপাদন করে তাই বুদ্ধ সবগুলোকে বর্জন করতে বলেছেন।

অবশেষে বাকী থাকে "পৌরাণিক দেবতা," যার মাধ্যমে পার্থিব লালসা মুক্ত

মনের কথাই বলা হয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি নিজের মাঝেই অনুসন্ধানী হয়ে কিছু খুজঁতে থাকে তাহলে তার মাঝে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হবে এবং পরিশেষে সে মুক্ত মন তৈরী করতে পারবে। "পৌরাণিক দেবতাকে একা থাকতে দাও" মানে পার্থিব লালসামুক্ত মন গড়ে তোলার কথাই এখানে বলা হয়েছে।

৬। পিন্ডুলা নামক বুদ্ধের এক শিষ্য, জ্ঞান অর্জনের পর নিজের জন্মস্থান কৌশাম্বিকে ফিরে গিয়ে তাদের সাহায্য সহযোগিতার জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। তাঁর একাজের মাধ্যমে তিনি বুদ্ধাঙ্কুর বপনের ক্ষেত্র তৈরী করেছিলেন।

কৌশাম্বিকের সীমান্তে একটি ছোট্ট বাগান ছিল; যার পাশ দিয়ে গঙ্গানদী প্রবাহিত এবং সারি সারি নারিকেলের বাগানে পরিপূর্ণ এবং সেখানে সর্বদা শীতল বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে।

এক গ্রীষ্মের দিনে পিন্ডুলা ঐ বাগানের একটি গাছের সুশীতল ছায়ার নীচে ভাবনারত ছিলেন। ঐ সময়ে রাজা উদয়নও একই বাগানে স্বস্ত্রীক অবসরকালীন বিনোদনে গিয়ে গান-বাজনা ও বিনোদনের পরে অন্য একটি গাছের নীচে ঘুমাচ্ছিলেন।

তখন স্ত্রী সহ অন্যান্য সহচরিরা ঐ বাগানে পরিভ্রমণের সময়ে হঠাৎ পিন্ডুলাকে ভাবনারত অবস্থায় দর্শন করে তাঁর কাছে আসলেন। তারা তাঁকে একজন পবিত্র লোক হিসেবে মনে করলেন এবং তাদেরকে ধর্মদেশনা করতে প্রার্থনা জানালেন। এতে পিন্ডুলা সাড়া দিয়ে দেশনা শুরু করলেন।

রাজা যখন ঘুম থেকে উঠলেন তখন তাঁর পাশে স্ত্রীসহ অন্যান্য সহচরিদেরকে না দেখে তাদেরকে খুঁজতে লাগলেন এবং পরে দেখলেন যে তারা পিন্ডুলার চারিপার্শ্বে বসে ধর্মদেশনা শ্রবণ করছেন। ঈর্ষা ও লালসাযুক্ত মনে রাজা রাগান্বিত হয়ে পিন্ডু-লাকে বললেন, "আপনি একজন পবিত্র ব্যক্তি হয়েও মহিলাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে তাদের সাথে তুচ্ছ আলোচনা করছেন।" পিন্ডুলা কিন্তু শান্তভাবে চোখ বন্ধ করে নীরবতা অবলম্বন করলেন।

এতে রাজা আরও বেশী রেগে গিয়ে তরবারি বের করে পিন্ডুলাকে ভয় দেখালেন। এতেও পিন্ডুলা নীরব এবং পাথরের ন্যায় অনঢ় অবস্থায় রইলেন। এ অবস্থা দর্শন করে রাজা আরও বেশী রাগান্বিত হলেন এবং উঁইপোকার ঢিবি ভেংগে এক টুকরা মাটি পিন্ডুলার দিকে নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু এতেও পিন্ডুলা নীরবে ভাবনা চালিয়ে গিয়ে দৃঢ়তার সাথে অপমান ও বেদনা সহ্য করেছিলেন।

পরিশেষে, রাজা তাঁর উগ্রতার জন্যে লজ্জিত হয়ে পিন্ডুলার নিকট ক্ষমা চাইলেন। এ ঘটনার কারণে রাজপ্রাসাদে বুদ্ধের শিক্ষা প্রবেশ করলো এবং পরবর্তিতে তা পুরো রাজ্যব্যাপী প্রসারিত হলো।

৭। কিছুদিন পর রাজা উদয়ন পিন্ডুলাকে দর্শন করার জন্যে তাঁর অরণ্য ধ্যানকেন্দ্রে গেলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,"বুদ্ধের শিষ্যরা কিভাবে তাদের দেহ ও মনকে কাম লালসা থেকে রক্ষা করে ? যদিও তারা সবাই যুবক।"

পিন্ডুলা প্রত্যুত্তরে বললেন,"হে রাজন ! বুদ্ধ সকল মহিলাকে সম্মান করতে বলেছেন। তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে বলেছেন, সকল বৃদ্ধ মহিলাদেরকে মা হিসেবে দেখতে; তরুনীদেরকে নিজের বোন হিসেবে এবং ছোটদেরকে নিজের কন্যা হিসেবে দেখতে বলেছেন। এ কারণেই বুদ্ধের শিষ্যগণ তরুন হলেও তাঁদের দেহ মনকে কাম লালসার হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন।"

রাজা পুনঃ জিজ্ঞাসা করলেন,"কিন্তু ভন্তে, একজন লোকের মনে খারাপ চিন্তাতো আসতেই পারে মা, বোন, কন্যারূপী মহিলার প্রতিও। তখন কিভাবে বুদ্ধের শিষ্যরা তাদের কাম লালসাকে দমন করেন ?"

"হে রাজন ! বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদেরকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে, তাদের শরীরে রক্ত, মাংস, পূঁজ, ঘাম, এবং তৈলজাত সমস্ত কিছুই ঘৃণিত ও দুর্গন্ধময়। এভাবে নিজের ও পরের দেহকে দর্শন করলে তাঁর শিষ্যগণ তরুন হলেও কাম লালসা হতে মনকে মুক্ত রাখতে পারেন।"

বিশুদ্ধিতা লাভের উপায়

তারপরেও রাজা বললেন, "ভন্তে, আপনি যেহেতু ভাবনা চর্চা করছেন এবং ভাবনা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছেন সেহেতু ইহা আপনার জন্যে সহজ মনে হলেও, যারা এখনও ভাবনা চর্চা করেনি তাদের জন্যে তা কষ্টকর নয় কি ? তারা যদিও এ দেহ ঘৃণিত ও দুর্গন্ধময় হিসেবে দর্শন করে, কিন্তু তবুও তাদের চোখের সম্মুখে সুন্দর অবয়ব উপস্থিত হয়। তারা ঐ সুন্দর অবয়বকে কদাকার হিসেবে দর্শন করলেও কাম লালসায় প্রবৃত্ত হয়ে সুন্দর রূপটাকেই উপভোগ করবে। মনে হয় অন্য কোন কারণ আছে যার দ্বারা বুদ্ধের শিষ্যরা তরুন হলেও তাদের দেহ ও মনকে কাম লালসার হাত হতে রক্ষা করতে সক্ষম।"

পিন্ডুলা বললেন, "হে রাজন ! বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদেরকে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের দরজাকে সর্বদা পাহারা দিতে বলেছেন। যখন সুন্দর অবয়ব ও রূপ চোখের মাধ্যমে, আনন্দদায়ক শব্দ কর্ণের মাধ্যমে, সুঘ্রাণ নাকের মাধ্যমে, স্বাদ আস্বাদন জিহ্বার মাধ্যমে, এবং নরম কিছু হাতের মাধ্যমে স্পর্শ করে তখন আমাদের উচিৎ নয় যে, এগুলোর মাধ্যমে আসক্তিপরায়ণ হওয়া। আবার যখন কদাকার কিছু দর্শন করে, শোনে বা স্পর্শ করে, তার প্রতিও বিরক্তিভাব প্রদর্শন করা উচিৎ নয়। সতর্কতার সাথে এ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দরজাকে পাহারা দেয়ার কথা বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। এই শিক্ষার মাধ্যমে তরুন শিষ্যরা তাদের দেহ ও মনকে কাম লালসার হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন।"

এতে রাজা আনন্দিত হয়ে বললেন, "বুদ্ধের শিক্ষা সত্যিই মহান এবং পবিত্র। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, যখন আমি সুন্দর অথবা পছন্দনীয় কিছুর মুখামুখি হই, তখন আমি আমার ইন্দ্রিয় দরজাকে পাহারা দেই না; তাই ইন্দ্রিয়াবেগে উত্তেজিত হই। তাই, ইহা আমাদের একমাত্র কর্তব্য যে, নিজের দেহ ও মনকে পবিত্র রাখার জন্যে পঞ্চইন্দ্রিয়ের দরজাকে সর্বদা পাহারা দিয়ে রাখা।"

৮। যখন কোন ব্যক্তি তার চিন্তাকে কার্য্যে পরিণত করে তখন তার বিপরীতেও একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। যদি কেহ দুর্ব্যবহার করে তাহলে প্রত্যুত্তরে তাকেও এর পরিণাম ভোগ করতে হয়। এ প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়া নিজেকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে। ইহা প্রতিকূল আবহাওয়াতে থুথু ফেলার ন্যায়; যা অন্যের গায়ে না পড়ে

নিজের গায়ে ফিরে আসে। ইহা বাতাসের প্রতিকূলে ঝাড়ু দ্বারা ধূলিকণা পরিস্কার করার ন্যায়; যা পরিস্কার না হয়ে নিজের শরীরকে ধূলায়িত করে। যে তৃষ্ণাকে প্রশ্রয় দেয়, প্রতিশোধ হিসেবে দুর্ভাগ্য সর্বদা তাকে অনুসরণ করে থাকে।

৯। লোভকে পরিত্যাগ করে পরোপকারের মনোভাব সৃষ্টি করা উত্তম কাজ। অধিকন্তু নিজের মনকে দৃঢ়তার সাথে আর্যপথের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক রত রাখা উচিৎ।

প্রত্যেকের উচিৎ অহংকারবোধ ত্যাগ করা; এবং সৎ ও পরোপকারের প্রতি মনমানসিকতা সৃষ্টি করা। এমন কাজ করতে হবে যাতে অন্যরা সুখি হয় এবং তার প্রভাবে যাতে অন্যান্যরাও সুখি হতে পারে। এরূপ কাজের মাধ্যমেও সুখের উৎপত্তি হয়।

একটি মোমবাতির আলো থেকে হাজার হাজার মোমবাতি প্রজ্জ্বলিত করা যায়; এতে কিন্তু মোমবাতির শিখা কমে যায় না। তদ্রুপ সুখও একসাথে ভাগাভাগি করে উপভোগ করলে কমে যায় না।

যারা সর্বজ্ঞতাজ্ঞানের অনুসন্ধানী তাদেরকে অবশ্যই প্রতি পদক্ষেপে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। যে যত বড় উচ্চাকাংখা পোষণ করুক না কেন, তা অবশ্যই ক্রমান্বয়ে অর্জন করা প্রয়োজন। আমাদের দৈনন্দিন জীবন ধারণ হতেই সর্বজ্ঞতাজ্ঞান লাভের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১০। সর্বজ্ঞতাজ্ঞান লাভের পথে সর্বপ্রথম ২০টি জাগতিক বাঁধা আমাদেরকে অতিক্রম করতে হবে। এগুলো নিম্নরূপঃ-

ক) একজন দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে দান করা খুবই কষ্টকর ব্যাপার
খ) অহংকারী ব্যক্তির পক্ষে সর্বজ্ঞতাজ্ঞান লাভ দূরহ ব্যাপার
গ) আত্ন উৎসর্গকারী ব্যক্তি না হলে সর্বজ্ঞতাজ্ঞান লাভ কষ্টকর ব্যাপার
ঘ) বুদ্ধের উপস্হিতিতে জন্মগ্রহণ করা দূরহ ব্যাপার
ঙ) বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করা কঠিন ব্যাপার

বিশুদ্ধিতা লাভের উপায়

চ) শরীরের সহজাত প্রবৃত্তি হতে মনকে মুক্ত রাখা কষ্টকর ব্যাপার

ছ) সুন্দর এবং আকর্ষনীয় বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট না হওয়া কষ্টকর ব্যাপার

জ) একজন যুবক তার ইচ্ছাকে চরিতার্থ করার জন্যে শক্তি প্রয়োগ না করা খুবই কঠিন ব্যাপার

ঝ) যখন কেহ অপমানিত হয় তখন ক্রোধভাব প্রদর্শন না করা খুবই কঠিন ব্যাপার

ঞ) হঠাৎ কোন বেদতিক অবস্থার মধ্যে পরীক্ষায় পড়লে, না জানার ভান করে থাকা কঠিন ব্যাপার

ট) বিস্তারিত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কোন বিষয়ে জানার জন্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখা কষ্টকর ব্যাপার

ঠ) একজন নূতন শিক্ষার্থীকে অবজ্ঞা না করা কঠিন ব্যাপার

ড) নিজেকে সততার মধ্যে রাখা কঠিন ব্যাপার

ঢ) সৎ বন্ধু লাভ করা দূরহ ব্যাপার

ণ) সর্বজ্ঞতাজ্ঞান অর্জনের দিকে নিয়ে যায় এমন নিয়ম-নীতি পালন করা কষ্টকর ব্যাপার

ত) শরীরের বাহ্যিক অবস্থার দ্বারা মন উত্তেজিত হবে না ইহা একটি দূরহ ব্যাপার

থ) মানুষের সক্ষমতা বুঝে তাদেরকে শিক্ষা দান করা খুবই কঠিন ব্যাপার

দ) প্রশান্ত মনে অবস্থান করা কষ্টকর ব্যাপার

ধ) ভাল এবং মন্দের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা খুবই কঠিন ব্যাপার এবং

ন) সঠিক শিক্ষা অর্জন এবং চর্চা করা খুবই কঠিন ব্যাপার

১১। ভাল এবং খারাপ লোক তাদের কাজের মাধ্যমে এবং স্বভাবের মাধ্যমে পরিচিতি লাভ করে। খারাপ লোক খারাপ কাজকে খারাপ হিসেবে দর্শন করে না। যদি কেহ উক্ত খারাপ কাজ তাদের দৃষ্টিগোচরে আনে তবুও তারা সে খারাপ কাজ করা থেকে বিরত হয় না; এবং যারা তাদের খারাপ কাজগুলোর কথা বলে তাদেরকেও সে পছন্দ করে না। বিজ্ঞলোকেরা সহজেই ভাল এবং মন্দের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে। তাদের দৃষ্টিতে যা খারাপ বলে মনে হবে তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ত্যাগ করে। যদি কেহ তাদেরকে খারাপ দিকগুলো বলে দেয় তাহলে তারা

তাদের নিকট কৃতজ্ঞতাপরায়ণ হয়।

এরূপে মৌলিকভাবে ভালো এবং খারাপ মানুষের মধ্যে প্রভেদ দেখা যায়। খারাপ লোক তাদের প্রতি প্রদর্শিত মায়া-মমতার জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না; কিন্তু ভাল লোক তাদের প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ভাল লোক শুধু তাদের উপকারীর প্রত্যুপকারই করেন না, অন্যান্য লোকদের প্রতিও অনুরূপ মনোভাব প্রকাশ করেন।

৩

পৌরাণিক রূপকথার আলোকে বুদ্ধের শিক্ষা

১। একদা একদেশে অদ্ভুত এক রীতি ছিল। ঐ দেশের লোকেরা বয়োঃবৃদ্ধদেরকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে এবং অগম্য পাহাড়ে রেখে আসতেন।

রাজ্যের এক মন্ত্রী এ প্রথা অনুসরণ করতে খুবই কষ্ট অনুভব করলেন। কারণ তাঁর বৃদ্ধ পিতাকেও ঐ প্রথানুসারে অগম্য পাহাড়ে রেখে আসতে হবে। মন্ত্রী একটি গোপন গর্ত খনন করে সেখানে পিতাকে রেখে সেবাযত্ন করতে লাগলেন।

একদিন ঐ রাজ্যের রাজার সম্মুখে একজন দেবতা এসে উপস্থিত হলেন এবং রাজাকে এক কঠিন প্রশ্নের মুখামুখি করলেন। দেবতা রাজাকে বললেন, "আপনি যদি আমার দ্বারা উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর সন্তোষজনক সমাধান দিতে না পারেন, তাহলে আপনার রাজ্য ধ্বংস করে দেয়া হবে।" প্রশ্নগুলোর প্রথমটি হলো, "এখানে ২টি সর্প আছে; কোনটি পুরুষ এবং কোনটি স্ত্রী তা আমাকে বলুন।"

রাজা অথবা উপস্থিত কেহই উক্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারলেন না। সুতরাং রাজা রাজ্যের মধ্যে যে কোন কেহ যদি উক্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে, তাহলে তাকে বিশেষ পুরস্কারের ঘোষণা দিলেন।

বিশুদ্ধিতা লাভের উপায়

মন্ত্রী তাঁর পিতাকে রক্ষিত গোপন স্থানে গিয়ে উক্ত প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইলেন। পিতা উত্তরে বললেন, "ইহা অতীব সহজ; সর্প দু'টিকে একটি নরম কার্পেটের উপরে রাখবে। যেটি নড়া চড়া করবে সেটি পুরুষ সর্প, আর যেটি শান্ত অবস্থায় অবস্থান করবে সেটি হবে স্ত্রী সর্প।" মন্ত্রী উত্তরটি রাজার কাছে নিয়ে গেলেন এবং সফলতার সাথে প্রথম প্রশ্নের সমাধান দিলেন।

এরপর দেবতা রাজাকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন। রাজা এবং তাঁর অধিনস্থ কেহই উক্ত প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না। ঐ প্রশ্নের জবাবও মন্ত্রী তাঁর পিতার সাথে পরামর্শ করে সমাধান দিলেন।

নিম্নে দেবতা দ্বারা উথাপিত প্রশ্নগুলোর কিছু অংশ এবং প্রত্যুৎত্তর দেয়া গেল।

"নিদ্রায়িত ব্যক্তিকে জাগ্রত, এবং জাগ্রত ব্যক্তিকে নিদ্রায়িত বলে যে বলা হয়, সে কে ?" তার উত্তর হলো, "নিদ্রায়িত হয়েও যিনি জাগ্রত স্বরূপ তিনি হলেন, যিনি সর্বজ্ঞতাজ্ঞান অর্জনের জন্যে অনুশীলন করে যাচ্ছেন। সর্বজ্ঞতাজ্ঞান অর্জনে যার কোন আগ্রহ নেই, তিনি হলেন জাগ্রত হয়েও নিদ্রিত মানুষের মতো।"

অপর প্রশ্নটি হলো "একটি বড় হাতিকে কিভাবে ওজন করা যায় ?" উত্তরটি হলো, "হাতিটিকে একটি তরীতে উঠিয়ে তরীটি যতটুকু পানিতে ডুবে যায় ততটুকু জায়গায় দাগ দিয়ে, হাতিটিকে তরী থেকে অপসারণ করে পুনঃ পাথর ভর্তি করে যতক্ষণ পর্যন্ত তরীটি পূর্বের স্থান পর্যন্ত পানিতে ডুবে না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত পাথর ভর্তি করে পরে ঐ পাথর ওজন দিয়ে হাতির ওজন নির্ণয় করা যায়।"

চতুর্থ প্রশ্নটি হলো, "একটি কাপ ভর্তি পানি কি সাগরের পানির চেয়ে বেশী ?" উত্তরটি হলো, "যদি কেহ তার পিতা-মাতাকে এক কাপ পানির মাধ্যমে পূত পবিত্র করে তুলতে পারে বা মৈত্রীময় ভাবধারায় নিয়ে যেতে পারে; অথবা অসুস্থ্য ব্যক্তিকে পরমার্থিক ভাবধারায় নিয়ে যেতে পারে, তাহলে সে পানির পরিমাণ কম হলেও সাগরের পানির চেয়ে বেশী। কারণ সাগরের জল একদিন শেষ হয়ে যাবে।"

পরে ঐ দেবতা একজন ক্ষুধার্ত মানুষ তৈরী করলেন; যার চামড়া এবং হাড় খুবই কম ছিল এবং অভিযোগের সুরে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ পৃথিবীতে আমার চেয়ে ক্ষুধার্ত আর কে আছে ?" উত্তরে বললেন, "যে ব্যক্তি বুদ্ধ, ধর্ম, এবং সংঘকে বিশ্বাস করে না; যে ব্যক্তি স্বার্থপর এবং লোভী; যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে এবং শিক্ষকদেরকে সম্মান প্রদর্শন করে না, ভরণ-পোষণ করে না; সে শুধু ক্ষুধার্তই হয় না, পিশাচের রাজ্যে পতিত হয়। পরিণামে সে সেখানে সারা জীবন ক্ষুধা যন্ত্রণায় কষ্ট ভোগ করে থাকে।"

পুনঃ দেবতা রাজাকে প্রশ্ন করলেন, "লম্বা এ চন্দন গাছের টুকরার কোন অংশটি গোড়ার অংশ ? উত্তরে বললেন, "গাছের টুকরাটি পানিতে ভাসিয়ে দিলে যে অংশটি পানিতে ডুবে যাবে সে অংশটি গাছের গোড়ার অংশ।"

শেষ প্রশ্নটি হলো "দু'টি ঘোড়া আকারের দিক থেকে দেখতে একই। কিভাবে এ দু'টি ঘোড়া থেকে মা এবং বাছুরকে বেছে নেবে ?" উত্তরে বললেন, "ঘোড়া দু'টোকে একসাথে খাবার দিলে মা খাবারগুলো বাছুরের দিকে ঠেলে দেয়।" এতে করে মা এবং বাছুর কোনটি তা সহজেই নির্ধারণ করা যায়।

উল্লেখিতভাবে দেবতা কর্তৃক রাজাকে যে প্রশ্নগুলো করা হলো তার সন্তোষ জনক প্রত্যুত্তর পেয়ে দেবতা সন্তুষ্ট হলেন। পরে রাজা জানতে পারলেন যে ঐ সব প্রশ্নের উত্তর এক বৃদ্ধ ব্যক্তি দ্বারা দেয়া হয়েছে। এতে রাজা তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন; এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিদেরকে অগম্য পাহাড়ে রাখার প্রথা তুলে দিয়ে তাদেরকে সেবা যত্ন করার পরামর্শ দিলেন।

২। একদিন ভারতের বিদেহ রাজ্যের রানী ৬টি শৃঙ্গবিশিষ্ট একটি সাদা হস্তী স্বপ্নে দেখলেন। রানী ঐ শৃঙ্গগুলো পাওয়ার আশা প্রকাশ করে, রাজাকে বিনীতভাবে অনুরোধ জানালেন। যদিও একাজ সহজ নয়, তবুও রাজা যেহেতু রানীকে খুবই ভালোবাসতেন সেহেতু রাজ্যের মধ্যে এই বলে পুরস্কার ঘোষণা করলেন যে; যে বা যারা এরূপ হস্তী দর্শন করবে, সে বা তারা তা রাজাকে অবহিত করবে।

বিশুদ্ধিতা লাভের উপায়

হঠাৎ একদিন ৬টি শৃঙ্গবিশিষ্ট হস্তী হিমালয় পর্বতে দেখা গেলো, যে হস্তীটি বুদ্ধত্বলাভের জন্যে ব্রত পালন করে আসছে। ঐ হস্তীটি একদিন গভীর অরণ্যে একজন শিকারীকে বিপদাপন্ন অবস্হায় প্রান রক্ষা করে ঐ শিকারীকে নিরাপদে নিজের বাসস্হানে ফিরে যেতে সহায়তা করেছিলো। কিন্তু ঐ শিকারী পুরস্কার লাভের আশায় মোহান্ধ হয়ে হস্তীটির করুণার কথা ভুলে গিয়ে পুনঃ তাকে হত্যা করতে অরণ্যে প্রবেশ করলো।

ঐ শিকারী বুঝতে পেরেছিল যে হস্তীটি বুদ্ধত্বলাভের জন্যে ব্রত পালন করছে। তবুও সে বৌদ্ধ ভিক্ষুর চীবর পরিধান করে নিজেকে গোপন রেখে হস্তীটি ধরার জন্যে বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করলো।

হস্তীটি তার জীবনের পরিসমাপ্তি বুঝতে পেরে শিকারীর বৈষয়িক কামনা চরিতার্থ করার জন্যে তার নিকট উপস্হিত হয়ে করুণা বশতঃ তাকে নিজের শরীর দিয়ে ডেকে রেখে অন্যান্য হিংস্র হস্তীর আক্রমনের হাত থেকে রক্ষা করলো। অতঃপর হস্তীটি তাকে জিজ্ঞাসা করলো কেন সে এ নির্বুদ্ধিতার কাজটি করলো। শিকারী পুরস্কার লাভের কথা প্রকাশ করলো এবং হস্তীটির ৬টি শৃঙ্গ পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলো। হস্তীটি এ কথা শুনার সাথে সাথে তার ৬টি শৃঙ্গ গাছে আঘাত করে ভেংগে ফেললো এবং শিকারীকে নিতে বললো। পরে হস্তীটি তাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলো, "এ দানের মাধ্যমে আমি আমার বুদ্ধত্ব লাভের ব্রত পূরণ করলাম এবং আমি তুষিত দেবলোকে জন্ম নেবো। যখন আমি বুদ্ধ হয়ে এ পৃথিবীতে আসবো তখন তোমাকে তিন প্রকার বিষাক্ত তীর স্বরূপ লোভ, দ্বেষ, ও মোহ
হতে রক্ষা করতে সাহায্য করবো।

৩। একদা হিমালয় পর্বতের পাদ দেশে ঘন অরণ্যের মধ্যে একটা তোতা পাখি অনেক পশু পক্ষির সাথে বাস করতো। হঠাৎ একদিন প্রচণ্ড বাতাসে বাঁশে বাঁশে ঘর্ষণের মাধ্যমে ঐ ঘন অরন্যে অগ্নুৎপাত হলো এবং পশুপক্ষিরা ভয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করছিল। তোতা পাখিটি তাদের শংকিত অবস্হা ও কষ্ট দেখে তাদের প্রতি মৈত্রীপরায়ণ হলো এবং পশুপক্ষিগুলোকে তার নিজের নিরাপদ স্হানে নিয়ে গিয়ে সাধ্যমত সেবা শুশ্রুষা করতে লাগলো। তোতা পাখিটি পুকুরে ডুব দিয়ে পানি

সংগ্রহ করে ঐ পানি আগুনে নেভানোর কাজে ব্যবহার করলো। এভাবে তোতা পাখিটি পুনঃ পুনঃ তার করুণাপূর্ণ অনুভূতি নিয়ে ঘন অরণ্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা-পরায়ণ হয়ে আগুন নেভানোর কাজে নিয়োজিত হলো।

তোতা পাখিটির এ করুণাযুক্ত কাজ এবং আত্ম নিবেদিত অবস্থা দর্শন করে স্বর্গ থেকে দেবরাজ এসে পাখিটির সম্মুখে হাজির হয়ে তাকে বললেন, "তোমার মনে প্রচুর সাহস আছে। কিন্তু এ বিন্দু বিন্দু পানি নিক্ষেপ করে তুমি কি এ বিরাট আগুন নেভাতে সক্ষম হবে ?" তোতা পাখিটি বললো, "কৃতজ্ঞতাপূর্ণ মনোভাব এবং নিবেদিত প্রাণ হলে পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা অর্জন করা যায় না। আমি পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করে যাবো এমন কি পরবর্তী জীবনেও।" এতে দেবরাজ উৎসাহিত হলেন এবং এক সাথে পানি নিক্ষেপ করে আগুন নেভাতে সাহায্য করলেন।

৪। একদা হিমালয় পর্বতে এক দেহ ও দুই মাথাসম্পন্ন একটি পাখি বাস করতো। একদিন একটি মাথা দেখলো যে অন্য মাথাটি কিছু মিষ্টি ফল ভক্ষন করছে। এতে অন্য মাথাটি প্রতিহিংসাপরায়ণ হলো এবং বললো, "আমি বিষাক্ত ফল ভক্ষণ করবো।" পরে সে তাই করলো এবং সম্পূর্ন পাখিটিই বিষক্রিয়ায় মৃত্যু মুখে পতিত হলো।

৫। একদিন সাপের লেজ এবং মাথা ঝগড়া শুরু করলো যে, কোনটি তার সম্মুখের অংশ হবে। লেজের অংশটি মাথার অংশটিকে বললো, "তুমি সবসময় প্রথমে দৌঁড়াও, তোমার কখনো কখনো আমাকে সামনে যাওয়ার সুযোগ দেয়া উচিৎ। মাথা উত্তর দিলো, "ইহা আমাদের জন্যে স্বাভাবিক, যেহেতু আমি মাথা সেহেতু তোমার সাথে স্হান পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।"

কিন্তু তাদের এ ঝগড়া চলতেই থাকল এবং একদিন সাপের লেজ নিজেকে গাছের সাথে জড়িয়ে নিল এবং এভাবে মাথাকে এগিয়ে যাওয়া হতে প্রতিরোধ করতে চাইল। লেজের সাথে দ্বন্ধে যখন সাপের মাথা ক্লান্ত হয়ে গেল, তখন সে তার নিজস্ব পথ বেছে নিল। ফলশ্রুতিতে, পুরো সাপটিই মারা গেল।

বিশুদ্ধিতা লাভের উপায়

মহাবিশ্বের প্রাকৃতিক নিয়মে সবসময় স্বাভাবিক নিয়ম অনুসৃত হয় এবং প্রতিটি বস্তুর নিজস্ব কার্যাবলী রয়েছে। যদি এ নিয়ম কোন কারণে বাধাগ্রস্ত হয়, তখন পুরো অবস্থাটাই পরিবর্তন হয়।

৬। সে সময়ে এক গ্রামে একজন মানুষ বাস করত, যে সহজেই রেগে যেতো। একদিন দু'জন লোক এক বাড়ির সামনে কথা বলছিল, যেখানে রাগী লোকটি বসবাস করতো। একজন অন্যজনকে বললো, "লোকটি খুবই ভালো কিন্তু বড় বেশী অস্হির, তার মাথা গরম এবং সহজেই রেগে যায়।" লোকটি তাদের মন্তব্য শুনলো এবং ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বের হয়ে আসলো। তারপর দু'জনকেই কিল ঘুষি দিয়ে আহত করলো।

যখন কোন জ্ঞানী লোক ঘোর অজ্ঞানী নহে এমন কারো ভুল ধরিয়ে দেয়, তখন তার বোধোদয় ঘটে এবং তার আচরণে উন্নতি ঘটে। কিন্তু যখন তার অসদাচরণে দেখা যায় যে, সে একই আচরণের কেবল পুনরাবৃত্তিই করছে না বরং একই ভুল পুনঃ পুনঃ করছে, তখন জ্ঞানীলোকের কর্তব্য হবে, এমন ঘোর অজ্ঞানীলোক থেকে সতর্কতার সাথে দূরত্ব বজায় রেখে চলা।

৭। কোন এক গ্রামে একজন ধনী, কিন্তু বোকা লোক বাস করতো। যখন সে যে কোন একজন লোকের সুন্দর বাড়ি দেখে তখনই পরশ্রীকাতর হয়ে অনুরূপ বাড়ি নিজে তৈরী করতো। কারণ সে মনে করতো যে, গ্রামে সেই একমাত্র ধনী লোক। সে রাজমিস্ত্রি ডাকলো এবং তাকে আদেশ দিল বাড়ী তৈরী করার জন্যে। রাজমিস্ত্রি একমত হলো এবং শীঘ্রই সে বাড়ীর ভিত দিতে লাগলো। এভাবে ১ম , ২য় এবং ৩য় তলা পর্যন্ত তৈরী করতে লাগলো। ধনী লোকটি রাগের সাথে তা লক্ষ্য করলো এবং বললো, "আমি ১ম ও ২য় তলা চাই না কেবল ৩য় তলাটাই চাই; তুমি তাড়াতাড়ি ওটাই তৈরী করো।"

একজন বোকা লোক ভালো ফলের জন্য কোনরূপ চেষ্টা ব্যতিরেকেই সবসময় ফলাফলের জন্য অধৈর্য্য হয়ে পড়ে। যথেষ্ট প্রচেষ্টা ছাড়া ভাল কিছুই অর্জন করা যায় না। অনুরূপভাবে, ১ম ও ২য় তলা তৈরী করার আগে ৩য় তলা তৈরী করা যায়

না।

৮। কোন এক গ্রামে একজন বোকা লোক মধু সিদ্ধ করছিল। তার এক বন্ধু সেখানে উপস্থিত হলো এবং বোকা লোকটি তাকে মধু পান করতে অনুরোধ করলো। কিন্তু মধুগুলো খুবই গরম ছিল। আগুন থেকে না সরিয়ে সে মধু ঠান্ডা করার জন্য পাখা করতে লাগলো। অনুরূপভাবে, জাগতিক নিয়মে আগুন থেকে না সরিয়ে ঠান্ডা মধু খাওয়ার চিন্তা করা বোকামির সামিল।

৯। এক স্থানে দু'টি দানব বসবাস করতো। তারা সারাদিন একটি বাক্স, বেত এবং একজোড়া জুতো নিয়ে বাক-বিতণ্ডা ও ঝগড়া করতো। একজন লোক যখন তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন সে জিজ্ঞাসা করলো কেন তারা এসব জিনিস নিয়ে ঝগড়া করছে ? এ জিনিসগুলোতে কি জাদুকরী শক্তি আছে যে, তারা এগুলো পাওয়ার জন্যে এত ঝগড়া করছে ?

দানবেরা তাকে বুঝালো এ বাক্স থেকে তারা খাবার, কাপড় বা ধনরাজি যে কোন কিছু পেতে পারে। যেমন, বেত দিয়ে তারা তাদের শত্রুকে শাস্তি দিতে পারবে; এবং জুতো দিয়ে তারা বাতাসে ভ্রমণ করতে পারবে।

তাদের এরূপ কথা শুনে লোকটি বললো, "কেন তোমরা ঝগড়া করছো ? যদি কয়েক মিনিট হাঁটো তবে এর চেয়ে আরো সুন্দর জিনিস তোমাদের হাতে আসবে।" একথা শুনে দুজন দানবই দৌড় দিল এবং তারা যাওয়া মাত্রই লোকটি জুতোজোড়া পড়ে নিল এবং বাক্স ও বেত ছিনিয়ে নিয়ে বাতাসে মিশে গেল।

এখানে দানবের মাধ্যমে অপবিশ্বাসকে বুঝানো হয়েছে। "বাক্সের" মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে দানের মাধ্যমে যে ফল পাওয়া যায় তাকে; তারা জানেনা দানের দ্বারা কি পরিমাণ ধনসম্পদ অর্জন করা যায়। "বেতের" মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে মনের একাগ্রতার অনুশীলনকে। মানুষেরা বুঝতে পারেনা যে মনের একাগ্রতা এবং দান অনুশীলনের মাধ্যমে তারা জাগতিক সমস্ত ভোগলালসা হতে মুক্তি লাভ করতে পারে। "জুতো জোড়ার" মাধ্যমে বুঝানো হচ্ছে পবিত্র নিয়মনীতিকে এবং সৎ

আচরণকে, যা তাদেরকে সমস্ত পার্থিব ভোগবিলাস ও বিতর্কের উর্দ্ধে নিয়ে যাবে। এগুলো না জেনে তারা বাক্স, বেত এবং জুতো জোড়া নিয়ে ঝগড়া করছে।

১০। এক সময়ে একজন লোক একা একা পরিভ্রমণে বের হয়েছিল। সন্ধ্যার সময়ে সে একটি খালি বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হলো এবং ঐ বাড়ীতে রাত্রি যাপন করতে মনস্থির করলো। মধ্যরাতের দিকে ঐ বাড়ীতে এক প্রেত একটি মৃতদেহ নিয়ে আসলো এবং ওটাকে নীচে রাখলো। পরপর অন্য এক প্রেত উপস্থিত হয়ে মৃতদেহটি তার বলে দাবী করলো এবং এ নিয়ে তারা ঝগড়া করতে লাগলো।

অতঃপর, প্রথম প্রেতটি বললো, "এই নিয়ে ঝগড়া করা অর্থহীন; চল আমরা এটা একজন বিচারকের নিকট পেশ করি।" অন্য প্রেতটি তার এই প্রস্তাবে রাজী হলো এবং ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়ে থাকা লোকটিকে বললো মৃত দেহটির মালিকানা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দেয়ার জন্যে। লোকটি আরও ভীত হয়ে পড়লো, কারণ সে জানতো, সে যাই সিদ্ধান্ত দিক না কেন হেরে যাওয়া প্রেতটি এতে করে রাগান্বিত হবে এবং প্রতিশোধ নেবার জন্য হয়তো বা তাকে মেরেও ফেলতে পারে। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত করলো, সে যা দেখেছে তাই বলবে।

সে যা ভেবেছিলো তাই হলো। তার বিচারের রায় শুনে হেরে যাওয়া ২য় প্রেতটি রাগান্বিত হয়ে তার একটি বাহু ছিড়ে ভক্ষণ করতে লাগলো। এতে ১ম প্রেতটি মৃতদেহ হতে একটি বাহু ছিঁড়ে লোকটির বাহুর সাথে প্রতিস্থাপন করলো। ২য় প্রেতটি লোকটির ২য় বাহুও ছিড়ে ভক্ষন করতে লাগলো এতে ১ম প্রেতটি পুনঃ মৃতদেহ হতে ২য় বাহুটি ছিঁড়ে লোকটির শরীরে প্রতিস্থাপন করলো। এভাবে রাগান্বিত প্রেতটি ক্রমান্বয়ে লোকটির দুই পা, মাথা এবং পুরো শরীরটি ছিঁড়ে ভক্ষন করলো কিন্তু ১ম প্রেতটি শরীরের সব অংশগুলো পুনঃ সহসা মৃতদেহ হতে প্রতিস্থাপন করলো। এরপর প্রেত দু'টি দেখলো যে লোকটির শরীরের কিছু কিছু অংশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে এবং তারা এগুলোকে তুলে নিয়ে গোগ্রাসে খেয়ে ফেললো। প্রেত দু'টি পরে ঐ স্থান ত্যাগ করলো।

দরিদ্র লোকটি যে ঐ ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল সে এই দুর্ভাগ্যের জন্য মনে খুবই দুঃখ অনুভব করছিল। তার শরীরের যে অংশগুলো প্রেতগুলো খেয়ে ফেলেছিল সে অংশগুলো ছিল তার পিতার এবং যে অংশগুলো এখন তার শরীরে আছে তা হলো মৃতদেহের। যাহোক, সে আসলে কে ছিল ? সমস্ত ঘটনা অনুধাবনের পরেও সে তা চিহ্নিত করতে পারছিল না এবং হতবুদ্ধিগ্রস্ত হয়ে বিক্ষিপ্ত চিত্তে ঐ ঘর হতে বের হয়ে পড়লো। অবশেষে সে এক বিহারে এসে উপস্থিত হলো এবং তার সমস্ত দুর্দশার কথা বিহারে অবস্হানরত ভিক্ষুকে বললো। মানুষেরা নিজের অস্তিত্ববিহীন প্রকৃত অবস্হা সম্পর্কে তার এই গল্প থেকে অনুধাবন করার চেষ্টা করতে পারে।

১১। একদা এক সুন্দরী ও সুবেশী মহিলা এক বাড়ীতে বেড়াতে গেল। গৃহকর্তা তাকে জিজ্ঞাসা করলো, সে কে ? এতে মহিলাটি প্রত্যুত্তরে বললো, সে সম্পদের দেবী। গৃহকর্তা এতে খুবই খুশী হয়ে তাকে ভালভাবে আপ্যায়ন করলো।

কিছুক্ষণ পরে অন্য একজন মহিলা উপস্হিত হলো-সে দেখতে বিশ্রী এবং সুবেশী ছিল না। গৃহকর্তা তাকে জিজ্ঞাসা করলো সে কে ? মহিলাটি প্রত্যুত্তরে বললো, সে দরিদ্রের দেবী। গৃহকর্তা ভয় পেয়ে গেল এবং তাকে তাড়িয়ে দিতে চাইল। কিন্তু মহিলাটি চলে যেতে অস্বীকার করলো এবং বললো যে, "সম্পদের দেবী তার বোন। আমাদের মধ্যে অঙ্গীকার রয়েছে যে আমরা পরস্পর আলাদা হবো না। তুমি যদি আমাকে ঘর থেকে চলে যেতে বলো, তাহলে সেও আমার সাথে চলে যাবে।" সত্যি সত্যি বিশ্রী মহিলাটি ঘর ত্যাগ করার সাথে সাথে সম্পদের দেবীও ঘর ছেড়ে চলে গেল।

জন্মের সাথে মৃত্যুও জড়িত। তেমনি সৌভাগ্যের সাথে দুর্ভাগ্যও জড়িত। মন্দ কিছুকে ভালোও অনুসরণ করে। মানুষের তা বুঝা উচিৎ। বোকা লোকেরা দুর্ভাগ্যকে ভয় পায় এবং সৌভাগ্যের দিকে দৌঁড়ায়, কিন্তু যাঁরা বোধি জ্ঞান অর্জন করতে চায়, তাদের উভয়ের প্রতি সংস্কারমুক্ত, অনাসক্ত হওয়া উচিৎ এবং জাগতিক ভোগ-বিলাস যুক্ত আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়া উচিৎ।

১২। একদা এক দরিদ্র শিল্পী তার ভাগ্য অন্বেষায় বাড়ী ও তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে

বের হয়ে পড়েছিল। তিন বৎসর কঠোর পরিশ্রমের পরে সে ৩০০ স্বর্ণমুদ্রা সঞ্চয় করলো এবং সিদ্ধান্ত নিল যে, সে বাড়ীতে ফিরে যাবে। পথিমধ্যে সে এক বড় বিহারের সামনে উপস্থিত হলো যেখানে দানের উদ্দেশ্যে বিশাল অনুষ্ঠান চলছিল। এটি দর্শন করে তার মন খুবই উৎসাহিত হলো এবং সে নিজে নিজে চিন্তা করলো, "এ পর্যন্ত আমি কেবলমাত্র আমার বর্তমান অবস্থা নিয়ে চিন্তা করেছি; আমি আমার ভবিষ্যৎ সুখের কথা ভাবিনি। আমার সৌভাগ্য যে আমি এই বিহারের সম্মুখে এসেছি, আমার অবশ্যই পুণ্যের বীজ বপনের সুযোগ নেয়া উচিৎ।" এরূপ চিন্তা করে উদার চিত্তে তার অর্জিত সব অর্থ সে দান করে দিয়েছিল এবং শূন্য হাতে বাড়ীতে ফিরে গিয়েছিল।

যখন সে বাড়ীতে পৌঁছাল তখন তার স্ত্রী তার প্রয়োজনে সামান্য পরিমাণ অর্থও সাথে না আনাতে তাকে তিরস্কার করতে লাগল। প্রত্যুত্তরে দরিদ্র শিল্পীটি বললো, আমি সামান্য পরিমাণ অর্থ উপার্জন করেছিলাম। কিন্তু ঐ অর্থ নিরাপদ স্থানে সঞ্চয় করে রেখেছি। যখন তার স্ত্রী টাকাগুলো কোথায় লুকিয়ে রেখেছে তা জানার জন্যে জোড়াজুড়ি করছিল, তখন সে স্পষ্ট স্বীকার করেছিল যে, তা একটি বিহারের ভিক্ষুকে দান করে দিয়েছে।

এটা শুনে তার স্ত্রী তাকে গালাগালি করল এবং স্থানীয় বিচারকের কাছে বিচার দিল। যখন বিচারক শিল্পীকে তার বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি দেখাতে বলল, তখন সে বলল আমি বোকার মত কাজ করিনি; যেহেতু আমি দীর্ঘ এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করেছি সেহেতু ঐ অর্থগুলোকে আমি ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের জন্য দান করেছি। যখন আমি ঐ বিহারে পৌঁছেছিলাম তখন আমার মনে হয়েছিল, এখানে অর্থগুলো দান করলে ভবিষ্যতে সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়া যাবে। সে আরও বললো, "আমি যখন বিহারের ভিক্ষুকে অর্থগুলো দান করছিলাম তখন মনে হয়েছিল আমি আমার মনের ভোগলালসা ও কৃপনতাভাব ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছি এবং এটাও বুঝতে পেরেছিলাম যে সত্যিকার সম্পদ স্বর্ণালংকার নয়, তা হলো মন।"

বিচারক তার এ বোধোদয়ের প্রশংসা করল এবং যারা এ কাহিনী শুনল তারা সবাই নানাভাবে তাকে ধন্যবাদ জানালো। এভাবে শিল্পী এবং তার স্ত্রী চিরস্থায়ী

সৌভাগ্যের জগতে প্রবেশ করল।

১৩। শ্মশানের পাশে বসবাসকারী একজন লোক এক রাতে শ্মশান থেকে তাকে ডাকছে এমন শব্দ শুনতে পেল। সে এতই ভীতু যে নিজে এর তদন্ত করতে ভয় পেয়ে গেল। পরের দিন এই ব্যাপারে তার একজন সাহসী বন্ধুকে জানাল। লোকটি পরের দিন রাত্রে শব্দটি কোথা থেকে আসে তা খুঁজে দেখতে মনস্হির করল।

যখন ভীতু লোকটি ভয়ে কাঁপছিল, তখন তার বন্ধু শ্মশানে গেল, এবং নিশ্চিত হলো যে, ঐ শব্দ ঠিকই শ্মশান থেকে আসছে। ভীতু লোকটির বন্ধু জিজ্ঞাসা করলো, কে এই শব্দ করছে এবং সে কি চায় ? তখন মাটির নীচ থেকে একটি কন্ঠস্বর উত্তর দিল "আমি মাটির নীচে লুকায়িত সম্পদ বলছি; এই সম্পদ আমি কাকেও দিয়ে দিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। তাই আমি গতরাত্রে একজনকে এই প্রস্তাব দিয়েছিলাম, কিন্তু সে এতই ভীতু যে সম্পদ গ্রহণ করতে আসেনি। তাই আমি তোমাকে এই সম্পদগুলো দেব, কারণ তুমিই ইহা পাওয়ার যোগ্য। আগামীকাল সকালে আমি আমার অন্য সাতজন অনুসারীকে সাথে নিয়ে তোমার বাড়ীতে যাব।"

সাহসী লোকটি বললো, "আমি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করব ঠিক, কিন্তু দয়া করে আমাকে বলো আমি কিভাবে তোমাদের সেবা করব।" অলৌকিক কন্ঠস্বর উত্তরে বললো, "আমরা ভিক্ষু বেশে তোমার বাড়ীতে যাব, আমাদের জন্য পানি সহ একটি কক্ষ প্রস্তুত রাখবে; তোমার শরীর পরিস্কার করে ধৌত করার পরই তুমি ঐ কক্ষ পরিস্কার করবে। আমাদের জন্য বসার আসন তৈরী করবে এবং ৮ বাটি চালের তৈরী জাউ রান্না করবে। আহারের পরে, তুমি আমাদেরকে একজন একজন করে বদ্ধ এক ঘরে নিয়ে যাবে, যেখানে আমরা স্বর্ণের কলসিতে পরিণত হবো।"

পরদিন লোকটিকে যেভাবে বলা হয়েছিলো ঠিক সেভাবে সে তার শরীর ধৌত করে কক্ষ পরিস্কার করলো এবং ৮ জন ভিক্ষু আসার প্রতীক্ষায় রইল। ঠিক সময়ে তারা উপস্হিত হলো এবং সে তাদেরকে বরণ করে নিল। আহার গ্রহণের পর সে এক এক জন করে তাদেরকে একটি বদ্ধ ঘরে নিয়ে গেল, যেখানে তারা স্বর্ণ ভর্তি

কলসিতে রূপান্তরিত হলো।

একই গ্রামে ছিল এক অতীব লোভী ব্যক্তি সে এ ঘটনার কথা শুনলো এবং স্বর্ণের কলসিগুলো পেতে চাইল। সেও একইভাবে ৮ জন ভিক্ষুকে তার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ জানালো। আহারের পরে সে তাদেরকে একটি বদ্ধ ঘরে নিয়ে গেল। কিন্তু তারা স্বর্ণের কলসিতে পরিণত না হয়ে রাগান্বিত হলো এবং লোভী লোকটিকে পুলিশে হস্তান্তর করলো।

ভীতু লোকটি যখন শুনলো যে শ্মশান থেকে ভেসে আসা কন্ঠস্বর তার সাহসী বন্ধুকে ধনী ব্যক্তিতে পরিণত করেছে, তখন সে লোভের বশবর্তী হয়ে তার বন্ধুটির বাড়ীতে ছুটে গেল এবং স্বর্ণের কলসিগুলোর মালিকানা দাবী করলো। সে বলে উঠলো যে এই কন্ঠস্বর আমিই প্রথমে শুনেছি, তাই এই স্বর্ণের কলসির মালিক আমি। ভীতু লোকটি যখন স্বর্ণের কলসিগুলো নিয়ে যেতে চাইলো তখন সে কলসিগুলোর ভিতরে অনেক সাপ দেখতে পেলো যেগুলো ফণা তুলে আছে তাকে কামড়ানোর জন্য।

রাজা উক্ত ঘটনাটি শুনলেন এবং আদেশ জারী করলেন যে স্বর্ণের কলসিগুলোর মালিক সাহসী লোকটিই। তিনি আরও বললেন, "এই পৃথিবীতে সবকিছুই এভাবে ঘটে। বোকা লোকেরা কেবল ভাল ফলের জন্য লালায়িত হয়ে থাকে; ভীতুরা এর পিছনে ছুটে এবং এতে তারা ক্রমাগতভাবে ব্যর্থ হয়। তাদের মাঝে মনের আভ্যন্তরীণ সমস্যা মোকাবেলা করার বিশ্বাসও নেই, আবার সাহসও নেই যার মাধ্যমে সত্যিকারের মানসিক শান্তি এবং স্হিরতা অর্জন করা যায়।"

২য় পরিচ্ছেদ
সফলতা অর্জনের ব্যবহারিক পদ্ধতি

১
সত্যের সন্ধানে

১। সত্যের সন্ধানে কতিপয় প্রশ্নের অবতারণা করা হয়, যা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেমন, কি বস্তু দিয়ে এই বিশ্ব গঠিত ? এই বিশ্ব কি চিরন্তন ? এই বিশ্বের সীমারেখা আছে কি নাই ? কিভাবে এই মানব সমাজ একত্রিত হয়েছে ? মানব সমাজের জন্য আদর্শ সাংগঠনিক কাঠামো কি ? যদি কোন ব্যক্তি এই সকল প্রশ্নের সমাধান না পাওয়া পর্যন্ত, জ্ঞানের সন্ধান বা জ্ঞান অর্জনের চর্চা বন্ধ রাখে, সে জ্ঞান অর্জনের পথ খুঁজে পাওয়ার পূর্বেই মারা যাবে।

মনে করুন, একজন লোক বিষাক্ত তীর দ্বারা আক্রান্ত হলো। এতে তার আত্নীয়-স্বজন এবং বন্ধুরা ডাক্তারের কাছে গেলো তীরটি বের করার জন্য এবং ক্ষত স্হানটি ভালো করার জন্য।

যদি আহত লোকটি এ বলে বাঁধা দেয় যে, "কিছুক্ষন অপেক্ষা করো, তীরটি বের করার পূর্বে আমি জানতে চাই, কে ইহা নিক্ষেপ করেছে ? সে কি মহিলা, না পুরুষ ? সে কি উচ্চ বর্ণের লোক, নাকি কৃষক ? তীর ছোড়ার যন্ত্রটি কিসের তৈরী ? ইহা কি বড়, না ছোট ? ইহা কি কাঠের, নাকি বাঁশের তৈরী ? ধনুকটি কি দিয়ে তৈরী ছিলো ? ইহা কি আঁশ দিয়ে তৈরী, নাকি তার দিয়ে তৈরী ? তীরটি কি লাঠি, না ধাতব পাত দিয়ে তৈরী ? ঐ তীরে কি ধরনের পালক ব্যবহার করা হয়েছে ? তোমরা তীরটি বের করার পূর্বে আমি এসব প্রশ্নের উত্তর জানতে চাই।"
তারপর যা হওয়ার হবে।

এ সকল প্রশ্নের উত্তর খোঁজার পূর্বেই সন্দেহ নেই, বিষ লোকটির শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে এবং লোকটি মারাও যেতে পারে। প্রথম কর্তব্য হলো তীরটি বের

করা এবং বিষ ছড়ানো প্রতিরোধ করা।

যেখানে একটি আগুনের ফুলকি এই মহাবিশ্বের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তোলে সেখানে এই বিশ্ব সৃষ্টির উপাদান খোঁজা বা মানবিক সমাজ গঠনের আদর্শ উপাদান খোঁজা নিরর্থক।

এ পৃথিবীর সীমারেখা আছে কি নাই, এই পৃথিবী চিরন্তন কিনা এই প্রশ্নের উত্তর জানার চেয়ে জন্ম, বার্ধক্য, জ্বরা এবং মৃত্যু সম্পর্কে জানা জরুরী। দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণা, ভোগান্তি এবং মনোকষ্টের উপস্থিতিতে, আমাদের আগে তা থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে বের করা এবং এর চর্চায় নিজেকে নিবেদিত করা উচিৎ।

বুদ্ধের শিক্ষা ইহাই ধারণ করে, যা জানা প্রয়োজন তা জানতে হবে, আর যা জানার প্রয়োজন নেই তা ত্যাগ করতে হবে। ইহার অর্থ এই যে, যা শিক্ষা করা দরকার তা অবশ্যই শিক্ষা করতে হবে এবং যা বর্জন করা দরকার তা অবশ্যই বর্জন করতে হবে। যা চর্চার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন সম্ভব তা শিক্ষা করা উচিৎ।

অতএব, মানুষের প্রথমে উপলব্ধি করা উচিৎ, কোন কাজটি সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ; কোন সমস্যাটি প্রথমে সমাধান করতে হবে এবং এ জন্য কোথায় বেশী জোর দিতে হবে। এ সকল কাজ করতে গেলে প্রথমে তাদের মনকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এর অর্থ হলো মনকে সংযমতার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।

২। ধরি, একজন লোক বনে গেল গাছের আঁশ সংগ্রহ করতে, কিন্তু সে একবোঝা গাছের শাখা-প্রশাখা এবং পাতা নিয়ে ফিরে এলো। সে মনে করছে, যে জন্য সে বনে গিয়েছিল তার সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। সে কি বোকা নয় ? যদি সে গাছের ছাল বা গাছ এনে সন্তুষ্ট হয়, তাহলে কেন সে গাছের আঁশ সংগ্রহ করতে গেল ? কিন্তু এটাই সত্যি এবং সাধারণত মানুষেরা তাই করে থাকে।

একজন লোক এমন পথ অনুসন্ধান করে, যা তাকে জন্ম, বৃদ্ধ অবস্হা, বার্ধক্য এবং মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারে; অথবা ভোগান্তি, দুঃখ, মনোকষ্ট থেকে

মুক্তি লাভ করতে পারে। কিন্তু মানুষ কিছুদূর চলার পর যখন সে সামান্য উত্তরণ লাভ করে, এর পরপরই সে গর্বিত ও উদ্ধত হয় এবং দাম্ভিকতা প্রকাশ করে। আসলে, সে উপরে উল্লেখিত লোকটির মতোই গাছের সন্ধানে গিয়ে একবোঝা গাছের শাখা প্রশাখা ও পাতা নিয়েই সন্তুষ্ট হয়।

অন্য একজন লোক সামান্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে যা অর্জন করে, তা নিয়েই সন্তুষ্ট হয় এবং কর্মে শিথিলতা অনুভব করে, গর্ব এবং অহংকার প্রকাশ করে। এর অর্থ হলো, গাছের মধ্যেকার আঁশের সন্ধানের পরিবর্তে এক বোঝা গাছের শাখা প্রশাখা নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়া।

আবার অন্য এক ধরনের লোক আছে, তারা ভাবে যে তার মন শান্ত হয়ে আসছে, তার চিন্তা-ধারা ক্রমান্বয়ে স্বচ্ছ হয়ে আসছে। তখন তার প্রচেষ্টায় শিথিলতাভাব দেখা যায় এবং গর্ব ও অভিমান করে। ঐ ব্যক্তিও গাছের আঁশ সন্ধানের পরিবর্তে ছাল নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার মতোই।

পুনরায় অন্য এক ধরনের মানুষ আছে, তারা জ্ঞানের গভীরতার জন্য অহংকার করে। তারাও গাছের আঁশ লাভ না করে, একবোঝা সরু গাছ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে। এসকল অনুসন্ধানী যারা সামান্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে সহজেই সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়, তারা গর্ব ও আত্মম্ভরিতা অনুভব করে। অতঃপর দেখা যায়, তাদের চেষ্টার মধ্যে শিথিলতা দেখা দিচ্ছে এবং সহজেই অলস হয়ে পড়ছে। ফলে নিশ্চিতভাবে তারা পুনরায় ভোগান্তির মুখোমুখি হয়।

যারা সঠিক জ্ঞানের অনুসন্ধানী কোনভাবেই তাদের মনে সম্মান, মর্যাদা বা অনুরক্তি প্রত্যাশা করা উচিৎ নয়। তদুপরি, প্রশান্তি, জ্ঞান বা জ্ঞানের গভীরতা অর্জনের পথে ন্যূনতম প্রচেষ্টা কখনো তাদের লক্ষ্য হতে পারে না।

সর্বপ্রথমে, একজন মানুষের মনে এই বিশ্বে বিরাজমান জন্ম ও মৃত্যুর মৌলিক ও প্রকৃত স্বরূপটা সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে ধারণা থাকা উচিৎ।

সফলতা অর্জনের ব্যবহারিক পদ্ধতি

৩। এই মহাবিশ্বের নিজস্ব কোন উপাদান নেই। ইহা হলো বিপুল পরিমাণ সামঞ্জস্যপূর্ণ কার্য-কারণ সম্পর্কের মিলন মাত্র; যাদের মৌলিক, একক এবং অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আমাদের মনের কার্যাবলীতে যা অজ্ঞতা, মিথ্যা ধারণা, আকাংখা এবং মোহ হিসেবে প্রকাশিত হয়। মনে সর্বদা যে মিথ্যা ধারণারাশির সৃষ্টি হয়, তার কোন বাহ্যিক কাঠামো বা উপাদানের অস্তিত্ব নেই। ইহা মনের নিজস্ব প্রক্রিয়া, যা সেই মোহের প্রকাশ ভঙ্গির মাধ্যমে উন্মোচিত হয়। ইহা মনের আকাংখা, ভোগান্তির পরিণাম, নিজস্ব লালসা, রাগ এবং বোকামির দ্বারা যে কষ্ট মর্মবেদনা সৃষ্টি হয়, তা তার মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। যাঁরা জ্ঞান অর্জনে প্রত্যাশী তাঁরা তাঁদের লক্ষ্যে পৌঁছা পর্যন্ত এসকল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত থাকবে।

৪। "হে আমার মন ! কেন তুমি আমাকে জীবনের এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এত অবিশ্রান্তভাবে দোদুল্যমান রেখেছো ? কেন তুমি আমাকে এত দ্বিধাগ্রস্ত এবং অস্থির রাখো ? কেন তুমি আমাকে এত বস্তু সংগ্রহে প্ররোচিত করো ? তুমি যেন লাঙ্গলের মত, যা চাষাবাদের পূর্বে মাটিকে টুকরা টুকরা করে আবাদের অবস্থায় পরিণত করে। তুমি জীবন ও মৃত্যু স্বরূপ সমুদ্রে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় মইয়ের ন্যায় সবকিছুকে চুর্ণবিচুর্ণ করে দাও। আমাদের এত পুনঃজন্মের প্রয়োজন কি, যদি না আমরা আমাদের বর্তমান জীবনেরই সদ্ব্যবহার করতে না পারি ?"

"হে আমার মন ! একবার তুমি আমাকে রাজা হিসেবে জন্মগ্রহণ করিয়েছো; পরে আবার দীন-দরিদ্র হিসেবে জন্মগ্রহণ করিয়ে দ্বারে দ্বারে খাবারের জন্য ভিক্ষা করিয়েছো। কখনও কখনও তুমি আমাকে নিয়ে যাও স্বর্গের সুরম্য অট্টালিকায় এবং বিলাস বহুল ও পরমানন্দে জীবন কাটাতে; আবার সেই তুমিই আমাকে বাধ্য করো নরকের অগ্নি শিখায় দগ্ধ হতে।"

"হে আমার নির্বোধ মন ! এভাবে তুমি আমাকে বাধ্য করো বিভিন্ন পথে হাঁটতে এবং তোমার প্রতি বাধ্য ও অনুগত হতে। কিন্তু আমি এখন বুদ্ধের শিক্ষা সম্পর্কে জেনেছি, আমাকে আর বিরক্ত করো না এবং পুনরায় কষ্টে ফেলো না। বরং চলো আমরা একত্রে বিনম্র ও সুস্থির চিত্তে জ্ঞানের অনুসন্ধানে ব্রতী হই।"

"হে আমার মন ! যদি কেবল মাত্র তুমি জান যে পৃথিবীর প্রতিটি জিনিষই অস্থিত্ববিহীন, ক্ষণস্থায়ী; তখন বস্তুর পিছনে লালায়িত হওয়া; পর সম্পত্তি কামনা করা; এবং লোভ, দ্বেষ ও মোহের পেছনে তাড়িত হওয়া উচিৎ নয়। তাহলেই আমরা শান্তির পথে যাত্রা করতে পারি। তারপর আমাদের রিপুগুলোকে বিজ্ঞতার তলোয়ার দ্বারা কেটে কেটে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে স্থির অবস্থায় থেকে, সুবিধা বা অসুবিধা, ভাল বা মন্দ, লাভ বা অলাভ, প্রশংসা বা নিন্দা দ্বারা প্রভাবিত না হলে, আমরা শান্তিতে বাস করতে পারি।"

"হে আমার প্রিয় মন ! তুমিই প্রথম আমার মনে বিশ্বাস জাগ্রত করিয়েছো; তুমিই সে, যে আমাকে জ্ঞান অন্বেষণের পথ খোঁজার উপদেশ দিয়েছো। কেন তুমি আবার এত সহজে লোভী হতে, আরামকে ভালবাসতে এবং আবেগের দ্বারা আন্দোলিত হতে বাধ্য করো ?"

"হে আমার মন ! কেন তুমি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছাড়া এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াও ? চলো আমরা মোহের হিংস্র সমুদ্র পেরিয়ে যাই। এযাবত আমি তোমার ইচ্ছানুসারে কাজ করে আসছি, কিন্তু এখন তোমাকে আমার ইচ্ছামত কাজ করতে হবে; এবং একত্রে আমরা বুদ্ধের শিক্ষাকে অনুসরণ করবো।"

"হে আমার প্রিয় মন ! এই পর্বতমালা, নদী, নালা এবং সাগর সমূহ পরিবর্তনশীল এবং বেদনা উৎপাদক। এই মোহপূর্ণ পৃথিবীতে কিভাবে আমরা শান্তি প্রত্যাশা করতে পারি ? চলো আমরা বুদ্ধের শিক্ষাকে অনুসরণ করি এবং জ্ঞানের অন্য স্তরে গমন করি।"

৫। যারা সত্যিকার জ্ঞানের প্রত্যাশী তারা তাদের মনকে এভাবেই কোমল ও কঠোরভাবে এই পথে নিবেদিত করবে। তারপরেই তারা কঠিন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবে। এমনকি যদি তারা কারো দ্বারা নিন্দিত বা অপমানিতও হয়, তখনো তারা নির্বিকারে সামনে এগিয়ে যেতে পারবে। যদি তাদের লাঠি দিয়ে মারা হয়, পাথর দিয়ে আঘাত করা হয়, বা তলোয়ার দিয়ে খোঁচানোও হয়, তবুও তারা রাগান্বিত হয় না।

সফলতা অর্জনের ব্যবহারিক পদ্ধতি

এমনকি শত্রু যদি শরীর থেকে তাদের মাথা ছিন্নও করে ফেলে, তখনো তাদের মন স্বাভাবিক থাকে। তারা যে কষ্ট ভোগ করছে, তার দ্বারা যদি তাদের মন আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তাহলে তারা বুদ্ধের শিক্ষা গ্রহণ করছে না। তাদের এমনভাবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে যে, তাদের প্রতি যাই ঘটুক না কেন নিজেদেরকে হতে হবে অবিচলিত, অনঢ়, চিরপ্রদীপ্ত চিন্তাধারা, করুণাময় এবং সহযোগিতামূলক। যতই বঞ্চনা আসুক, যতই দুর্ভাগ্য জড়িয়ে ধরুক, একজন মানুষ যদি অবিচলিত থাকে এবং মনকে শান্ত রাখতে পারে, তাহলে বুঝতে হবে যে বুদ্ধের শিক্ষা তার ব্যবহারিক কাজে এসেছে।

আমাদেরকে প্রকৃত বুদ্ধত্বজ্ঞান অর্জন করতে হবে, অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে, অজেয়কে জয় করতে হবে। আমাদেরকে নিজেদের সর্বশেষ শক্তি দিয়ে তা অর্জনের জন্য সচেষ্ট হতে হবে। যদি কাকেও বলা হয় যে বুদ্ধত্বজ্ঞান অর্জনের জন্য দিনে মাত্র ভাতের একটি দানা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে, তাই তাকে করতে হবে। যদি বুদ্ধত্বজ্ঞান অর্জনের জন্য তাকে আগুনের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে হয়, তাকে তাই করতে হবে।

কিন্তু অভিসন্ধিমূলকভাবে কোন কিছু করা উচিৎ নয়। বিজ্ঞতা এবং উদারতার সাথে সঠিক কাজ করা উচিৎ। মা যেমন নিজের পুত্রকে স্নেহপরবশ হয়ে আদর যত্ন করে, অসুস্হ্যতার সময়ে সেবা শুশ্রুষা করে, যা তার নিজের আরাম আয়েশের জন্য করে না।

৬। একদা একদেশে এক রাজা ছিলেন। তিনি নিজের রাজ্যের জনগণকে এবং রাজ্যকে খুবই ভালবাসতেন। তিনি বিজ্ঞতা ও দয়ার দ্বারা দেশ শাসন করতেন, যার ফলে তাঁর দেশ উন্নতি লাভ করছিল এবং প্রজাগণ শান্তিতে বাস করছিল। তিনি সর্বদা উচ্চতর প্রজ্ঞা এবং জ্ঞানের অনুসন্ধানী ছিলেন। যিনি তাঁকে মূল্যবান শিক্ষা সম্পর্কে পথনির্দেশনা দিতেন, তিনি তাকে পুরস্কৃত করতেন।

তাঁর এই ধার্মিকতা এবং বিজ্ঞতা দেবতাদের দৃষ্টি আকর্ষন করলো। কিন্তু তাঁরা তাঁকে পরীক্ষা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। একদিন এক দেবতা দানব বেশে

রাজপ্রাসাদের দ্বারে উপস্হিত হলেন এবং দ্বাররক্ষীদেরকে বললেন তাঁকে রাজার কাছে নিয়ে যেতে; যেহেতু তিনি রাজার জন্য পবিত্র শিক্ষা নিয়ে এসেছেন।

যথা সময়ে রাজার কাছে ঐ খবর পৌঁছানো হলো। এতে রাজা খুবই খুশী হয়ে সন্তুষ্টচিত্তে এবং আন্তরিকভাবে তাকে স্বাগত জানালেন এবং তার নির্দেশনা প্রার্থনা করলেন। হঠাৎ দানবটি রুদ্রবেশ ধারণ করল এবং খাবার দাবী করল এই বলে যে, সে তার চাহিদামতো খাবার না পেলে শিক্ষাদান করবে না। অতঃপর তাকে তার পছন্দমতো খাবার প্রদান করা হলো। কিন্তু সে জোড়াজুড়ি করতে লাগলো এই বলে যে, তাকে অবশ্যই মানুষের উষ্ণ মাংস এবং রক্ত দিতে হবে ভক্ষনের জন্যে। এতে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী যুবরাজ তার শরীর দান করলেন এবং রানীও তার শরীর দান করলেন। কিন্তু তবুও দানবটি অসন্তুষ্টই রয়ে গেল এবং রাজার শরীর ভক্ষনের দাবী করতে লাগল।

রাজা তাঁর শরীর দান করতে সদিচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু তিনি দাবী করলেন যে তাঁর শরীর দান করার পূর্বে শিক্ষাটি শ্রবণ করতে চান।

এতে দানবটি নিম্নোক্ত জ্ঞানগর্ভ শিক্ষাটি বর্ণনা করলো, "তৃষ্ণা থেকে দুঃখ ও ভয় উৎপন্ন হয়; যার তৃষ্ণা নাই তার দুঃখও নাই, ভয়ও নাই।" এরপর হঠাৎ করে দানবটি তার আসলরূপে আবির্ভূত হলেন। যুবরাজ এবং রানীও তাদের পূর্বের অবস্হায় রাজার সম্মুখে আবির্ভূত হলেন।

৭। একদা কোন এক গ্রামে একব্যক্তি ছিলেন, যিনি হিমালয় পর্বতে সত্যিকার পথের অনুসন্ধানে বেরিয়েছিলেন। তিনি বৈষয়িক ও স্বর্গীয় কোন সম্পদই কামনা করেন না; কিন্তু ঐ শিক্ষাই তিনি অনুসন্ধান করেন, যার দ্বারা নিজের মনের সকল প্রকার মোহ হতে মুক্তি লাভ করা যায়।

এক দেবতা লোকটির আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততায় সন্তুষ্ট হয়েছিল এবং তাঁর মনকে পরীক্ষা করতে চাইলো। তাই দেবতাটি ছদ্মবেশে হিমালয় পর্বতের ধারে তাঁর সামনে উপস্হিত হলো এবং গানের সুরে বলতে লাগলো, "এই পৃথিবীর সবকিছুই অনিত্য,

সব কিছুই উৎপন্ন হয় এবং আবার বিলীন হয়।"

সত্যানুসন্ধানী উক্ত গানের কথাগুলো শুনলেন যা তাঁকে খুবই সন্তুষ্ট করল। তিনি এতই আনন্দিত হলেন যে যাতে তাঁর মনে হলো তিনি পিপাসা নিবারণের জন্য শীতল পানির ঝর্ণা খুঁজে পেলেন; বা তাঁর মনে হলো যে, একজন বন্দী অপ্রত্যাশিতভাবে মুক্তি পেল। তিনি নিজেকে নিজে বললেন "অবশেষে আমি সত্যিকার শিক্ষার সন্ধান পেয়েছি; যা আমি দীর্ঘদিন ধরে খুঁজছিলাম।" তিনি কণ্ঠস্বরটি অনুসরণ করলেন এবং ভয়ঙ্কর দেবতাটির সামনে উপস্থিত হলেন। অসতর্ক মনে তিনি দেবতাটিকে আবেদন জানিয়ে বললেন, "তুমি কি সেই, যে গানটি গেয়েছিলে যা আমি এই মুহূর্তে শুনলাম।" যদি তুমি তাই হও, তাহলে পুরো গানটি গেয়ে শেষ করো।

দেবতাটি উত্তর দিল, "হ্যাঁ, ইহা আমার গান; কিন্তু আমি এর বেশী গাইতে পারবো না, যদি আমি কিছু খেতে না পাই। কারণ আমি ক্ষুধার্ত।"

লোকটি গানটির অবশিষ্টাংশ শোনার জন্য এ বলে প্রার্থনা জানালেন যে, "আমার কাছে এর গভীর অর্থ রয়েছে এবং আমি দীর্ঘকাল যাবৎ এই শিক্ষার পেছনে ছুটছি। আমি কেবল এর কিছু অংশ শুনেছি, দয়া করে আমাকে অবশিষ্টাংশটি শোনাও।"

লোকটি শিক্ষার বাণী শোনার আগ্রহে দেবতার কাছে প্রতিজ্ঞা করলেন, শিক্ষার বাণীগুলো শোনার পর স্বেচ্ছায় তিনি তাঁর শরীর দান করে দেবেন। এরপর দেবতাটি পুরো গানটি শেষ করলো। গানটির কথাগুলো হলো নিম্নরূপ ঃ

এ জগতে প্রত্যেক কিছুই পরিবর্তনশীল,
সবকিছুই উৎপন্ন হয় এবং আবার বিলুপ্ত হয়;
প্রকৃত শান্তি তখনই আসে,
যখন কেউ জন্ম ও মৃত্যুকে অতিক্রম করে।

গানটি শোনার পর লোকটি তাঁর চতুর্দিকের পাথর ও গাছের মধ্যে কবিতা

লিখলো। পরে শান্তভাবে গাছে উঠে বসলেন এবং স্বজোরে নিজেকে দেবতার পায়ের কাছে নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু হঠাৎ দেবতাটি সেখান থেকে অন্তর্ধান হয়ে গেল এবং এর পরিবর্তে একজন দীপ্তিমান দেবতা লোকটির অক্ষত দেহ গ্রহণ করলো।

৮। কোন এক সময়ে সাদাপ্রারুদিতা নামে সত্য পথ অন্বেষণকারী এক লোক ছিলো। সে একদিকে সব ধরনের লাভ বা সম্মানের প্রতি প্রলুব্ধ ছিলো এবং অন্যদিকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সত্যের অনুসন্ধানে ব্রত ছিল। একদিন স্বর্গ থেকে সে আওয়াজ শুনতে পেলো, "সাদাপ্রারুদিতা ! তুমি সোজা পূর্ব দিকে চলে যাও, ঠান্ডা বা গরমের কথা চিন্তা করবে না; বৈষয়িক কোন প্রশংসা বা ঘৃণার প্রতি মনোযোগ দেবে না; ভাল বা মন্দের পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি দেবে না; কেবল পূর্ব দিকে যেতে থাক। সুদূর পূর্বে গেলে তুমি এক সত্যিকার শিক্ষক খুঁজে পাবে এবং জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হবে।"

সাদাপ্রারুদিতা সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা পেয়ে সন্তুষ্ট হলো এবং অতি তাড়াতাড়ি পূর্বদিকে যাত্রা শুরু করলো। মাঝে মাঝে যখন রাত্রি নেমে আসতো তখন সে বিশ্রাম নিত এবং নিজেকে খোলা মাঠ বা গভীর পর্বতের মাঝে আবিস্কার করতো।

বিদেশের মাটিতে আগন্তুক হয়ে আসার পর সে অনেক অবমাননা বোধ করেছিল। একবার সে নিজেকে দাস হিসেবে বিক্রী করে দিয়েছিল; ক্ষুধার জ্বালায় সে নিজের শরীরের মাংস বিক্রী করে দিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সত্যিকার শিক্ষকের খোঁজ পেল এবং তার কাছে দিকনির্দেশনা প্রার্থনা করলো।

প্রবাদ আছে, "ভাল কিছুর জন্য সবসময় মূল্য দিতে হয়" এবং সাদাপ্রারুদিতা তার বেলায়ও এর সত্যতা খুঁজে পেল। সত্যানুসন্ধানের এই পরিক্রমায় সে নানাবিধ জটিলতা ভোগ করেছিল। তার কাছে এমন কোন অর্থও ছিল না, যা দিয়ে সে শিক্ষককে দেয়ার জন্য ফুল বা ধূপ কিনবে। সে এজন্য চাকরী করতে চাইলো কিন্তু কেউ তাকে চাকুরীতেও নিলনা। তার মনে হচ্ছিল যে, সে যেদিকে যাচ্ছিল খারাপ

একটি শক্তি তার পথকে কণ্টকাকীর্ণ করছিল। জ্ঞানের সন্ধান লাভ করা খুবই কঠিন এবং এর জন্য নিজের জীবনকে মূল্য হিসেবে দিতে হতে পারে।

অবশেষে, সাদাপ্রারুদিতা তার শিক্ষকের সামনে উপস্থিত হলো এবং এরপর সে নতুন জটিলতায় উপনীত হলো। তার নিকট কাগজ ছিল না লিখার জন্য; কালি ছিলনা যার দ্বারা সে লিখবে। তাই পরে সে ছুরি দিয়ে নিজের হাতের কব্জি কেটে রক্তের মাধ্যমে লিখা শুরু করলো। এভাবে সে মূল্যবান শিক্ষা অর্জন করলো।

৯। এক সময়ে কোন এক গ্রামে সুধানা নামে এক বালক ছিল; যে জ্ঞানানুসন্ধানে নিবেদিত ছিল। জেলের কাছ থেকে সে সমুদ্রবিদ্যা শিখল। ডাক্তারের কাছ থেকে রোগীদের কষ্টের সময়ে সমব্যথিত হতে শিক্ষা লাভ করলো। ধনীর কাছে সে শিক্ষা নিল যে, অর্থ সঞ্চয়ই তার জীবনে সৌভাগ্যের চাবিকাঠি এবং অর্জিত সবকিছুই জীবনে জ্ঞান লাভে কত যে প্রয়োজন তা চিন্তা করলো।

একজন ধ্যানী ভিক্ষুর কাছ থেকে সে শিক্ষা করলো যে পবিত্র ও শান্ত মনে জাদুকরী ক্ষমতা লুকায়িত রয়েছে যা অন্যের মনকেও পবিত্র ও শান্ত করতে পারে। তারপর, সে একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহিলার সাথে দেখা করল এবং সে তার পরহিতমূলক কাজে উৎসাহিত হলো। ঐ মহিলার কাছ থেকে সে শিক্ষা লাভ করল যে, পরহিতমূলক কাজ বিজ্ঞতারই ফসল। এরপরে সে একজন বৃদ্ধ আগন্তুকের দর্শন পেলো। আগন্তুকটির কাছে সে শিক্ষা লাভ করল যে, কোন এক লক্ষ্যবস্তুতে উপনীত হতে হলে তরবারীর ন্যায় তীক্ষ্ণ পর্বত এবং আগুনের উপত্যকার ভিতর দিয়েও অতিক্রম করতে হয়। অবশেষে সুধানা নিজের এই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা লাভ করল যে, সে যা কিছু দেখেছে এবং শুনেছে সেগুলোর মাধ্যমে প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করা সম্ভব।

সে গরীব এক পঙ্গু মহিলার কাছ থেকে ধৈর্য্য সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করল; রাস্তায় খেলাধুলা করছিল এমন শিশুদের কাছ থেকে সে শিখেছিল সহজ-সরল জীবন যাত্রা; কিছু ভদ্র ও মার্জিত ব্যক্তি যারা অন্যান্য দশজন লোকের ন্যায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুই প্রতাশা করে না তাদের কাছ থেকে সে এই পৃথিবীতে শান্তিপুর্ণ

জীবন যাপনের পবিত্র শিক্ষা লাভ করলো।

সে ধূপের উপাদানগুলোর ঘূর্নায়নের দৃশ্য দেখে বৈরিতামুক্তির শিক্ষা লাভ করেছিল; ফুলের সুবিন্যস্ততার দৃষ্টান্ত অনুকরণের মাধ্যমে সে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের শিক্ষা নিয়েছিল। একদিন সে বনের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় পরিশ্রান্ত হয়ে বিশাল এক গাছের নীচে বিশ্রাম নিচ্ছিল এবং লক্ষ্য করল যে, পতিত ও ক্ষয়প্রাপ্ত এক গাছের পাশে একটি ক্ষুদ্র চারাগাছ জন্মাচ্ছে; ইহা তাকে জীবনের অনিশ্চয়তা সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছিল।

দিনে সূর্যালোক এবং রাতে তারার অবিরাম ঝিকমিক আলো তার চিন্তাধারাকে শানিত করছিল। এভাবে সুধানা তার সুদীর্ঘ পরিভ্রমণে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল।

অতএব, আসলে যারা প্রকৃত জ্ঞান অর্জনে আগ্রহী তাদের নিজ নিজ মনকে দূর্গ হিসেবে ভাবতে হবে এবং একে উত্তমরূপে সজ্জিত করতে হবে। তাদের অবশ্যই মনোদ্বারকে বুদ্ধের জন্য বিস্তৃতাকারে খুলে দিতে হবে এবং শ্রদ্ধা ও নম্রতার মাধ্যমে তাঁকে অন্তরের অন্তঃস্হলে আমন্ত্রণ জানাতে হবে; এবং সেখানে তাঁকে শ্রদ্ধারূপ সুগন্ধী এবং কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ স্বরূপ ফুলের মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানাতে হবে।

২
অনুশীলনের বিভিন্ন উপায়

১। যারা জ্ঞানের অনুসন্ধানী তাদের জন্য তিনটি অনুশীলনের পথ রয়েছে যা তাদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে এবং অনুসরণ করতে হবে। প্রথমটি হলো, ব্যবহারিক আচরণে শৃঙ্খলা; দ্বিতীয়টি হলো, মনের সঠিক স্হিতিশীলতা; এবং তৃতীয়টি হলো, বিচক্ষণতা।

শৃঙ্খলা কি ? সাধারণ মানুষ বা সত্যানুসন্ধানী সে যেই হউক প্রত্যেককে অবশ্যই সৎ আচরণের জন্য শীল প্রতিপালন করতে হবে। তাকে অবশ্যই তার শরীর ও মন

উভয়কে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারকে পাহারায় রাখতে হবে। খারাপ যে কোন কিছুর প্রতি তার ভয় থাকতে হবে এবং সবসময়ে তাকে কুশল কর্ম সম্পাদনে সচেষ্ট থাকতে হবে।

মনের স্হিতিশীলতা মানে কি ? এর অর্থ হলো, মনে যখন লোভ এবং খারাপ তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, তখন যত দ্রুত সম্ভব তাকে এগুলো হতে দূরে সরিয়ে নেয়া এবং মনকে পরিশুদ্ধ ও শান্ত রাখা।

বিচক্ষণতা বলতে কি বুঝায় ? এর অর্থ হলো, চারি আর্য সত্যকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করা এবং ধৈর্য্যের সাথে তা গ্রহণ করা; দুঃখের কারণ এবং তার স্বভাবকে জানা; দুঃখের কারণ সম্পর্কে জানা; দুঃখ নিরোধের উপায়গুলো জানা এবং আর্য-সত্যকে জানা, যা দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের দিকে নিজেকে পরিচালিত করে।

যারা আন্তরিকভাবে উপরোক্ত তিনটি পথ অনুশীলন করে তাদেরকে সত্যিকারভাবে বুদ্ধের শিষ্য বলা যেতে পারে।

ধরা যাক, একটি গাধা যার গরুর মতো সুন্দর শারীরিক কাঠামো, কন্ঠস্বর এবং শিং নেই; সে যদি গরুর পালের পিছনে গিয়ে দাবী করে, "দেখ, আমিও একটি গরু।" কেহ কি তাকে বিশ্বাস করবে ? তদ্রূপ ইহাও হবে বোকার মতো কাজ যদি না কোন লোক এই তিনটি পথ অনুশীলন না করে গর্ব করে যে, সে সত্যানুসন্ধানী বা বুদ্ধের শিষ্য।

শরৎকালে যখন কৃষক ফসল কাটে, অবশ্যই তার পূর্বে তাকে জমি চাষ করতে হয়, বীজ বপন করতে হয়, সেচ দিতে হয় এবং বসন্তকালে যখন জমিতে আগাছা জন্মায়, তখন তা পরিস্কার করতে হয়। অনুরূপভাবে, জ্ঞান অনুসন্ধানীকে অবশ্যই উক্ত তিনটি পথ অনুশীলন করতে হবে। একজন কৃষক যেমন আজ অন্কুর, কাল চারাগাছ এবং এর পরের দিন শস্য প্রত্যাশা করতে পারে না, তেমনি যদি কেউ জ্ঞান অর্জন করতে চায়, সেও আজ বৈষয়িক তৃষ্ণা থেকে মুক্তি, কাল আসক্তি ও খারাপ তৃষ্ণা থেকে মুক্তি এবং এর পরের দিন জ্ঞান অর্জনও আশা করতে পারে

না।

বীজ বপনের পরে, গাছ থেকে ফল উৎপাদন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পরিবর্তিত আবহাওয়ায় কৃষককে যেমন ধৈর্য্য সহকারে গাছের নানা ধরনের পরিচর্যা করতে হয়, তেমনি জ্ঞানের অনুসন্ধানীদেরকেও উক্ত তিনটি পথ অনুশীলনের মাধ্যমে ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায়ের সাথে জ্ঞানের ভূমিতে চাষাবাদ করতে হয়।

২। যতক্ষণ পর্যন্ত মন তৃষ্ণাসক্ত হয়ে অস্হিতিশীল অবস্হায় থাকে, এবং আরাম-আয়েশের লালসায় থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞানলাভ করা বা জ্ঞান অর্জনের দিকে ধাবিত হওয়া খুবই কঠিন। জীবনকে উপভোগ করা এবং সত্যকে উপভোগ করার মধ্যে বিস্তর তফাৎ আছে।

পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে, মনই সমস্ত কিছুর উৎস। যদি মন বৈষয়িক কিছুকে উপভোগ করতে চায়, তাহলে মায়ামরীচিকা এবং দুঃখ তাকে প্রতিনিয়ত তাড়া করবে। কিন্তু মন যদি সত্যের পথানুসন্ধানে ধাবিত হয়, তাহলে সুখ, প্রশান্তি ও জ্ঞানকে সে উপভোগ করতে পারবে।

অতএব, যারা জ্ঞানের অনুসন্ধানী, তাদের মনকে পরিশুদ্ধ রাখা উচিৎ এবং ধৈর্য্যের সাথে তিনটি পথকে ধরে রাখা ও অনুশীলন করা উচিৎ। যদি তারা শীল প্রতিপালন করে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই মনের স্হিতিশীলতা লাভ করবে; এবং এর ফলে জ্ঞান অর্জন করা তাদের জন্য স্বাভাবিক হবে। পরিশেষে এই জ্ঞান তাদেরকে নির্বাণ প্রত্যক্ষ করার দিকে ধাবিত করবে।

বস্তুতপক্ষে, এই তিনটি পথই (শীল পালন করা, মনকে স্হিতিশীলতায় রাখা এবং সর্বদা বিচক্ষণতার দ্বারা কিছু করা) জ্ঞান অর্জনের জন্য সঠিক পথ বা উপায়।

এই সব পথগুলো অনুসরণ না করলে, মানুষের মনের পুঞ্জিভূত মোহ দূরিভূত করতে অনেক সময় লাগবে। বৈষয়িক লোকদের সাথে তর্ক না করে, তাদের উচিৎ জ্ঞান অর্জনের জন্য অন্তঃস্হিত বিশুদ্ধ মনকে ধৈর্য্যের সাথে সাধনা-মগ্ন রাখা।

সফলতা অর্জনের ব্যবহারিক পদ্ধতি

৩। যদি আমরা অনুশীলনের এই তিনটি পথকে বিশ্লেষণ করি, তাহলে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, চারি প্রকার দৃষ্টিভঙ্গি, চারি প্রকার প্রক্রিয়া, পাঁচ প্রকার বল এবং ছয় প্রকার বিশুদ্ধিতা অনুশীলনের কথা বেরিয়ে আসবে।

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গগুলো হলো, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, ও সম্যক সমাধি।

সম্যক দৃষ্টির অর্থ হলো, চারি আর্য সত্যকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝা, কার্য-কারণ নিয়ম সম্পর্কে বিশ্বাস স্হাপন করা এবং বৈষয়িক অবকাঠামো বা তৃষ্ণা দ্বারা প্রতারিত না হওয়া।

সম্যক সংকল্প মানে, দৃঢ়তার সাথে তৃষ্ণা, লোভ, রাগ এবং অকুশল কর্ম না করার জন্য সংকল্প বদ্ধ হওয়া।

সম্যক বাক্য মানে, মিথ্যা না বলা, নিরর্থক কথা না বলা, কটুক্তিপূর্ণ কথা না বলা এবং দ্বিমুখি কথা না বলা।

সম্যক কর্ম মানে, কোন জীবন ধ্বংস না করা, চুরি না করা এবং ব্যভিচারে লিপ্ত না হওয়া।

সম্যক জীবিকা মানে, প্রাণী বাণিজ্য বাদে বা যার দ্বারা জীবনে লজ্জা ডেকে আনতে পারে, এরূপ জীবিকা হতে বিরত হওয়াকে বুঝায়।

সম্যক প্রচেষ্টার অর্থ হলো, সঠিক লক্ষ্যের প্রতি নিজেকে নিবেদিত করা।

সম্যক স্মৃতি মানে, একটি বিশুদ্ধ ও চিন্তাশীল মন পরিচালনা করা।

সম্যক সমাধি মানে, চিত্তের মধ্যে উৎপন্ন বস্তুর প্রতি সঠিকভাবে এবং শান্তভাবে

মনকে ধরে রাখা এবং মনের বিশুদ্ধ মৌলিকতাকে অনুসন্ধান করা।

৪। চারি দৃষ্টি ভঙ্গি মানে, প্রথমতঃ শরীরকে অশুভ হিসেবে ভাবা এবং একে সকল প্রকার আসক্তি হতে মুক্ত করতে চেষ্টা করা; দ্বিতীয়তঃ পঞ্চস্কন্ধকে দুঃখের উৎস হিসেবে ভাবা, তার মধ্যে বেদনা বা শান্তি উৎপন্ন হলে তাকেও; তৃতীয়তঃ মনকে পরিবর্তনের প্রবাহ হিসেবে ভাবা যেতে পারে; এবং চতুর্থতঃ এ পৃথিবীতে সমস্ত কিছুই কার্য-কারণ নিয়মের মাধ্যমে সংগঠিত হচ্ছে এবং কিছুই শেষ পর্যন্ত অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকবে না।

৫। চারটি সম্যক প্রক্রিয়া হলো, প্রথমতঃ যে কোন খারাপ বা অকুশল কাজকে মনে উৎপন্ন না করা; দ্বিতীয়টি হলো, অকুশল কর্ম যদি করাও হয়, তাহলে তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বন্ধ করা; তৃতীয়তঃ কুশল কর্মের প্রতি মনকে নিয়োজিত করা এবং চতুর্থতঃ যে কুশল কর্ম ইতিমধ্যেই শুরু করা হয়েছে, এর বর্ধিতকরণ এবং একে প্রশংসা করা। এই চারি প্রকার প্রক্রিয়াকে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে পালন করা উচিৎ।

৬। পঞ্চবল হলো, প্রথমতঃ শ্রদ্ধাশক্তির প্রতি বিশ্বাস; দ্বিতীয়তঃ প্রচেষ্টার প্রতি সদিচ্ছা; তৃতীয়তঃ মনের জাগ্রত অবস্থা বা স্মৃতি; চতুর্থতঃ নিজের মনকে স্হিতিশীলতায় আনার ক্ষমতা বা সমাধি এবং পঞ্চমতঃ স্বচ্ছ জ্ঞানলাভের জন্য সক্ষমতা অর্জন বা প্রজ্ঞা। এ পঞ্চবল জ্ঞান অর্জনের জন্য অত্যাবশ্যকীয়।

৭। জ্ঞান অর্জনের অপর ছয়টি উপায় হলো, দান পারমী, শীল পারামী, বীর্য পারামী, ক্ষান্তি পারামী, সমাধি ও প্রজ্ঞা পারামীর মাধ্যমে। এসকল পথ অনুসরণের দ্বারা যে কোন ব্যক্তি অবশ্যই মোহের মোহনা হতে জ্ঞানের মোহনায় পৌঁছাতে পারে।

দান পারামী অনুশীলনের দ্বারা একজন মানুষ স্বার্থপরতা হতে মুক্তি লাভ করতে পারে; শীল অনুশীলনের দ্বারা মানুষের সম্যক মননশীলতা রক্ষা করা যায় এবং অন্যের জন্যেও স্বস্তিদায়ক হয়; বীর্য পারামী অনুশীলনের দ্বারা মনের ভীতি এবং

রাগভাব নিয়ন্ত্রণ করা যায়; ক্ষান্তি পারামীর অনুশীলন মানুষকে অধ্যবসায়ী ও বিশ্বস্ত হতে সাহায্য করে; সমাধি অনুশীলনের দ্বারা অস্হিতিশীল ও দুরন্ত মনকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়; এবং প্রজ্ঞা অনুশীলনে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও দ্বিধাগ্রস্ত মনকে একটি সুস্পষ্ট ও গভীর জ্ঞানজগতে পরিবর্তন করা যায়।

দান দেয়া ও শীল প্রতিপালন করা মানে একটি প্রাসাদ তৈরী করার প্রয়োজনীয় ভিত গড়ে তোলা। বীর্য ও ক্ষান্তি হলো প্রাসাদের দেয়াল স্বরূপ, যা বাহিরের শত্রু হতে প্রাসাদকে রক্ষা করে। সমাধি ও প্রজ্ঞা হলো, ব্যক্তিগত বর্ম, যা কোন ব্যক্তিকে জীবন ও মরণের আকস্মিক আঘাত থেকে রক্ষা করে।

যদি কোন ব্যক্তি তার সুবিধাজনক সময়েই শুধু দান দিয়ে থাকে, বা দান না দেয়ার চেয়ে দেয়াটা সহজ, একেও অবশ্য দান বলা যায় কিন্তু এটাকে সত্যিকার অর্থে দান বলা যায় না। কারো অনুরোধের পূর্বেই সত্যিকার অর্থের দান করুণাভরা অন্তরের দ্বারা সম্পাদন করা হয়, এবং সত্যিকারের দান হলো, যা সময়ে সময়ে নয় বরং প্রতিনিয়ত সম্পাদন করা হয়।

দান কাজটি করার পর, যদি অনুশোচনা বা অহংকারমূলক কোন অনুভূতি নিজের মনে উৎপন্ন হয়, তবে তাকে কখনো সত্যিকার অর্থে দান বলা যাবে না। সত্যিকার অর্থে দান হলো তাই, যা আনন্দের সাথে প্রদান করা হয়, নিজেকে দাতারূপে মনে না করে, কে গ্রহীতা, বা কি দান করা হচ্ছে ইত্যাদি চিন্তা না করে সম্পাদন করা।

সত্যিকার অর্থে দান হলো, যা নিজের অকৃত্রিম করুণাময় হৃদয় হতে উৎপন্ন হয়, যা কোন প্রকার প্রতিদানের প্রত্যাশা ছাড়াই স্বতস্ফুর্তভাবে উৎসারিত হয়, এবং যার মাধ্যমে জ্ঞানের জগতে প্রবেশের ইচ্ছা থাকে।

সাত প্রকারের দান রয়েছে, যা সাধারণ মানুষেরা অনুশীলন করতে পারে। এর প্রথমটি হলো, শারীরিক দান। ইহার অর্থ হলো শারীরিক শ্রম দান করা। এ ধরনের দানের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট দান হলো, নিজের জীবনকে দান করে দেয়া। দ্বিতীয়টি হলো, আধ্যাত্মিক দান। তাহলো, নিজের করুণাভরা অন্তরের মাধ্যমে অন্যকে

সাহায্য করা। তৃতীয়টি হলো, চক্ষু যুগল দান করা। এইটি হলো, নিজের দৃষ্টি শক্তি অন্যকে দান করা যা তাদের মানসিক প্রশান্তি এনে দেবে। চতুর্থটি হলো, সম্মতি দান করা। ইহা হলো অন্যের সৎকাজের প্রতি আনন্দোজ্জ্বল ও কোমল মনে সম্মতি জ্ঞাপন বা সমর্থন দেয়া। পঞ্চমটি হলো, বাক্য দান। তাহলো নিজের দয়ালু ও উষ্ণ-উৎফুল্ল কথাবার্তার মাধ্যমে অন্যকে সাহায্য করা। ষষ্ঠটি হলো, আসন প্রদান করা। এর অর্থ হলো, নিজের বসার আসন অপরকে প্রদান করা। সপ্তমটি হলো, আশ্রয় দান করা। তাহলো, অন্যকে নিজের আবাস স্হলে রাত্রি যাপন করতে সুযোগ দেয়া। উপরোক্ত দানগুলো যে কোন কেহ প্রতিদিন তার ব্যবহারিক জীবনে অনুশীলন করতে পারে।

৮। একদা এক রাজ্যে সত্ত্বা নামের এক রাজকুমার বাস করতেন। একদিন তিনি এবং তাঁর দুই বড় ভাই একসাথে পাশের এক বনে খেলতে বের হলেন। সেখানে তাঁরা দেখলেন, একটি ক্ষুধার্ত বাঘিনী তার গর্ভজাত সাত বাচ্চাকে ক্ষুধা নিবারণের জন্য খেতে উদ্যত হলো।

তাঁর বড় দুই ভাই তা দেখে ভয়ে পালিয়ে গেলেন, কিন্তু সত্ত্বা বাঘের বাচ্চাদের জীবন রক্ষা করার জন্য বনের একটি উঁচু জায়গায় উঠে বাঘিনীর সম্মুখে নিজেকে নিক্ষেপ করলেন।

যুবরাজ স্বতঃস্ফুর্ততার সাথে এ দান কাজটি সম্পাদন করলেন, এবং তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন ঃ "এ দেহ পরিবর্তনশীল, স্হায়ী নয়; আমি এ দেহকে ভালবাসতাম ঠিকই কিন্তু একে কোথাও নিক্ষেপ করতেও আমি কুন্ঠিত নই, এখন আমি এ দেহ বাঘিনীকে দান করবো এবং জ্ঞানের অধিকারী হবো।" এ চিন্তার মাধ্যমে যুবরাজ সত্ত্বার জ্ঞান উপলব্ধি করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে।

৯। জ্ঞান অনুসন্ধানীদের উচিৎ মনের চারটি শ্রেষ্ট অবস্হাকে অনুশীলন করা। এগুলো হলো, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা। যদি কেহ মৈত্রীর অনুশীলন করে, তাহলে সে লোভ থেকে মুক্ত হতে পারে; করুণা অনুশীলনের দ্বারা দ্বেষ থেকে; মুদিতা অনুশীলনের দ্বারা দুঃখ থেকে এবং পরিশেষে উপেক্ষা অনুশীলনের দ্বারা শত্রু

ও বন্ধুদের মধ্যে বৈষম্যতামূলক অভ্যাস হতে মুক্ত হওয়া যায়।

মহামৈত্রী মানুষকে সুখী ও পরিতৃপ্তি দান করে। যা মানুষকে লাভ করতে দেয়না, তা নির্মুল করতে মহাকরুণা সহযোগিতা করে। মহামুদিতা প্রত্যেক মানুষকে সুখী ও মানসিক আনন্দে তৃপ্ত রাখে। যখন প্রত্যেকে খুশী ও মানসিক পরম শান্তি এবং আনন্দে অবস্হান করে, তখন একে অপরের প্রতি মহাউপেক্ষা বা সমতাভাব অনুভব করতে পারে।

কেউ যদি যত্ন সহকারে মনের এই চারি মহা অবস্হাকে অনুশীলন করতে পারে, তাহলে তারা লোভ, দ্বেষ, মোহ, দুঃখ এবং ভালবাসা-ঘৃণা প্রভৃতি থেকে মুক্ত হতে পারে, যদিও তা সহজ কাজ নয়। মন থেকে অকুশল কর্মকে তাড়ানো খুবই কঠিন, যা শিকারী কুকুরের ন্যায়। অন্যদিকে কুশল কর্মকে তাড়ানো খুবই সহজ, যা বনের হরিণের ন্যায়। অথবা মন থেকে অকুশল কর্মকে মুছে ফেলা খুবই কঠিন, যা পাথরের মধ্যে খোদাই করা অক্ষরের ন্যায়। অন্যদিকে মন থেকে কুশল কর্মকে মুছে ফেলা খুবই সহজ, যা জলে লিখা অক্ষরের ন্যায়। বস্তুতপক্ষে, জীবনের সবচেয়ে কঠিন কাজ হলো নিজেকে জ্ঞান অর্জনের জন্য তৈরী করা।

১০। এক গ্রামে কোন এক ধনী পরিবারে স্মরণ নামের এক যুবক জন্ম গ্রহণ করে। তার শরীরটি ছিল খুবই কোমল। সে জ্ঞান অর্জনের জন্য খুবই আন্তরিক ছিল, এবং পরবর্তীতে বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলো। জ্ঞান অর্জনের জন্য সে এতবেশী পরিশ্রম করেছিল যে, এতে তার পা দিয়ে রক্তক্ষরণ শুরু হলো।

বুদ্ধ দয়াপরবশ হয়ে তাকে একদিন জিজ্ঞাসা করলেন যে, "হে বালক স্মরণ! তুমি কি তোমার বাড়ীতে কখনও বীণা বাজানো শিক্ষা করেছিলে? তুমি জান কি বীণা সুর সৃষ্টি করতে পারে না, যদি এর তারগুলোর বিন্যাস শক্ত বা ঢিলা হয়। ইহা তখনই সুর সৃষ্টি করে, যখন এর তারগুলো সঠিক বিন্যাসে বাধা হয়।"

"জ্ঞান অর্জনের প্রশিক্ষণ বাদ্যযন্ত্রের তারের সমন্বয়ের মতো। কেউ জ্ঞান অর্জন করতে পারে না, যদি তাদের মনের তারের বিন্যাসগুলো খুবই ঢিলা বা শক্ত হয়।

জ্ঞান অর্জন করতে হলে, অবশ্যই বিবেচনা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে কাজ করতে হবে।"

স্মরণ এ কথাগুলোকে খুবই মূল্যবান ভেবেছিল এবং অবশেষে সে যা চেয়েছিল তা লাভ করেছিল।

১১। একদা এক রাজ্যে এক যুবরাজ বাস করতেন, যিনি পাঁচ প্রকার অস্ত্রচালনায় দক্ষ ছিলেন। একদিন তিনি অনুশীলন শেষে, রাজপ্রাসাদে ফেরার পথে, এক বিকৃত গঠনের জীবের দেখা পেলেন যার চামড়া ছিল দুর্ভেদ্য।

জীবটি তাঁর দিকে এগিয়ে আসল, কিন্তু তা যুবরাজকে সন্ত্রস্ত করতে পারলো না। তিনি তার দিকে তীর নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু ঐ তীর জীবটিকে কোন আঘাত করতে পারলো না। এরপর তিনি পুনঃ তীর নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু তার মোটা চামড়া ভেদ করতে পারলো না। এরপর তিনি ডান্ডা ও বল্লম নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু এগুলোও জীবটিকে আঘাত করতে পারলো না। অতঃপর তিনি তাঁর তলোয়ার ব্যবহার করলেন, কিন্তু তা ভেঙ্গে গেল। যুবরাজ এরপর ঘুষি ও লাথি মারলেন, কিন্তু কোন কাজ হলো না। অবশেষে, জীবটি যুবরাজকে তার বিশাল বাহুতে জোরে জাপটে ধরল এবং ঝাঁকরাতে লাগল। যুবরাজ শেষ পর্যন্ত তাঁর মাথাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করলেন, কিন্তু এতেও ব্যর্থ হলেন।

জীবটি বললো, "আমাকে বাধা দেয়া অর্থহীন; আমি তোমাকে গিলে খেতে যাচ্ছি।" কিন্তু যুবরাজ প্রত্যুত্তরে বললেন, " তুমি হয়তো ভাবতে পারো আমি আমার সব অস্ত্র ব্যবহার করেছি এবং আমি অসহায়, কিন্তু আমার এখনও একটি অস্ত্র বাকী রয়ে গেছে। যদি তুমি আমাকে গিলে ফেল, তাহলে আমি তোমার পাকস্হলীর ভেতর থেকে তোমাকে ধ্বংস করবো।"

যুবরাজের সাহস জীবটিকে বিস্মিত করল এবং সে জিজ্ঞাসা করলো, "তুমি কিভাবে তা করবে ?" যুবরাজ প্রত্যুত্তরে বললেন, "সত্যের শক্তি দিয়ে।"

সফলতা অর্জনের ব্যবহারিক পদ্ধতি

এরপর, জীবটি তাঁকে মুক্ত করে দিল এবং সত্যের পথে এগুনোর জন্যে তাঁর নির্দেশনা প্রার্থনা করলো।

এ কাহিনীর শিক্ষা হলো, শিষ্যদেরকে তাদের প্রচেষ্টার প্রতি অধ্যবসায়ী হতে উৎসাহিত করা এবং বিভিন্ন প্রতিকূলতার মুখে নিজেকে স্হিতিশীল অবস্হায় ধরে রাখা।

১২। ঘৃণ্য আত্ম-অহংকার এবং পাপে লজ্জাহীনতা উভয়েই মানব সমাজকে ধ্বংস করে দেয়। কিন্তু আত্ম-সম্মান ও পাপে লজ্জা, মানব সমাজকে রক্ষা করে। লোকেরা তাদের পিতা-মাতা, বয়োজৈষ্ঠ্য ও ভাই-বোনদেরকে সম্মান করে। কারণ তারা আত্ম-সম্মান ও পাপে লজ্জার প্রতি সংবেদনশীল। আত্ম পর্যালোচনার পর নিজের সম্মান ধরে রাখা এবং অন্য লোকদেরকে দেখে পাপে লজ্জিত হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

যদি কোন লোক পাপের প্রতি অনুতাপ চেতনা পোষণ করে, তাহলে এতে তার পাপ একদিন মোচন হয়ে যায়। কিন্তু যদি সে অনুতপ্ত না হয়, তাহলে তার পাপ চলতেই থাকে এবং তাকে চিরকালের জন্য এই পাপ অভ্যাস আচ্ছন্ন করে রাখবে।

কেবল মাত্র এসব ব্যক্তিই উপরোক্ত শিক্ষা দ্বারা লাভবান হয়, যারা সঠিকভাবে এই সম্যক শিক্ষা সম্পর্কে শুনে, এবং এর প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে পারে।

যদি কোন লোক কেবল মাত্র সত্যিকার শিক্ষা শুনে, কিন্তু ধারণ করে না, জ্ঞান অনুসন্ধানে সে ব্যর্থ হয়।

যারা জ্ঞানের অনুসন্ধানী তাদের কাছে বিশ্বাস, বিনয়, নিরহংকার, উদ্যম এবং প্রজ্ঞা বিপুল শক্তির উৎস স্বরূপ। এগুলোর মধ্যে প্রজ্ঞা হলো সর্বোত্তম এবং অন্যগুলোকে এর অপরিহার্য অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়। যদি কোন লোক প্রশিক্ষণকালে জাগতিক বিষয়াদির প্রতি মোহগ্রস্ত হয়, নিরর্থক বাক্যালাপে মত্ত হয়, বা ঘুমে অবচেতন হয়ে পড়ে; তাহলে সে জ্ঞান অনুসন্ধানের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে।

১৩। জ্ঞান লাভের অনুশীলনে কেহ কেহ অন্যদের চাইতে দ্রুত সফল হতে পারে। সুতরাং অন্যদের এগিয়ে যাওয়া দেখে কারো নিরুৎসাহিত হয়ে পড়া উচিৎ নয়।

যখন একজন লোক ধনুবিদ্যার প্রশিক্ষণ নেয়, তখন অতিদ্রুত সফলতার প্রত্যাশা করা উচিৎ নয়। কিন্তু তার জানা উচিৎ, যদি সে ধৈর্য্য ধরে প্রশিক্ষণ চালিয়ে যায়, তাহলে ক্রমান্বয়ে তার বিদ্যা অর্জন নির্ভুল হবে। একটি নদী স্রোতস্বিনী হিসেবে যাত্রা শুরু করে, কিন্তু যখন ইহা সাগরে পতিত হয়, তখন ইহা বিরাট আকার ধারণ করে।

উপরোক্ত উদাহরণের ন্যায়, যদি কোন লোক ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সাথে প্রশিক্ষণে নিয়োজিত থাকে, তবে সে অবশ্যই জ্ঞান অর্জন করতে পারবে।

পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যদি কেহ তার চক্ষু যুগল খোলা রাখে, তাহলে সর্বত্র সে শিক্ষা গ্রহণের উপাদান খুঁজে পাবে। যার ফলে তার জ্ঞান অর্জনের সুযোগ হবে সীমাহীন।

একদা কোন এক গ্রামে এক লোক ছিল, যে সবসময় ধূপ প্রজ্জ্বলিত করতো। সে লক্ষ্য করলো যে, ধূপের কোন সুঘ্রাণ আসছেও না, আবার যাচ্ছেও না। সুঘ্রাণকে আছেও বলা যাচ্ছে না, আবার নাইও বলা যাচ্ছে না। এ সামান্য ঘটনা তাকে জ্ঞান অর্জনের দিকে নিয়ে গিয়েছিল।

একদা এক ব্যক্তি তার পায়ে কাটা বিঁধে আঘাত পেল। সে এতে তীক্ষ্ণ ব্যথা অনুভব করল এবং তার মাথায় হঠাৎ একটি চিন্তা এসেছিল যে, এই ব্যথা মনের প্রতিক্রিয়া মাত্র। এই ঘটনার পর সে এরূপ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হলো যে, যদি নিজে নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে, তাহলে তা আয়ত্তের বাহিরে চলে যেতে পারে। আবার যদি কেহ মনকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে, তাহলে তা বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়। এই চিন্তা হতে কিছু দিন পরে, জ্ঞান অর্জন তার কাছে সহজ হয়ে দেখা দেয়।

সফলতা অর্জনের ব্যবহারিক পদ্ধতি

এক স্থানে অন্য এক লোভী লোক বাস করত। একদিন সে তার লোভী মনকে নিয়ে ভাবছিল এবং সে বুঝতে পারছিল যে লোভমূলক চিন্তা এবং এর কারণগুলো তাকে প্রজ্ঞার আগুনে জ্বালিয়ে দিতে পারে বা নিঃশেষ করে ফেলতে পারে। তার এই বোধশক্তি ছিল জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রথম স্তর।

পুরনো একটি প্রবাদে আছে, "তোমার মনকে স্হিতিশীল অবস্হায় রাখো। যদি মনকে স্হিতিশীল অবস্হায় রাখা যায়, তাহলে সমগ্র পৃথিবীকেও স্হির বলে মনে হবে।" এই কথাটি বিবেচনা করলে এটাই বুঝা যায় যে, এই পৃথিবীতে যত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তা মানসিক বৈষম্যগত কারণেই ঘটে থাকে। এই বাক্যগুলোর মধ্যে জ্ঞান লাভের পথ নির্দেশিকা নিহিত রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, জ্ঞান অর্জন একটি মাত্র পথের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়।

৩

বিশ্বাসের পথ

১। যে বা যারা বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ এই মহারত্নত্রয়ের স্মরণ গ্রহণ করে, তাদেরকে বুদ্ধের অনুসারী হিসেবে অভিহিত করা যায়। মনের স্হিতিশীলতার জন্য বুদ্ধের অনুসারীরা শীল, শ্রদ্ধা, দান ও প্রজ্ঞা এই চারি প্রকার পথ অনুশীলন করে থাকে।

বুদ্ধের অনুসারীরা পঞ্চশীল অনুশীলন করে। এগুলো হল, প্রাণী হত্যা হতে বিরত থাকা, চুরি করা থেকে বিরত থাকা, ব্যভিচার হতে বিরত থাকা, মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকা এবং যে কোন ধরনের নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবনে বিরত থাকা।

বুদ্ধের অনুসারীরা তাঁর সর্বজ্ঞতাজ্ঞানকে বিশ্বাস করে। তারা তাদের মনকে লোভ ও স্বার্থপরতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে সচেষ্ট হয় এবং দান কার্য সম্পাদন করে। তারা কার্য-কারণ নিয়ম সম্পর্কে বুঝে, এবং তারা এও জানে জ্ঞানের মানদন্ডে জীবনের উপস্হিতি ক্ষণস্হায়ী।

সফলতা অর্জনের ব্যবহারিক পদ্ধতি

একটি বৃক্ষ যদি পূর্বদিকে হেলে থাকে, স্বাভাবিকভাবে এর পতনও হবে পূর্বদিকে। তাই, যারা বুদ্ধের শিক্ষা শ্রবণ করে এবং এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, তারাও অবশ্যই বুদ্ধের পবিত্র ভূমিতে (শুদ্ধাবাস) জন্মগ্রহণ করবে।

২। ইহা যথাযথভাবে বলা যায়, বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ এ ত্রিরত্নকে যারা বিশ্বাস করে, তাদেরকে বুদ্ধের অনুসারী বলা যায়।

বুদ্ধ হলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি সর্বজ্ঞতাজ্ঞান অর্জন করেছেন এবং এ অর্জনকে মানবতার বন্ধনমুক্তি ও হিতে ব্যবহার করেছেন। ধর্ম হলো সত্য, যা বুদ্ধের প্রকৃত স্বরূপ বা শিক্ষা, যা তিনি প্রচার করে গেছেন। সংঘ হলো, বুদ্ধ ও ধর্মে বিশ্বাসীদের প্রকৃত ভ্রাতৃসমাজ।

আমরা বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘ সম্পর্কে আলোচনা করি, যেহেতু তাঁরা তিনটি রত্ন। কিন্তু আসলে তাঁরা এক ও অভিন্ন। বুদ্ধ তাঁর প্রবর্তিত ধর্মে প্রকাশিত হয়; আবার ধর্ম সংঘের মাধ্যমে প্রতিপালিত হয়। সুতরাং, ধর্মে বিশ্বাস এবং সংঘকে রক্ষা করার মাধ্যমে বুদ্ধের প্রতি বিশ্বাসকেই প্রকাশ করে। আবার বুদ্ধের প্রতি বিশ্বাস মানে ধর্মের প্রতি বিশ্বাস এবং সংঘের প্রতি বিশ্বাসকেই বুঝায়।

অতএব, মানুষেরা মুক্তিলাভের জন্য এবং জ্ঞান অর্জনের জন্য শুধু বুদ্ধের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেই হয়। বুদ্ধ হলেন একজন সর্বজ্ঞ, যিনি এ পৃথিবীর সবাইকে আপন সন্তানের মতো ভালবাসেন। তাই, যদি কেহ বুদ্ধকে তার পিতার মতো ভাবতে পারে, তখন সে নিজেকে নিজে বুদ্ধের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে দেখতে পায় এবং জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হয়।

পরিশেষে, যারা বুদ্ধকে এভাবে মনে করে, বুদ্ধ তাঁর জ্ঞানের মাধ্যমে এবং তাঁর আশীর্বাদের মাধ্যমে তাদেরকে সহযোগিতা করেন।

৩। এ পৃথিবীতে বুদ্ধের প্রতি বিশ্বাস ছাড়া, কোন কিছুই এত সফলতা বয়ে

আনতে পারে না। কেবল বুদ্ধের নাম স্মরণ, তাঁর প্রতি বিশ্বাস এবং তাঁর প্রতি সন্তুষ্টির দ্বারা মুহূর্তের মধ্যেই, অতুলনীয় লাভবান হওয়া যায়।

সুতরাং, এ পৃথিবীর অগ্নি প্রাজ্বলতার ভিতর বাস করেও সবারই উচিৎ বুদ্ধ অনুসৃত পথ অনুসন্ধানের মাধ্যমে নিজেকে সন্তুষ্ট রাখা।

এমন কোন শিক্ষকের দর্শন পাওয়া বড়ই কঠিন, যিনি ধর্ম সম্পর্কে সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারেন। এর চেয়েও কঠিন বুদ্ধের দর্শন লাভ করা; কিন্তু সবচেয়ে কঠিন তাঁর শিক্ষার প্রতি বিশ্বাস স্হাপন করা।

অতএব, এখন তোমরা বুদ্ধের দর্শন পেয়েছো, যাঁর সাথে সাক্ষাৎ করা কঠিন, তোমাদেরকে তাঁর সম্পর্কে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে, যা শ্রবণ করা কঠিন, তোমাদের তাতে আনন্দ লাভ এবং বিশ্বাস স্হাপন করা উচিৎ; পাশাপাশি বুদ্ধের প্রতিও বিশ্বাস স্হাপন করা উচিৎ।

৪। মানব জীবনের দীর্ঘ পরিক্রমায় বিশ্বাস হলো সর্বোত্তম সাথী। ইহা ভ্রমণে সর্বোত্তম সজীবতা প্রদান করে; এবং ইহা সর্বাপেক্ষা নিরাপদ সম্পদ।

বিশ্বাস হলো হাত সদৃশ যা ধর্মকে গ্রহণ করে। ইহা হলো বিশুদ্ধ হাত যা সকল গুণাবলী ধারণ করে। বিশ্বাস হলো আগুন যা সকল জাগতিক মোহকে গিলে ফেলে। ইহা বোঝাকে সরিয়ে দেয় এবং মানুষকে পথ নির্দেশনা দিয়ে থাকে।

বিশ্বাস লোভ, ভয় ও অহংকারকে দূরীভূত করে। ইহা সঠিক আচরণ এবং অন্যকে সম্মান করতে শিক্ষা দিয়ে থাকে। ইহা মানুষকে পরিস্হিতির নানা বন্ধন হতে মুক্ত করে। ইহা কঠিনতার মোকাবেলা করার সাহস জোগায় এবং প্রলোভন এড়ানোর ক্ষমতা প্রদান করে। ইহা কারো কাজকে বিশুদ্ধ ও উজ্জ্বল রাখতে সক্ষম করে তোলে এবং ইহা মনকে জ্ঞান দ্বারা সমৃদ্ধ করে।

বিশ্বাস হলো উৎসাহ প্রদানের ন্যায়। যখন কারো জীবন দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর হয়ে

পড়ে, বিশ্বাস তখন তাকে জ্ঞানের দিকে ধাবিত করে।

বিশ্বাস আমাদেরকে এটাই অনুভব করতে শিক্ষা দেয় যে, আমরা বুদ্ধের উপস্থিতির মাঝে অবস্থান করছি এবং ইহা আমাদেরকে বুদ্ধের কাছে নিয়ে যাবে, যেখানে আমরা তাঁর দ্বারা উপকৃত হবো। বিশ্বাস আমাদের কঠোর ও স্বার্থপর মনকে কোমল করে এবং ইহা আমাদের মধ্যে অপরের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন চেতনা সৃষ্টি করে দিয়ে সহানুভূতিকে বুঝতে সাহায্য করে।

৫। বুদ্ধের প্রতি যাদের বিশ্বাস আছে, তারা জ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধের শিক্ষাকে যেভাবে শ্রবণ করে, ঠিক সেভাবে বুঝতে সক্ষম হয়। যাদের বিশ্বাস আছে, তারা জ্ঞান অর্জন করে এবং সব কিছু দর্শন করতে সক্ষম হয়, যা কার্য-কারণ নিয়মানুসারে উৎপন্ন হয়। বিশ্বাস তাদের ধৈর্য্যের সাথে যে কোন কিছু গ্রহণ করার এবং শান্তভাবে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার সহযোগিতা প্রদান করে।

বিশ্বাস তাদের জীবনের ক্ষণস্থায়ীতাকে বুঝার জ্ঞান দান করে এবং আশীর্বাদ প্রদান করে, যাতে জীবনের চলার পথে যাই মোকাবেলা করতে হউক না কেন, তাতে যেন বিস্মিত বা দুঃখ উপলব্ধি করতে না হয়। অতএব, বিশ্বাস ইহাও শিক্ষা দেয় যে, পরিস্থিতি এবং বাহ্যিক অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে; কিন্তু জীবন সত্য সর্বদা অপরিবর্তিত থাকে।

বিশ্বাসের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা বিদ্যমান; যা হলো-অনুশোচনা, অন্যের গুনের প্রতি সত্যিকার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা এবং কৃতজ্ঞতা চিত্তে বুদ্ধের উপস্থিতিকে গ্রহণ করা।

মানুষের উচিৎ বিশ্বাসের এ উপাদানগুলোকে অনুশীলন করা। তারা তাদের ব্যর্থতা ও অবিশুদ্ধিতার প্রতি সংবেদনশীল হওয়া উচিৎ। এজন্য তাদেরকে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া উচিৎ। তাদের মুক্ত মনে অন্যের ভাল আচরণ ও ভাল কাজের স্বীকৃতি দানের অনুশীলন এবং এজন্য তাদের প্রশংসা করা উচিৎ। তাদেরকে স্বাভাবিকভাবে বুদ্ধের সাথে কাজ করা ও বুদ্ধের সাথে বাস করা উচিৎ।

সফলতা অর্জনের ব্যবহারিক পদ্ধতি

বিশ্বাসের অর্থ হচ্ছে মনের সততা। ইহা হলো একটি গভীর মন। আন্তরিকভাবে আনন্দিত মন বুদ্ধের করুণার দ্বারা পবিত্র বুদ্ধভূমির দিকে এগিয়ে যায়।

সুতরাং, বুদ্ধ বিশ্বাসকে তাই এত বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। বিশ্বাসের মাধ্যমে মানুষেরা তাঁর পবিত্র ভূমিতে এগিয়ে যেতে পারে। বিশ্বাসের শক্তি মানুষকে পবিত্র করে তুলতে পারে। এ শক্তি মানুষকে আত্ন-অহংকারবোধ থেকে রক্ষা করতে পারে। এমনকি, যদি তারা সারা পৃথিবীতে বুদ্ধের নামের প্রশংসা শুনে ক্ষণিকের জন্যও তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্হাপন করে, তা তাদেরকে বুদ্ধের পবিত্র ভূমির (শুদ্ধাবাস) দিকে পরিচালনা করে।

৬। বিশ্বাস এমন কোন জিনিষ নয়, যা বৈষয়িক মনের সাথে একত্রিত হয়ে যায়। ইহা হলো, বুদ্ধ প্রকৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার জন্য মনের একটি সুস্পষ্ট ধারণা। যে বুদ্ধকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে, সে নিজেই বুদ্ধ। বুদ্ধের প্রতি যার বিশ্বাস আছে, সে নিজেই একজন বুদ্ধ।

কিন্তু নিজের ভিতরে যে বুদ্ধাঙ্কুর নিহিত আছে, তা উন্মোচন বা পুনরুদ্ধার করা খুবই কঠিন। লোভ, দ্বেষ ও বৈষয়িক মোহের দ্রুত উত্থান পতনের এ পৃথিবীতে, একটি বিশুদ্ধ মন রক্ষা করা খুবই কঠিন কাজ। যদিও বিশ্বাস মানুষকে তা জয় করতে সমর্থবান করে তোলে।

বিষময় (অনুর্বর) বনের মধ্যে এরান্ডা গাছেরই জন্মানোর সুযোগ থাকে, কিন্তু সুগন্ধীযুক্ত চন্দন গাছ জন্মানোর কোন সুযোগ থাকে না। ইহা সত্যিই আশ্চর্য্য ঘটনা, যদি এরান্ডা বনের মধ্যে চন্দন গাছ জন্মায়। অনুরূপভাবে, ইহাও আশ্চর্য্যজনক ঘটনা যে, মানুষের হৃদয়ে বুদ্ধের প্রতি বিশ্বাস জন্মানো।

অতএব, বুদ্ধের প্রতি বিশ্বাসকে "শেকড়বিহীন" বিশ্বাস বলা যায়। এর অর্থ হলো, বিশ্বাসের কোন শেকড় নেই, যা মানুষের মনের মধ্যে জন্মাবে। কিন্তু এর শেকড় করুণাঘন বুদ্ধের মনে জন্মাতে পারে।

৭। তাই বিশ্বাস হলো, ফলপ্রদ ও পরিশুদ্ধ। কিন্তু অলস মস্তিষ্কে বিশ্বাস জাগ্রত করা খুবই কঠিন। বিশেষতঃ, পাঁচ প্রকারের সন্দেহ মানুষের মনের অন্তরালে ওঁত পেতে থাকে এবং বিশ্বাসকে নিরুৎসাহিত করে।

প্রথমতঃ, বুদ্ধত্বজ্ঞানের প্রতি সন্দেহ; দ্বিতীয়তঃ, বুদ্ধের শিক্ষার প্রতি সন্দেহ; তৃতীয়তঃ, বুদ্ধের শিক্ষাকে যাঁরা ব্যাখ্যা করেন তাদের প্রতি সন্দেহ; চতুর্থতঃ, আর্য মার্গ সম্পর্কে বর্ণিত পথ ও পদ্ধতি সঠিক কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ; এবং পরিশেষে, এরূপ কিছু উগ্র ও অধৈর্য্য মানসিকতার লোক আছে, যারা বুদ্ধের শিক্ষাকে বুঝতে ও অনুসরণ করতে সক্ষম, সেই লোকদের আন্তরিকতার প্রতি সন্দেহ পোষণ করে।

বস্তুতপক্ষে, সন্দেহের চেয়ে ভয়ঙ্কর আর কিছুই নেই। সন্দেহ মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে। ইহা এমন এক ধরনের বিষ, যা বন্ধুত্ব ছিন্ন করায় এবং সুসম্পর্কে ভাঙ্গন ধরায়। ইহা কাঁটার মতো, যা বিদ্ধ করে এবং বেদনা সৃষ্টি করে। ইহা হলো তলোয়ার যা মানুষকে হত্যা করে।

বিশ্বাসের শুরু অনেক অনেক পূর্বে, যা করুণাঘন বুদ্ধ দ্বারা অনুশীলন করা হয়েছিল। যখন কারো মনে বিশ্বাস জন্ম নেয়, তখন সে সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে এবং বুদ্ধের প্রতি তাঁর কুশল কাজের জন্য কৃতজ্ঞ থাকে।

কারো এটা ভুলে যাওয়া উচিৎ নয় যে, তার নিজস্ব সংবেদনশীলতার কারণেই মনে বিশ্বাস জাগ্রত হয়েছে। অনেক বছর পূর্বে বুদ্ধের করুণা মানুষের মনকে বিশ্বাসের পবিত্র আলোকে আলোকিত করেছিল; এবং এর দ্বারা তাদের মনের অজ্ঞতার অন্ধকার দুরীভূত হয়েছিল। বর্তমানে যে বিশ্বাস মানুষেরা প্রকাশ করছে, তা মূলতঃ ঐতিহ্যগতভাবে তাদের মনে লুকায়িত ছিল।

এমনকি সাধারণ জীবন যাপনকারী একজন ব্যক্তিও বুদ্ধ নির্দেশিত পবিত্র ভূমিতে জন্মগ্রহণ করতে পারে, যদি সে বুদ্ধের অনুসৃত দীর্ঘ চলমান করুণার পথকে অনুসরণ করে, তার মনে বিশ্বাসকে জাগ্রত করতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে, এ পৃথিবীতে মানুষ হিসেবে জন্ম নেয়া খুবই কঠিন। ধর্ম শ্রবণ করাও কঠিন; বিশ্বাসকে জাগ্রত করা এরচেয়েও কঠিন; অতএব, প্রত্যেকের উচিৎ বুদ্ধের ধর্মশিক্ষা শ্রবণে সর্বোচ্চ সচেষ্ট হওয়া।

৪
বুদ্ধের বানী

১। "সে আমাকে কটুক্তি করেছে, সে আমাকে অবজ্ঞা করেছে, সে আমাকে আঘাত করেছে।" অতএব, কেহ যদি এভাবে চিন্তা করতে থাকে এবং কেহ যদি এ ধারণা দীর্ঘদিন দরে মনে ধরে রাখে, তাহলে তার রাগ অবিরত চলতে থাকবে।

মনে যতক্ষণ পর্যন্ত অপমানের জ্বালা থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত রাগ দূরীভূত হবে না। অপমান বোধের জ্বালা ভুলে গেলেই রাগ দূরীভূত হয়।

যদি বাড়ীর ছাদ ভালভাবে তৈরী করা না হয়, বা মেরামত করা না হয়, তাহলে বাড়ীর ভেতর ছিদ্র দিয়ে বৃষ্টির পানি ঢুকবে। সঠিকভাবে অনুশীলন না করলে এবং মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে, লোভ ঢুকে পড়বে।

অলসতা হলো মৃত্যুর পথে অগ্রসর হওয়ার সংক্ষিপ্ত পথ। আর অধ্যবসায়ী মানে জীবিত থাকার জন্য একটি সহজ পথ। বোকা লোকেরা অলস, কিন্তু জ্ঞানী লোকেরা হলো অধ্যবসায়ী।

একজন তীর প্রস্তুতকারী তার তীরকে সোজা করে তৈরী করতে চেষ্টা করে। তদ্রুপ, একজন জ্ঞানী ব্যক্তিও তার মনকে সোজা করে তৈরী করতে সচেষ্ট থাকে।

একটি বিচ্ছিন্ন চিন্তার চঞ্চল মন সর্বদা ক্রিয়াশীল, এদিক ওদিক লাফালাফি করে। একে নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কঠিন। কিন্তু একটি শান্ত মন সর্বদা শান্তিপুর্ণভাবে অবস্হান

করে। সুতরাং, মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখা জ্ঞানীর কাজ।

কোন শত্রু বা প্রতিপক্ষ নয়, মানুষের নিজের মনই নিজেকে খারাপ পথের দিকে প্রলুব্ধ করে।

যে লোক তার নিজের মনকে লোভ, দ্বেষ ও মোহ থেকে রক্ষা করতে পারে, সে লোকই প্রকৃত এবং চিরস্থায়ী শান্তি লাভ করতে পারে।

২। অনুশীলন ছাড়া সুমধুর বাক্যালাপ সুগন্ধবিহীন সুন্দর ফুলের ন্যায়।

ফুলের সুগন্ধী বাতাসের প্রতিকুলতায় প্রবাহিত হতে পারে না; কিন্তু সৎ লোকের সৎ গুণাবলীর সুঘ্রাণ এ পৃথিবীর যে কোন প্রবল বাতাসের অনুকুলে ও প্রতিকুলে পর্যন্ত গমন করে।

একজন বিনিদ্রিত লোকের কাছে রাত্রিকে খুবই দীর্ঘ মনে হয় এবং একজন ক্লান্ত ভ্রমণকারীর নিকট তার যাত্রাকে দীর্ঘ মনে হয়। তেমনি, যে ব্যক্তি সঠিক শিক্ষা সম্পর্কে অবগত নয়, মোহ ও দুঃখকে তার কাছে স্থায়ী বলে মনে হয়।

ভ্রমণে গেলে একজন ভ্রমণকারীর উচিৎ সমমানসিকতার বা ভাল মনের একজন সাথীর সাহচর্য নেয়া। বোকা লোকের সাথে ভ্রমণের চেয়ে একা ভ্রমণ করা শ্রেয়।

একজন অবিশ্বস্ত এবং খারাপ বন্ধু হিংস্র বন্য প্রাণী থেকেও ভয়ঙ্কর। একটি হিংস্র প্রাণী মানুষের দেহকে আক্রান্ত করবে, কিন্তু একজন খারাপ লোক মানুষের মনকে আক্রান্ত করবে।

অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত একজন লোক নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত কেবল এ চিন্তাই করবে যে, সে কি করে সন্তুষ্টি লাভ করবে। তাই সে ভাবে, "এটি আমার পুত্র, ইহা আমার সম্পদ।" বোকা লোকেরা এরূপ চিন্তা করে কষ্ট ভোগ করে।

সফলতা অর্জনের ব্যবহারিক পদ্ধতি

বোকা লোক নিজেকে বুদ্ধিমান হিসেবে ভাবার চেয়ে বোকা হিসেবে ভাবাটা উত্তম।

একটি চামচ যেটি খাবার বহন করে, সে কখনো খাবারের স্বাদ বুঝতে পারে না। অনুরূপভাবে, একজন বোকা লোক কখনো জ্ঞানীলোকের জ্ঞান সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারে না, যদিও সে ঐ জ্ঞানী ব্যক্তির সংস্পর্শে থাকে।

সতেজ দুধ প্রায় সময় দইয়ে পরিণত হতে সময় লাগে। অনুরূপভাবে, পাপকর্ম তাৎক্ষণিকভাবে বিপাক প্রদান করে না। পাপকর্ম অনেকটা কয়লার আগুনের ন্যায়, যা ছাইয়ের নীচে লুকায়িত অবস্হায় থাকে এবং শিখাহীনভাবে জ্বলে, যা একসময় বিকটাকারে আগুনের প্রজ্জ্বলন ঘটায়।

একজন মানুষ বোকার মত পদমর্যাদা, পদোন্নতি, লাভ, বা সম্মানের আকাংখায় থাকে। এরূপ আকাংখা কোনভাবেই সুখ বয়ে আনে না; বরং এর পরিবর্তে দুঃখ বয়ে আনে।

একজন ভাল বন্ধু, যে ভুলত্রুটি ও অসঙ্গতি ধরে দেয় এবং খারাপ কাজের জন্য তিরস্কার করে, সে সম্মানের যোগ্য হবে যদি এর পাশাপাশি অন্যের জন্য কিছু মূল্যবান দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে।

৩। কোন লোক যদি ভাল নির্দেশনা পেয়ে সন্তুষ্ট হয়, সে শান্তিতে ঘুমাতে পারে, কারণ তার মন এর দ্বারা পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়।

একজন কাঠ মিস্ত্রী চায় তার বিমগুলো সোজা করে তৈরী করতে। একজন তীর প্রস্তুতকারক চায় তার তৈরী তীরগুলো সম ভারসাম্যপূর্ন হউক। সেচের নালা প্রস্তুতকারী চায় তার খননকৃত নালার পানি সমগতিতে প্রবাহিত হউক। অনুরূপভাবে, জ্ঞানী লোকেরা চায় তাদের মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে, যার দ্বারা মন সুষ্ঠুভাবে এবং সঠিকভাবে কাজ করতে পারে।

সফলতা অর্জনের ব্যবহারিক পদ্ধতি

একটি বৃহৎ পাথরখন্ড বাতাস দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না; তেমনি জ্ঞানীলোকেরাও সম্মান ও তিরস্কারের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন না।

হাজার বার যুদ্ধ জয়ের চেয়ে নিজেকে জয় করা আরো অনেক বড় জয়।

সত্য ধর্ম শ্রবণ করে একদিন বেঁচে থাকা, শত বৎসর জীবিত থাকার চেয়ে উত্তম।

যারা নিজেদেরকে শ্রদ্ধা করে তাদের উচিৎ সর্বদা সচেতন থাকা, যাতে খারাপ তৃষ্ণা দ্বারা আক্রান্ত না হয়। জীবনের যে কোন সময়ে, যুবক অবস্থায়, মধ্য বয়স্ক বা বৃদ্ধ বয়সে হলেও মানুষের বিশ্বাস জাগ্রত করা উচিৎ।

পৃথিবীটা সবসময় লোভ, দ্বেষ ও মোহের আগুনে জ্বলছে; আমাদের উচিৎ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এসব বিপদজনক অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করা।

এ পৃথিবীটা জলের বুদবুদের ন্যায়, মাকড়সার জালের ন্যায়, ইহা ময়লা আঁধারে রাখা দূষিত পানির ন্যায়। আমাদের উচিৎ মনের পরিশুদ্ধিতা রক্ষা করা।

৪। যে কোন ধরনের পাপকর্ম হতে বিরত থাকা, কুশলকর্ম সম্পাদন করা, নিজের মনকে পরিশুদ্ধ অবস্থায় রাখা; ইহাই হলো বুদ্ধের শিক্ষার মূল কথা।

ধৈর্য্য হলো সবচেয়ে কঠিন কাজ। কিন্তু ধৈর্য্য যারা ধরতে পারে, শেষ পর্যন্ত বিজয় তারাই লাভ করতে পারে।

যখন কেউ ক্ষুব্ধ বা অসন্তুষ্ট অবস্থায় থাকে, তখনই তার রাগ পরিত্যাগ করা উচিৎ। কেউ যদি দুঃখের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে, তখন প্রথমেই তার মন থেকে দুঃখকে সরিয়ে ফেলা উচিৎ। কেউ যদি লোভে নিপতিত হয়, সে মুহূর্তেই তার লোভকে অপসারণের পদক্ষেপ নিতে হবে। পরিমার্জিত ও অস্বার্থপর জীবন

জীবন যাপন করে, এমন ব্যক্তি আর কিছু না হোক, প্রাচুর্যতার মধ্যে কালাতিপাত করতে পারে।

স্বাস্থ্যবান হওয়া বিরাট এক সৌভাগ্যের বিষয়। যার যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা, বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির মালিক হওয়ার চেয়েও উত্তম। নির্ভরযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হওয়া, বন্ধুত্বের যোগ্যতার সত্যিকার মাপকাঠি। নির্বাণ অর্জনই হলো সর্ব্বোচ্চ মাত্রার সুখের নিদর্শন।

যখন কারো খারাপের প্রতি অপছন্দ মনোভাব সৃষ্টি হয়, যখন কেউ প্রশান্তি অনুভব করে, যখন কেউ সত্য ধর্ম শ্রবণের প্রতি অনুপ্রাণিত হয় ও আনন্দ খুঁজে পায়, যখন কারো এ কাজগুলোর প্রতি অনুভূতি থাকে এবং প্রশংসা কাজ করে, তারা ভয় থেকে মুক্ত।

যাকে তোমরা পছন্দ করো, তার প্রতি তোমরা আসক্তিপরায়ণ হবে না, আবার যা তোমরা অপছন্দ করো তার প্রতিও বিরূপভাব পোষণ করো না। দুঃখ, ভয় ও বন্ধন এগুলো একজনের পছন্দ এবং অপছন্দ হতেই উৎপন্ন হয়।

৫। লোহা হতে মরিচা জন্মায়, আবার ঐ মরিচা লোহাকে ক্ষয় করে। ঠিক একইভাবে অকুশলও উৎপন্ন হয় নিজের অন্তর থেকে। আবার ঐ অকুশল নিজের দেহকে ধ্বংস করে দেয়।

যে ধর্ম বই আন্তরিকতার সাথে পড়া হয় না, অচিরেই তার ঢালের উপরে ধূলা জমবে। একইভাবে একটি ঘর যদি অব্যবহার্য্য থাকে এবং ঠিকমত মেরামত করা না হয় তাহলে তাও আবর্জনাময় হয়ে পড়বে। অনুরূপভাবে, একজন অলস ব্যক্তিও শীঘ্রই আসক্তিপরায়ণ হয়ে পড়ে।

অকুশল কর্ম মানুষকে কলুষিত করে; কৃপণতা ধার্মিক ব্যক্তিকে কলুষিত করে। অনুরূপভাবে, অকুশল কর্ম মানুষের শুধু ইহজীবন নয়, পরজীবনকেও কলুষিত

করে।

আসক্তির মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হলো অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা। কোন লোকই তার দেহ-মনের পরিশুদ্ধিতা আশা করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তা অবিদ্যার হাত থেকে মুক্তি লাভ করতে না পারে।

নির্লজ্জতার মতো পদস্খলন, কাকের ন্যায় ধৃষ্টতা ও দুঃসাহসী হওয়া, অন্যকে আঘাত করে অনুশোচনা না করা খুবই সহজ।

কিন্তু নিরহঙ্কার হওয়া, অপরকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করা, সকল আসক্তি হতে মুক্তি লাভ করা, কাজে এবং চিন্তায় পরিশুদ্ধিতা রক্ষা করা এবং জ্ঞানী হওয়া কঠিনতম কাজ।

অপরের দোষত্রুটি বের করা সহজ কাজ, কিন্তু নিজের ভুলত্রুটি স্বীকার করে নেয়া কঠিন। একজন লোক কোনরূপ চিন্তা ছাড়াই অন্যের অকুশলের কথা ছড়ায়, কিন্তু সে নিজের অকুশলকে গোপন করে, যেমনি একজন জুয়াড়ী অতিরিক্ত পাশা গোপন করে রাখে।

আকাশে পাখি, ধোঁয়া বা ঝড়ের গতিপথকে রোধ করার যেমন কোন ব্যবস্হা নেই; তেমনি অধর্ম শিক্ষা কখনো জ্ঞান অর্জনের পথে নিয়ে যেতে পারে না। এ পৃথিবীতে কোন কিছুই স্হির নয়; কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা আলোকিত মন সবসময় প্রশান্ত থাকে।

৬। একজন দ্বাররক্ষী যেমন প্রাসাদের গেট পাহারা দিয়ে রাখে, তেমনি আমাদের মনকেও বাইরের ও ভিতরের বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য পাহারা দিতে হবে। এক মুহূর্তের জন্যও এতে অবহেলা করা উচিৎ নয়।

প্রত্যেকে নিজেই নিজের শিক্ষক। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার উপরেই প্রত্যেকে তাই নির্ভর করতে চায়। সুতরাং প্রত্যেকের উচিৎ নিজেকে নিজে

নিয়ন্ত্রণ করা।

জাগতিক বন্ধন এবং শৃঙ্খল থেকে আধ্যাত্নিক মুক্তির লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ হলো, নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করা, অহেতুক কথা বলা থেকে বিরত থাকা এবং গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকা।

সূর্যের আলো দিনকে আলোকিত করে, চাঁদের আলো রাত্রিকে মনোমুগ্ধকর করে, শৃঙ্খলা একজন যোদ্ধার মর্যাদা বৃদ্ধি করে। অনুরূপভাবে, জ্ঞানানুসন্ধানীরা শান্ত ও নিরবিচ্ছিন্ন ভাবনার দ্বারা অন্যদের চেয়ে সম্মানিত হয়।

যে লোক তার পঞ্চইন্দ্রিয়কে অর্থাৎ চোখ, কান, নাক, জিহ্বা এবং শরীরকে পাহারা দিয়ে রাখতে না পারে, সে তার চারিপাশের মোহ দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। সে জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত লোক নয়। যে দৃঢ়ভাবে তার পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারগুলোকে পাহারা দিয়ে রাখতে পারে এবং নিজের মনকে স্হিতিশীলতার মধ্যে রাখতে পারে, সেই একমাত্র ব্যক্তি যে সফলতার সাথে জ্ঞান অর্জনে প্রশিক্ষিত।

৭। যে পছন্দ ও অপছন্দের চেতনা দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হয়, সে পরিস্হিতির গুরুত্ব সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। পরিস্হিতির চাপে সে দিশেহারা হয়ে পড়ে, আবার যে জাগতিক মোহ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে, সে সঠিকভাবে পরিস্হিতির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে। তার কাছে তখন সবকিছুই নূতন ও গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়।

সুখ সর্বদা দুঃখকে আহ্বান করে এবং দুঃখ সর্বদা সুখকে অনুসরণ করে। কিন্তু যখন কেউ সুখ এবং দুঃখ, ভাল কাজ এবং খারাপ কাজের মধ্যে পার্থক্য করবে না, তখন সে প্রকৃত মুক্তি কি, তা উপলব্ধি করতে পারবে না।

অতীতের ঘটনা নিয়ে দুঃশ্চিন্তা বা অতীতে ঘটে যাওয়া বিষয়াদি নিয়ে আক্ষেপ করাটা হলো খাগড়ার মতো, যা কাটার পর দিন দিন বিবর্ণ ও শুকনো হয়ে যায়।

দেহ ও মন উভয়ের সুস্হ্যতার জন্য অতীতের কোন কিছুকে নিয়ে অনুতাপ না করা, ভবিষ্যতের কোন কিছুকে নিয়ে দুঃশ্চিন্তা না করা, এবং কোন ঝামেলা সম্পর্কে পূর্বাভাস না দিয়ে শুধু বর্তমানকে নিয়ে বিজ্ঞতা ও আন্তরিকতার সাথে বাস করা উচিৎ।

অতীতের মধ্যে বাস করা নয়, ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখার মাঝেও নয়, বর্তমানের মধ্যে মনকে কেন্দ্রীভূত করা আসল কাজ।

সবচেয়ে কৃতিত্বপূর্ণ কাজ হলো বর্তমান কর্তব্যটি কোন ব্যর্থতা ছাড়া উত্তমরূপে সম্পাদন করা। আগামীকাল করবো এরূপ ভেবে কোন কিছুকে এড়িয়ে যাওয়া বা স্হগিত রাখা উচিৎ নয়। এখনকার কাজ এখন সম্পাদনের মাধ্যমে একজন মানুষ ভালভাবে দিন যাপন করতে পারে।

প্রজ্ঞা হলো সর্বোত্তম পথপ্রদর্শক এবং বিশ্বাস হলো সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু। প্রত্যেকের উচিৎ অবিদ্যারূপ অন্ধকার ও দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করা, এবং পরিশেষে জ্ঞানের আলো অন্বেষণ করা।

যদি মানুষের দেহ ও মন নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকে, তাহলে তার উচিৎ এগুলোকে প্রমাণ স্বরূপ বিভিন্ন কাজে প্রয়োগ করা। ইহা হলো তার পবিত্র কাজ। এতে বিশ্বাস তার জন্য সম্পদ হয়ে দাঁড়াবে। সততা, তার জীবনে দেবে মিষ্টি আমেজ এবং সৎ গুণের সঞ্চয় হবে তার পবিত্র কাজ।

জীবন পরিভ্রমণে বিশ্বাস হলো পুষ্টিকর দ্রব্যের ন্যায়, পুন্যকর্মগুলো হলো আশ্রয়স্হল স্বরূপ, প্রজ্ঞা হলো দিনের আলোর ন্যায়, সম্যক স্মৃতি হলো রাত্রিকালীন প্রতিরক্ষা স্বরূপ। যদি কেউ বিশুদ্ধ জীবন যাপন করে, তাহলে কোন কিছুই তাকে ধ্বংস করতে পারে না। যদি কেউ লোভকে জয় করতে পারে, তাহলে কেউ তার মুক্তি ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

নিজের পরিবারের জন্যে নিজেকে ভুলে যেতে হবে। তেমনি সমাজের জন্যে

পরিবারকে, দেশের জন্য সমাজকে ভুলে যেতে হবে। অনুরূপভাবে, প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের জন্যে পার্থিব সবকিছুকেই ভুলে যেতে হবে।

সবকিছুই পরিবর্তনশীল, সবকিছুই উৎপন্ন হয়, আবার ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। জন্ম ও মৃত্যু যন্ত্রণার সীমান্ত অতিক্রম না করা পর্যন্ত পরম সুখ অর্জন দুরূহ কাজ।

ভ্রাতৃসংঘ

১ম পরিচ্ছেদ

ভ্রাতৃসংঘের দায়িত্ব ও কর্তব্য

১

গৃহত্যাগী সদস্যগণ/ভিক্ষু সংঘ

১। যে ব্যক্তি আমার শিষ্য হতে চায়, তাকে তার পারিবারিক সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করতে সম্মত হতে হবে, পার্থিব সামাজিক জীবন যাত্রা এবং সম্পদের উপর নির্ভরশীলতা পরিত্যাগ করতে হবে।

যে ধর্মের জন্য উপরোক্ত সব সম্পর্ক ছিন্ন করছে এবং যার শরীরে বা মনে এগুলোর প্রতি কোন দাবী নেই, সেই হবে আমার শিষ্য এবং তাঁকে গৃহত্যাগী সদস্য বলা হবে বা ভিক্ষু হিসেবে বলা হবে।

যদিও তার পা গুলো আমার পদচিহ্নে বিলীন হয়ে গেছে, এবং তার হস্তযুগল আমার পরিধেয় বসন বহন করছে, তথাপিও তার মন যদি লোভ দ্বারা তাড়িত হয়, সে আমার কাছ থেকে অনেক দূরে অবস্হান করছে। যদিও সে ভিক্ষুর মতো পোশাক পরিধান করে, কিন্তু আমার শিক্ষা গ্রহণ না করে, সে আমার দর্শন লাভ করতে পারবে না।

কিন্তু যদি সে মন থেকে সকল মোহকে সরিয়ে ফেলতে পারে এবং তার মনকে পরিশুদ্ধ ও শান্ত রাখতে পারে, তাহলে সে হাজার মাইল দূরে থাকলেও আমার কাছাকাছি থাকবে। যদি সে ধর্মকে গ্রহণ করে, তাহলে তার মধ্যে আমার দর্শন লাভ করতে পারবে।

২। হে আমার শিষ্যরা, গৃহত্যাগী সদস্যদের চারটি নিয়ম মেনে চলতে হবে এবং এর উপর ভিত্তি করে তাদের জীবন গড়ে তুলতে হবে।

প্রথমতঃ, তাদেরকে পুরানো এবং পরিত্যক্ত বস্ত্রাদি পরিধান করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, তারা পিন্ডপাতের মাধ্যমে খাদ্য সংগ্রহ করবে। তৃতীয়তঃ, যেখানে রাত্রি নেমে আসবে সেখানে তাদেরকে গাছের নীচে বা পাথরের উপরে আশ্রয় নিতে হবে। চতুর্থতঃ, তারা বিশেষ ধরনের ঔষধ ব্যবহার করবে যা তাদের ভ্রাতৃগণের পরিত্যাজ্য স্ব-মূত্র দ্বারা তৈরী হবে।

ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে এক বাড়ী হতে অন্য বাড়ীতে যাওয়া গৃহত্যাগীদের জীবন যাপনের একটি অংশ। কিন্তু একজন গৃহত্যাগী ব্যক্তিকে অন্য কেহ এ কাজে বাধ্য করতে পারবে না। সে কোন পরিস্থিতির চাপে বা প্রলোভনের দ্বারা একাজে বাধ্য হবে না। সে ইহা নিজে স্ব ইচ্ছায় সম্পাদন করবে কারণ সে জানে যে, বিশ্বাসের জীবন তাকে জীবনের মোহ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে, তাকে দুঃখ এড়াতে সাহায্য করবে এবং তাকে জ্ঞান অর্জনের পথে পরিচালিত করবে।

গৃহত্যাগী ব্যক্তিদের জীবন এত সহজ নয়; যদি সে তার মনকে লোভ এবং দ্বেষ থেকে মুক্ত করতে না পারে অথবা সে যদি তার মন বা পঞ্চইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে, তাহলে কারো এরূপ জীবন যাপনে আসা উচিৎ নয়।

৩। যে গৃহত্যাগী সদস্য হবে, তাকে অবশ্যই বিশ্বাস স্হাপন করতে হবে যে, কেউ যদি তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তাকে অবশ্যই উত্তর দিতে সক্ষম হতে হবে এই বলে যে ঃ

“গৃহত্যাগীদের সদস্যভুক্ত হতে হলে যা কিছু অঙ্গীকার করা প্রয়োজন আমি তা স্ব ইচ্ছায় প্রতিপালন করবো। আমি এর প্রতি আন্তরিক থাকব এবং এরূপ গৃহত্যাগী হওয়ার উদ্দেশ্যগুলোও পূরণ করতে সচেষ্ট থাকব। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব যারা আমাকে দান দিয়ে সাহায্য করছে। আমার আন্তরিকতা ও সৎ জীবন যাপনের মাধ্যমে আমি তাদের সুখী করতে সচেষ্ট থাকব।”

ভ্রাতৃসংঘের দায়িত্ব ও কর্তব্য

গৃহত্যাগী সদস্য হতে গেলে তাকে বিভিন্নভাবে প্রশিক্ষণ নিতে হবে ঃ যখন সে কোন কাজে ব্যর্থ হয়, তখন তাকে অবশ্যই লজ্জা ও অসম্মানকে অতিক্রম করে তা স্বীকার করতে হবে। যদি তার জীবনযাত্রাকে পরিশুদ্ধ রাখতে হয়, তাকে অবশ্যই শরীর, বাক্য ও মনকে বিশুদ্ধ রাখতে হবে। তাকে অবশ্যই তার পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে পাহারা দিয়ে রাখতে হবে। কিছু আনন্দ উপভোগ করার জন্য তার নিজের মনের উপর নিয়ন্ত্রণ হারানো উচিৎ নয়, নিজের প্রশংসা এবং অন্যের নিন্দা করা উচিৎ নয়; এবং তার কোনভাবেই অলস হওয়া উচিৎ নয় বা দীর্ঘক্ষণ ঘুমে সময় কাটানো উচিৎ নয়।

সন্ধ্যার সময় শান্তভাবে বসে ভাবনা করতে পারে মতো তাকে এমন একটি সময় ঠিক করতে হবে এবং ভাবনা শেষ করার পূর্বে কিছুক্ষণ চক্রমন করার সময়ও ঠিক করে রাখতে হবে। আরামদায়ক ঘুমের জন্য দু'পা একসাথে রেখে ডানপার্শ্ব হয়ে বিশ্রাম নেয়া উচিৎ এবং ঘুমানোর পূর্বে তার শেষ চিন্তা হওয়া উচিৎ পরবর্তীদিন ভোর কখন সে ঘুম থেকে উঠবে। ভোরেও শান্তভাবে বসে ভাবনা অনুশীলনের জন্য এবং ভাবনা শেষ হওয়ার পরে চক্রমনের জন্য অন্য একটি সময় নির্ধারণ করে রাখতে হবে।

সমস্ত দিন অতিবাহিত করার সময় তার সদা সতর্ক মনে অবস্হান করা উচিৎ। দেহ ও মন উভয়কে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। সকল প্রকার লোভ, দ্বেষ, মোহ, তন্দ্রাভাব, অমনোযোগিতা, দুঃখপ্রকাশ, এবং সন্দেহ মূলক বৈষয়িক তৃষ্ণা হতে দেহ ও মনকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে।

এভাবে, তার মনকে স্হিতিশীল অবস্হায় রেখে, সে সর্বোত্তম প্রজ্ঞার অনুশীলন করতে পারে এবং একমাত্র উদ্দেশ্য সম্যক জ্ঞান অর্জনের দিকে নিজেকে পরিচালিত করতে পারে।

৪। যদি গৃহত্যাগী কোন ব্যক্তি, নিজেকে ভুলে গিয়ে, লোভ, দ্বেষ, তিক্ততা, হিংসা, মান, আত্ম-প্রশংসা, বা অবিশ্বস্ততা ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তাহলে সে হবে

দুইধার তীক্ষ্ণ ধারালো তলোয়ারবাহী ব্যক্তি যা কেবলমাত্র পাতলা কাপড় দ্বারা আবৃত।

কেবলমাত্র ভিক্ষু বস্ত্র পরিধান করেও হাতে ভিক্ষা পাত্র নিয়ে বসবাসকারীকে গৃহত্যাগী বলা যায় না। আবার কেবল মাত্র সূত্র আবৃত্তি করতে পারলেই তাকে গৃহত্যাগী বলা হয় না। সে হবে একজন অন্তঃসার শূন্য লোক মাত্র, আর কিছুই নয়।

এমনকি যদি তার বাহ্যিক আবরণ ভিক্ষুর মতো হলেও, সে জাগতিক তৃষ্ণা হতে মুক্ত হতে পারে না। কাজেই সে গৃহত্যাগী ব্যক্তি নয়; বরং তাকে ভিক্ষুবস্ত্রধারী অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুই বলা যাবে।

যে জন নিজের মনকে স্হিতিশীল ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে; যে জন প্রজ্ঞা অর্জন করেছে, যে জন সব জাগতিক তৃষ্ণা হতে মুক্ত এবং যার একমাত্র লক্ষ্য জ্ঞান অর্জন করা; কেবল মাত্র তাদেরকেই প্রকৃত গৃহত্যাগী হিসেবে বলা যায়।

একজন সত্যিকার গৃহত্যাগী ব্যক্তি তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য জ্ঞান অর্জনের দিকে এগিয়ে যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকবে। এতে যদি তার শরীরের শেষ রক্তবিন্দু নিঃশেষ হয়ে যায়, বা তার হাড় ভেঙ্গে চূর্ণবিচুর্ণও হয়ে যায়। এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সম্পন্ন ব্যক্তিরা যদি তাদের সর্ব্বোচ্চ চেষ্টা করে, এবং এ প্রচেষ্টায় দৃষ্টান্ত স্হাপন করতে পারে, তখন তাদের পুণ্যময় কাজের দ্বারা একদিন তারা অবশ্যই লক্ষ্যার্জনে সক্ষম হবেন।

৫। গৃহত্যাগী ব্যক্তিদের পবিত্র কাজ হলো, বুদ্ধের পবিত্র শিক্ষার আলো প্রচারের মাধ্যমে চারিপাশ আলোকিত করা। সে সবাইকে সমভাবে শিক্ষা দেবে; বুদ্ধের শিক্ষা সম্পর্কে যারা জানে না, তাদেরকে বুদ্ধের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করাতে সচেষ্ট হবে; মিথ্যা দৃষ্টির হাত থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করতে হবে; সম্যক দৃষ্টির প্রতি জনসাধারণকে সহযোগিতা করতে হবে; তার জীবনের বিপদাপন্ন অবস্হা জেনেও তাকে সর্বত্র বুদ্ধের শিক্ষা প্রচারে বের হতে হবে।

ভ্রাতৃসংঘের দায়িত্ব ও কর্তব্য

গৃহত্যাগী সদস্যদের পবিত্র কাজ সহজ নয়, তাই যারা এ পথে আসতে চায় তাদেরকে বুদ্ধের পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করতে হবে, বুদ্ধের আসনে অধিষ্ঠিত হতে হবে এবং বুদ্ধের জ্ঞানজগতে প্রবেশ করতে হবে।

বুদ্ধের পূতপবিত্র বস্ত্র পরিধান করা মানে, বিনম্র ও অধ্যবসায়ী হওয়ার জন্য অনুশীলন করা। বুদ্ধের আসনে অধিষ্টিত হওয়া মানে, কোন বস্তুকে অসার হিসেবে দেখা এবং এর প্রতি আসক্তিপরায়ণ না হওয়া। বুদ্ধের পূতপবিত্র জ্ঞানজগতে প্রবেশ করা মানে, তার দ্বারা প্রদর্শিত সকল প্রাণীর প্রতি মহাকরুণাপরায়ণ ও সহানুভূতিশীল হওয়া।

৬। যারা বুদ্ধের ধর্ম শিক্ষা দিতে ইচ্ছুক, তাদেরকে অবশ্যই সর্বজন গ্রহণযোগ্য চারিটি বিষয় সম্পর্কে বিবেচনা করা উচিৎ। প্রথমতঃ, তারা তাদের নিজের চারিত্রিক পবিত্রতা সম্পর্কে সচেতন থাকবে। দ্বিতীয়তঃ, যখন তারা অন্যের সাথে সম্পর্ক স্হাপন করে এবং অন্যকে শিক্ষা দান করে তখন তাদের প্রতি শব্দ ব্যবহারে সতর্ক থাকবে। তৃতীয়তঃ, তাদের শিক্ষা দানের উদ্দেশ্য এবং শেষ পর্যন্ত এর দ্বারা কি অর্জন করতে পারে সে সম্পর্কে সচেতন থাকবে। পরিশেষে, তাদেরকে মহামৈত্রী সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

প্রথমতঃ, ধর্মশিক্ষা দানের জন্য একজন উপযুক্ত শিক্ষক হতে হলে গৃহত্যাগী সদস্যদের পদযুগল ধৈর্য্য নামক ভিতের উপর ভালোভাবে স্হাপন করতে হবে। তাকে অবশ্যই বিনয়ী হতে হবে; এবং কখনোই চরমভাবাপন্ন বা প্রচারমুখী হওয়া যাবে না। তাকে সবসময় বস্তুর অনিত্যতা সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে; এবং কোন কিছুর প্রতি সে আসক্তিপরায়ণ হতে পারবে না। যদি সে উল্লেখিত বিষয় সম্পর্কে বিবেচনা করে তা সম্পাদন করে, তাহলে সে সৎ চরিত্রবান হতে সক্ষম।

দ্বিতীয়তঃ, তাকে অবশ্যই মানুষ এবং অবস্হার সাথে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। তাদেরকে সর্বদা কর্তৃত্বপরায়ণ ব্যক্তি এবং অকুশল জীবন যাপন করে, এরূপ লোকদের থেকে দূরে থাকতে হবে। তাকে অবশ্যই ব্যভিচার হতে বিরত থাকতে

হবে। অতঃপর, মানুষকে অবশ্যই বন্ধুভাবে গ্রহণ করতে হবে। তাকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, সব জিনিসগুলো একটি সমন্বিত কার্য-কারণ নিয়মেই উৎপন্ন হয়, এবং তার উপরেই নির্ভরশীল। তাই কোন মানুষকে দোষারোপ বা নিন্দা করা উচিৎ নয়, অথবা তাদের ভুল সম্পর্কে সমালোচনা করা উচিৎ নয়, অথবা তাদেরকে হাল্কাভাবে গ্রহণ করা উচিৎ নয়।

তৃতীয়তঃ, সে অবশ্যই তার মনকে শান্ত অবস্থায় রাখবে। বুদ্ধকে তার মনে আধ্যাত্মিক পিতা হিসেবে গ্রহণ করবে। অন্য যে সকল গৃহত্যাগী সদস্যরা জ্ঞান অর্জনের জন্য বুদ্ধের শিক্ষায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে, তারা বুদ্ধকে আপন শিক্ষক হিসেবে মনে করবে। আর তখনই বুদ্ধানুগত সবাইকে সে মহামৈত্রীচিত্তে দর্শন ও গ্রহণ করতে পারবে। অতএব, সে অবশ্যই সকলকে সমভাবে শিক্ষা দান করতে পারবে।

চতুর্থতঃ, অবশ্যই তার করুণা পরায়ণতাগুণকে সে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেবে; যেভাবে বুদ্ধ সর্বজীবের প্রতি সর্ব্বোচ্চ মাত্রায় প্রদর্শন করেছিলেন। বিশেষতঃ তাঁর করুণাময় দৃষ্টিভঙ্গীকে ঐসব ব্যক্তিদের প্রতি প্রদর্শন করেছেন যারা জ্ঞান অর্জনের পন্হা সম্পর্কে তেমন জানে না। তার আশা করা উচিৎ যে, ঐ ব্যক্তিরা অবশ্যই জ্ঞান অর্জনের দিকে ধাবিত হবে। অতএব, তার উচিৎ নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের দিকে এবং তাদের উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া।

২
গৃহী অনুসারীগণ

১। পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে, বুদ্ধের অনুসারী হতে হলে তাদেরকে অবশ্যই ত্রিরত্নের শরণাপন্ন হতে হবে। বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘকে ত্রিরত্ন বলা হয়; যেহেতু এ তিনটি জীবন দুঃখের চির অবসানে মহামূল্য রত্ন সদৃশ।

গৃহী অনুসারী হতে হলে তাদেরকে অবশ্যই বুদ্ধের প্রতি অটল বিশ্বাস থাকতে

হবে, তাঁর শিক্ষার প্রতিও অবিচলিত বিশ্বাস থাকতে হবে, তাঁর শিক্ষা ও শীল প্রতিপালন করতে হবে এবং সংঘের প্রতি বিশ্বাস রেখে, তাঁদের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ পোষণ করতে হবে।

গৃহী অনুসারীদেরকে পঞ্চশীল পালন করা উচিৎ। এগুলো হলো, হত্যা না করা, চুরি না করা, ব্যভিচার না করা, মিথ্যা না বলা বা প্রতারণা না করা এবং মদ্যদ্রব্যাদি সেবন না করা।

গৃহী অনুসারীদেরকে সর্বদা মনে রাখতে হবে, তারা শুধু ত্রিরত্নের স্মরণাপন্ন হলে হবে না এবং শুধু শীল পালন করলে হবে না; এছাড়াও তাদের উচিৎ যতদুর সম্ভব অন্যদেরকে তা অনুসরণ করতে সাহায্য করা। বিশেষতঃ তাদের আত্নীয় ও বন্ধুদের মনে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি অটল বিশ্বাস জাগাতে অবিরাম চেষ্টা করা, যাতে তারাও বুদ্ধের অশেষ করুণার অংশ লাভ করতে পারে।

গৃহী অনুসারীদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, তারা ত্রিরত্নের উপর বিশ্বাস এবং বুদ্ধ অনুসৃত শীল প্রতিপালন করছে এ জন্যে যে, তাদের চুড়ান্ত লক্ষ্য হলো জ্ঞান অর্জন করা, এবং এ কারণে তৃষ্ণার রাজ্যে বাস করা সত্ত্বেও তাদের উচিৎ এর দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া।

গৃহী অনুসারীদের সর্বদা এটা মনে রাখতে হবে, আজ হোক বা কাল হোক তারা তাদের পিতা মাতা স্বরূপ বুদ্ধের ন্যায় সংঘ পরিবারের অংশ হিসেবে এ জীবন ও মরণ হতে একদিন তাদেরকে মুক্তি পেতেই হবে। সুতরাং তাদেরকে এ জীবনে কোন বস্তুর প্রতি আসক্তপরায়ণ হওয়া উচিৎ নয়, বরং তাদের উচিৎ মনকে জ্ঞান জগতে প্রবেশ করানো, যেখানে উৎপন্ন ও বিলয় হওয়ার মতো কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

২। যদি গৃহী অনুসারীরা বুদ্ধের শিক্ষার প্রতি আন্তরিক ও নিরবিচ্ছিন্ন বিশ্বাস স্হাপন করতে পারে, তাহলে তারা তাদের মনের অভ্যন্তরে শান্তিপূর্ণ সুখের অনুভূতিও অর্জন করতে পারবে; যা তাদেরকে চতুর্দিকে আলোকিত করবে এবং

এমনকি মৃত্যুর পরেও তা তাদের পশ্চাতে প্রতিফলিত হবে।

বিশ্বাসে ভরা মন পবিত্র ও শান্ত হয়, সর্বদা ধৈর্য্যশীল হয় এবং সহিষ্ণুতা পরায়ণ হয়। তারা কখনও অযৌক্তিক তর্ক করে না, কখনো তারা অন্যের দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায় না বরং সর্বদা ত্রিরত্ন--বুদ্ধ রত্ন, ধর্ম রত্ন ও সংঘ রত্নের কথা স্মরণ করে। এতে করে সুখ তাঁদের মনে স্বতস্ফুর্তভাবে উৎপন্ন হয় এবং জ্ঞান অর্জনের জন্য তাঁদের মনকে চতুর্দিক থেকে আলোকিত করে তোলে।

যেহেতু তারা বিশ্বাসের দ্বারা বুদ্ধের অতি নিকটে অবস্হান করছে, সেহেতু তারা স্বার্থপরতা থেকে অনেক দূরে অবস্হান করে। তারা তাদের সম্পত্তির প্রতি আসক্তিপরায়ণ হয় না। তাই তারা তাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনেও অপরের সমালোচনায় ভীত হয় না।

তাদের মনের মধ্যে কোন ভয় থাকবে না, কারণ মৃত্যুর পরে ভবিষ্যতে তারা বুদ্ধভূমিতে জন্মগ্রহণ করবে, এরূপই বিশ্বাস করে। যেহেতু বুদ্ধের সত্যতা ও পবিত্র শিক্ষার প্রতি তাদের বিশ্বাস আছে, সেহেতু তাদের কোনরূপ ভয় ছাড়াই মুক্তভাবে তারা তাদের চিন্তা ভাবনা প্রকাশ করতে পারে।

যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মন সকল প্রাণীর প্রতি করুণা দ্বারা পরিপূর্ণ, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মানুষে মানুষে কোনরূপ ভেদাভেদ সৃষ্টি করে না, বরং সকলকে সমান চোখে দেখে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মন পছন্দ অপছন্দ হতে মুক্ত থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মন বিশুদ্ধ ও স্হিতিশীল থাকবে। ফলে যে কোন শুভকর্ম সম্পাদন, তাদের জন্য সুখকর হবে।

তারা দুর্দশায় বা সমৃদ্ধির মধ্যে বাস করলেও, তা তাদের মধ্যে বিশ্বাসের হ্রাস বৃদ্ধিতে কোনরূপ পার্থক্য সৃষ্টি করে না। যদি তারা বিনয় অনুশীলন করে, বুদ্ধের শিক্ষাকে শ্রদ্ধা করে, কথায় ও কাজে যদি একমত থাকে, প্রজ্ঞা দ্বারা যদি তাদের জীবন পরিচালিত হয়, তাদের মন যদি পর্বতের ন্যায় অনঢ় হয়, তাহলে তারা জ্ঞান অর্জনের পথে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাবেই।

ভ্রাতৃসংঘের দায়িত্ব ও কর্তব্য

যদি তারা কঠিন অবস্থা বা অসৎ লোকের মধ্যে বসবাস করতে বাধ্য হয়, তবুও যদি তারা বুদ্ধের প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারে, তাহলে তারা ভাল কাজের দিকে পরিচালিত হবেই।

৩। সুতরাং তাদের প্রথমেই উচিৎ বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করা।

যদি কেউ তাদেরকে বলে যে, জ্ঞান অর্জনের জন্য তোমাদেরকে আগুনের মধ্য দিয়ে গমন করতে হবে, তখন এরূপ আগুনের মধ্য দিয়ে গমনেও তাদের সদিচ্ছা থাকা উচিৎ।

আগুনে পরিপূর্ণ এ পৃথিবীর মধ্যে বাস করেও আমরা বুদ্ধের নাম স্মরণ করার মাধ্যমে সন্তুষ্টি লাভ করতে পারি।

যদি কেউ বুদ্ধের শিক্ষা অনুসরণ করতে ইচ্ছা পোষণ করে, তাদের কোনভাবেই অহংকারী ও স্বেচ্ছাচারী হওয়া উচিৎ নয়, বরং সকলের প্রতি সমভাবে সদিচ্ছা পোষণ করা উচিৎ। তাদের উচিৎ শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করা, যারা সেবাপরায়ণ তাদেরকে সেবা করা এবং সকলের প্রতি একই দয়াশীলতা প্রদর্শন করা।

এভাবে সাধারণ অনুসারীদের প্রথমে তাদের মনকে প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে এবং অন্যদের কাজের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া উচিৎ নয়। এভাবেই তাদের বুদ্ধের শিক্ষাকে গ্রহণ এবং অনুশীলন করা উচিৎ, তাহলো কারো প্রতি পরশ্রীকাতর না হওয়া, অন্যদের দ্বারা অন্ধভাবে প্রভাবিত না হওয়া এবং অন্যদের পথ অনুসরণ না করা।

যে বুদ্ধের শিক্ষাকে বিশ্বাস করে না, তার দৃষ্টিভঙ্গী খুবই সংকীর্ণ এবং বলা যায় তার মনও স্বচ্ছ নয়। কিন্তু যারা বুদ্ধের শিক্ষাকে বিশ্বাস করে, তারা এও বিশ্বাস করে, আমাদের চারিপার্শ্বে বিশাল এক জ্ঞানের জগত আছে এবং মহামৈত্রী আমাদের সবাইকে ঘিরে আছে, এ বিশ্বাসের শক্তিতে সে অসৎ লোকদের দ্বারা তাড়িত হয় না।

ভ্রাতৃসংঘের দায়িত্ব ও কর্তব্য

৪। যারা বুদ্ধের শিক্ষা শ্রবণ করে এবং গ্রহণ করে তারা জানে যে, তাদের জীবন ক্ষনস্থায়ী এবং তাদের শরীর হলো কেবলমাত্র দুঃখের সমষ্টি এবং সকল অকুশলের উৎস। তাই তাদের শরীরের প্রতি মোহগ্রস্ত হওয়া উচিৎ নয়।

একই সময়ে, তাদের নিজ শরীরের প্রতি যত্ন নেয়াকে অবজ্ঞা করাও উচিৎ নয়, একারণে যে, তারা শরীরের মাধ্যমে কেবল শারীরিক আনন্দ উপভোগ করতে ইচ্ছুক নয় বরং জ্ঞান অর্জন এবং এই পথ সম্পর্কে অন্যদেরকে ব্যাখ্যা করার জন্যে শরীরের অস্থায়ী একটা গুরুত্বও রয়েছে।

শরীরের প্রতি সঠিক যত্ন না নিলে তা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। তাই তারা দীর্ঘ দিন যদি না বাঁচে তাহলে ব্যক্তিগতভাবে বুদ্ধের শিক্ষাকে অনুশীলন করতে পারবে না অথবা তা অন্যদের নিকট প্রচারও করতে পারবে না।

যদি কোন লোক নদী পার হতে চায়, তাহলে তার ভেলা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। যদি কেহ ঘোড়ায় চড়ে দীর্ঘ ভ্রমণে যেতে চায়, তাহলে তাকে ভালো করে তার ঘোড়ার যত্ন নিতে হবে। অনুরূপভাবে, যদি কোন ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করতে চায়, তাহলে তাকে তার শরীরের প্রতি যত্ন নিতে হবে।

বুদ্ধের শিষ্যদের অবশ্যই চীবর পরিধান করতে হয় শরীরকে অতি তাপ ও শীত থেকে রক্ষা করার জন্য, এবং ব্যক্তিগত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে ঢাকার জন্যে, কিন্তু ইহা শরীরের শোভা বর্ধনের জন্য নহে।

তাদেরকে অবশ্যই খাদ্য গ্রহণ করতে হয় শরীরের পুষ্টি যোগানোর জন্যে, যাতে তারা বুদ্ধের শিক্ষা শ্রবণ, গ্রহণ ও প্রচার করতে পারে। কিন্তু শক্তি মত্ততা প্রদর্শনের জন্য খাদ্য গ্রহণ করা নয়।

তাদের অবশ্যই জ্ঞান জগতে বাস করা উচিৎ, কারণ জাগতিক মোহের চোরগুলো হতে এবং কুশিক্ষার ঝড় থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্যে। কিন্তু এ জ্ঞানজগতকে স্বার্থপর কোন কাজে ব্যবহার না করে, সার্বজনীন কল্যাণের উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা উচিৎ।

ভ্রাতৃসংঘের দায়িত্ব ও কর্তব্য

এভাবেই, তাদের দৈনন্দিন ব্যবহার্য বস্তুকে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন এবং আন্তরিকভাবে জ্ঞান অর্জনে ও সেই শিক্ষাকে ব্যবহার করা উচিৎ। তাদের উচিৎ নয় ভোগ্যবস্তুর উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা বা স্বার্থের কারণে এগুলোর উপর মোহগ্রস্ত হয়ে পড়া; বরং অন্যের কাছে জ্ঞান অর্জনের শিক্ষা পৌঁছে দেয়ার মতো মহৎ উদ্দেশ্যে এগুলোকে ব্যবহার করা উচিৎ।

অতএব, তারা পরিবারের সাথে বাস করলেও তাদের মন সবসময় বুদ্ধের শিক্ষার সাথে অবস্হান করা উচিৎ। তাদের উচিৎ, পরিবারের সাথে জ্ঞানগর্ভ এবং সহানুভূতিমূলক আচরণ করা এবং তাদের মনে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস জাগ্রত করার জন্য বিভিন্ন উপায়ে চেষ্টা করা।

৫। বুদ্ধের গৃহী সংঘ সদস্যদেরকে প্রতিদিন নিম্নোক্ত পাঠ অনুশীলন করতে হয়, কিভাবে তাদের পিতা মাতার সেবা করতে হয়, কিভাবে তাদের স্ত্রী পুত্রদের ভরণ পোষণ করতে হয়, কিভাবে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় এবং কিভাবে বুদ্ধের ও সংঘের সেবা করতে হয়।

পিতা মাতার প্রতি সর্বোত্তম সেবা প্রদর্শন করতে হলে এবং স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে সুখে বাস করতে হলে, তাদেরকে সকল প্রাণীর প্রতি দয়া প্রদর্শনের বিষয়টি শিখতে হয় এবং লোভ ও আত্নসুখের মতো চিন্তাগুলো থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হয়।

পারিবারিক জীবনে তারা যে গানের সুর শুনে থাকে, সেগুলোর চেয়ে সুমধুর বুদ্ধের শিক্ষার সুর তাদের শুনা উচিৎ। যখন তারা পরিবারের আশ্রয়ে বসবাস করে তখন তাদের উচিৎ ধ্যান অনুশীলনের মাধ্যমে আরও নিরাপদ আশ্রয়ের অনুসন্ধান করা, যার মাধ্যমে জ্ঞানী লোকেরা সকল অবিশুদ্ধ এবং ভোগাসক্তির হাত থেকে মুক্তি অর্জনের কামনা করে।

যখন গৃহী লোকেরা কোন কিছু দান করতে চায়, তখন তাদের উচিৎ হৃদয় থেকে সমস্ত লোভকে ত্যাগ করা। যখন তারা বিপুল পরিমাণ মানুষের মধ্যে থাকে, তখন তাদের উচিৎ জ্ঞানী লোকদের সংসর্গ কামনা করা। যখন তারা দুর্ভাগ্যের মুখামুখি

হয়, তখন তাদের উচিৎ মনকে শান্ত এবং অনাসক্ত অবস্থায় রাখা।

যখন তারা বুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন তাদের উচিৎ তাঁর জ্ঞান প্রার্থনা করা।

যখন তারা ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন তাদের উচিৎ এর সত্যতা প্রার্থনা করা যা জ্ঞানের সমুদ্রের ন্যায়।

যখন তারা সংঘের আশ্রয় প্রার্থনা করে, তখন তাদের উচিৎ একক স্বার্থপরতাকে ভুলে গিয়ে শান্তিপূর্ণ ভ্রাতৃত্ববোধের প্রার্থনা করা।

যখন তারা বস্ত্র পরিধান করে, তখন তাদের উচিৎ সদগুন ও বিনয়ের মতো মনে আবরণ পরিধানের কথা মনে রাখা।

যখন তারা নিজেদেরকে মুক্ত হিসাবে দেখতে চায়, তখন তাদেরকে অবশ্যই সকল প্রকার লোভ, দ্বেষ ও মোহকে তাদের অন্তর থেকে বিতাড়িত করতে হবে।

যখন তারা কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে উপরের দিকে উঠতে থাকে, তখন তাদের মনে রাখা উচিৎ, তারা এখন জ্ঞান অর্জনের রাস্তার দিকে অগ্রসর হচ্ছে, যা তাদেরকে মোহের রাজ্য থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে। আর তারা যখন সহজ পথ ধরে অগ্রসর হয়, তখন তাদের উচিৎ এরূপ সহজতর সুযোগকে কাজে লাগানো, যা তাদেরকে বুদ্ধত্বজ্ঞান অর্জনের দিকে ধাবিত করবে।

যখন তারা কোন সেতুর প্রয়োজন দেখে, তখন তাদের উচিৎ তা নির্মাণ করা; যার দ্বারা মানুষেরা পারাপার করতে পারে। বুদ্ধের শিক্ষাও এরূপ, যার দ্বারা মানুষেরা উপকৃত হয়।

যখন তারা একজন দুঃখী মানুষের সন্ধান পায়, তখন তাদের উচিৎ এই চির পরিবর্তনশীল পৃথিবীর বিদ্যমান দুঃখের তীব্রতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং

ভ্রাতৃসংঘের দায়িত্ব ও কর্তব্য

সাধ্যমতো দুঃখীর দুঃখ মোচনে তৎপর হওয়া।

যখন তারা একজন লোভী মানুষের দেখা পায়, তখন তাদের উচিৎ এই জীবনে আসা মোহগুলো থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে মনে অশেষ শান্তি ও সন্তুষ্টি উৎপাদন করা এবং ত্যাগময় জ্ঞানের সত্যিকার নির্যাস অর্জন করা।

যখন তারা সুস্বাদু খাদ্যের সন্ধান পায়, তখন তাদের উচিৎ নিজেদের মনকে প্রবোধ দিয়ে রাখা। আবার যখন স্বাদহীন খাবার দেখে, তখন তাদের এটাই প্রত্যাশা করা উচিৎ, এতে লোভ আর কোনদিন তাদের কাছে ফিরে আসবে না।

যখন তারা গ্রীষ্মের তীব্র তাপে যন্ত্রণা অনুভব করে, তখন তাদের জাগতিক মোহ তাপ থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখা উচিৎ এবং জ্ঞানের সুশীতল স্নিগ্ধ প্রশান্তি অর্জনের দিকে ধাবিত হওয়া উচিৎ। শীতের তীব্র শৈত্যপ্রবাহের সময় বস্ত্রহীনদের জন্যে তাদের অবশ্যই বুদ্ধের মহৎ করুণারূপ উষ্ণতার সন্ধান লাভ করা উচিৎ।

যখন তারা পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে আবৃত্তি করে, তখন তাদের উচিৎ তা না ভুলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া এবং তাদের পড়া বিষয়গুলোকে অনুশীলন করা।

যখন তারা বুদ্ধের কথা ভাবে, তখন তাদের অন্তরে এরূপ গভীরভাব পোষণ করা উচিৎ, বুদ্ধের ন্যায় দৃষ্টিশক্তি অর্জন করবো।

রাত্রে গভীর ঘুমে নিমগ্ন হওয়ার ন্যায়, তাদের আশা করা উচিৎ, তাদের দেহ, মন ও বাক্য কোন প্রদুষ্ট কাজে ব্যবহার না হওয়ার দরুন বিশুদ্ধিতা ও সতেজতা প্রাপ্ত হয়েছে। সকালে যখন তারা ঘুম থেকে উঠে, তখন তাদের প্রথম সংকল্পবদ্ধ হতে হবে যে, ঐ দিন তাদের মন অবশ্যই বিশুদ্ধ থাকবে, যাতে মনে উৎপন্ন সব কিছুই তারা বুঝতে পারে।

৬। যারা বুদ্ধের শিক্ষাকে অনুসরণ করে তারা বুঝতে পারে যে, বৈশিষ্ট্যগতভাবে সব কিছুই "অসার"। তাই মানুষের জীবনে যে বস্তুগুলো প্রবেশ করে, সেগুলোকে

হাল্কাভাবে নেয়ার কোন অবকাশ নেই। কিন্তু তারা এগুলোকে যেভাবে আগমন করে ঠিক সেভাবেই গ্রহণ করে এবং তারা এগুলোকে জ্ঞান অর্জনের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে।

তাদের অবশ্যই এরূপ ভাবা উচিৎ নয় যে, এই পৃথিবীটা অর্থহীন এবং দ্বন্ধে পরিপূর্ণ। বস্তুতঃ অন্যদিকে জ্ঞানজগত অর্থপূর্ণ এবং শান্তিময়। তাই তাদের উচিৎ এই পৃথিবীর সকল বস্তুর মধ্যে জ্ঞানের স্বাদ আস্বাদন করা।

যদি কোন লোক অজ্ঞতা দ্বারা তাড়িত হয়ে আসক্তির চোখে এই পৃথিবীর দিকে তাকায়, তাহলে সে দেখবে, এই পৃথিবী ভুলে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। কিন্তু যদি সে সুস্পষ্ট প্রজ্ঞার মাধ্যমে অবলোকন করে, তাহলে সে একে জ্ঞানজগত হিসেবে দেখবে।

প্রকৃত বাস্তবতা হলো, এই পৃথিবীতে একটি মাত্র বিশ্ব আছে, দু'টি নয়। তাই একটি অর্থপূর্ণ এবং অন্যটি অর্থহীন, অথবা একটি ভাল এবং অন্যটি মন্দ এরূপ হতে পারে না। সাধারণত মানুষেরা তাদের পক্ষপাতমূলক মানসিকতার কারণেই, কেবল দু'টি পৃথিবীর কথা চিন্তা করে থাকে।

যদি তারা এসব পক্ষপাত দূর করতে পারে এবং তাদের মনকে প্রজ্ঞার আলো দ্বারা বিশুদ্ধ করতে পারে, তখন তারা একটি মাত্র পৃথিবী দেখতে পাবে যার সবকিছুই অর্থপূর্ণ।

৭। যারা বুদ্ধকে বিশ্বাস করে তারা এই পৃথিবীর সবকিছুতে এক অভিন্ন স্বভাব ধর্মতার উপস্থিতির স্বাদ অনুভব করে এবং ঐ একই মনে, তারা সকলের প্রতি সমান মৈত্রী এবং ব্যবহারে বিনম্র আচরণ প্রদর্শন করবে।

অতএব, তাদের উচিৎ মনের যাবতীয় অহংকার পরিত্যাগ করা এবং বিনয়, সৌজন্যতা ও সেবার মানসিকতা পোষণ করা। তাদের মন হবে ফলবান ভূমির ন্যায় যা সবকিছুকে পক্ষপাত ছাড়াই উর্বর করে তুলে, যা কোন প্রকার অভিযোগ

ছাড়াই ব্যবহার হয়ে আসছে, যা সহিষ্ণুতার সাথে সহ্য করে আসছে। এভাবেই তারা সবসময় প্রবল উৎসাহপূর্ণ হয়ে জ্ঞান সম্পদে গরীব লোকদের মনে বুদ্ধের শিক্ষার বীজ বপন করে প্রচুর পরিমাণে আনন্দলাভ করে থাকে।

যাদের মন গরীব লোকদের প্রতি করুণায় ভরপুর, তারা সকল মানুষের মাতৃতুল্য, সকলের শ্রদ্ধার পাত্র, সকলে তাদেরকে ব্যক্তিগত বন্ধু হিসেবে দেখে, এবং তাদেরকে সকলে পিতা মাতার মতো শ্রদ্ধা করে।

হাজার লোকও যদি বুদ্ধের গৃহী অনুসারীদের প্রতি কঠোর আচরণ এবং খারাপ ইচ্ছা পোষণ করে, তবুও তারা বুদ্ধানুসারীদের কোন ক্ষতি করতে পারে না। এরূপ ক্ষতিকে বিশাল সমুদ্রের পানিতে একফোঁটা বিষ ফেলার সাথে তুলনা করা যায়।

৮। একজন গৃহী বুদ্ধানুসারী তার স্মৃতিশক্তি, অনুধ্যান এবং কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন ইত্যাদি অভ্যাসের মধ্য দিয়ে সুখ উপভোগ করে। সে অনুধাবন করতে পারে, তার বিশ্বাস বুদ্ধের করুণা, এবং বুদ্ধের দ্বারাই ইহা তার কাছে আরোপিত হয়েছে।

বৈষয়িক আসক্তির ভূমিতে বিশ্বাসের কোন বীজ থাকে না। কিন্তু বুদ্ধের করুণার কারণে সেখানেও বিশ্বাসের বীজ বপন করা যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত মনের মধ্যে বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত মনের মাধ্যমে বিশুদ্ধিতা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পূর্বেই বলা হয়েছে, এরান্ডা গাছের বনে সুগন্ধিযুক্ত চন্দন গাছ জন্মাতে পারে না। অনুরূপভাবে, বুদ্ধের প্রতি বিশ্বাসের বীজও মোহপরায়ণ ব্যক্তির অন্তরে উৎপন্ন হতে পারে না।

কিন্তু, ফুলের সার্থকতা প্রকৃতপক্ষে প্রস্ফুটিত হওয়ার মাধ্যমে। তাই আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, মোহপরায়ণ ব্যক্তির অন্তরে যখন জ্ঞানপুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, তখন আমাদেরকে ভাবতে হবে যে, ইহার মূল অন্যত্র; উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়,

ইহার মূল বুদ্ধের অন্তর।

যদি কোন গৃহী বুদ্ধানুসারী আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে; সে তখন পরশ্রীকাতর, হিংসুক, ঘৃণাপরায়ণ এবং ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াবে। কারণ তার মন লোভ, দ্বেষ ও মোহের দ্বারা আসক্ত হয়ে পড়ছে। কিন্তু সে যদি আবার বুদ্ধের কাছে ফিরে আসে, তখন আবার সে বুদ্ধের জন্য মহৎ এক সেবা সম্পাদন করবে, যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে।

২য় পরিচ্ছেদ

সত্যিকার জীবন ধারণের ব্যবহারিক নির্দেশনা

১

পারিবারিক জীবন

১। এটা ভাবা ভুল যে, দুর্ভাগ্য পূর্বদিক থেকে বা পশ্চিম দিক থেকে আসে; এগুলো মূলতঃ মানুষের মনেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং, মানুষের মনের অভ্যন্তরকে অনিয়ন্ত্রিত রেখে বাহ্যিক অবস্হা থেকে দুর্ভাগ্যকে প্রতিহত করার চেষ্টা করা বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ পৃথিবীতে এমন কিছু প্রথা আছে যা প্রাচীনকাল থেকে চালু হয়ে আসছে, যা সাধারণ লোকেরা এখনও পর্যন্ত অনুসরণ করে চলছে। সকালে যখন তারা ঘুম থেকে উঠে তখন তারা প্রথমে দাঁত পরিস্কার করে এবং মুখ ধৌত করে, তারপর তারা ছয়দিকে যেমন, পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিন, উপরে এবং নিম্ন দিকে মস্তক অবনত করে শ্রদ্ধা নিবেদন করে; এবং প্রার্থনা করে, যেন কোন দিক থেকেই দুর্ভাগ্য তাদের কাছে না আসে এবং যাতে তারা শান্তিপূর্ণভাবে দিনাতিপাত করতে পারে।

কিন্তু বুদ্ধের শিক্ষানুসারে এটা ভিন্ন। বুদ্ধের শিক্ষানুসারে, আমাদেরকে ছয়টি সত্যের দিক নির্দেশনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে হবে। তারপর প্রাজ্ঞতা ও ধার্মিকতার মাধ্যমে এগুলোকে আচরণ করতে হবে। এভাবেই আমরা সকল দুর্ভাগ্যকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবো।

এই ছয়দিকের দরজাকে পাহারা দেয়ার পর, আসক্তি মূলক 'চারি প্রকার কাজ' থেকে মনকে মুক্ত রাখতে হবে; 'চারিপ্রকার অকুশল মন'কে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে এবং 'ছয় প্রকার ছিদ্র'কে সংযমের ছিপির মাধ্যমে বন্ধ করতে হবে, যার কারণে ধন সম্পদ নষ্ট হয়।

'চারি প্রকার অকুশল কাজ' এর অর্থ হলো, হত্যা, চুরি, ব্যভিচার ও মিথ্যার ভাষণ করা।

'চারি প্রকার অকুশল মন' এর অর্থ হলো, লোভ, দ্বেষ, মোহ ও ভয়সম্পন্ন মন।

'ছয় প্রকার ছিদ্র' যার কারণে ধন সম্পদের হানি হয় তা হলো, মাদক দ্রব্য সেবনের ইচ্ছা এবং বোকার মত আচরণ, গভীর রাত পর্যন্ত জাগ্রত থাকা এবং মনের গভীরতা হারানো, সংগীত এবং অন্যান্য বিনোদনের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়া, জুয়া খেলা ও খারাপ সঙ্গীদের সাথে সম্পর্ক স্হাপন এবং নিজের কতর্ব্য কাজ সম্পাদনে অবহেলা করা।

এই চারি প্রকার আসক্তিকে অপসারণের পর, মনের চারি প্রকার খারাপ অবস্হাকে এড়ানো, এবং অপচয়ের ছয়টি ছিদ্রকে ছিপির মাধ্যমে বন্ধ করার পর, বুদ্ধের অনুসারীগণ সত্যের ছয়টি দিকনির্দেশনার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাতে পারে।

এখন জানা যাক্, সত্যের এই ছয়টি দিকনির্দেশনাগুলো কি ? এগুলো হলো, পূর্বের দিক মানে পিতা মাতা এবং ছেলে মেয়েরা; দক্ষিণ দিক মানে শিক্ষক এবং ছাত্র ছাত্রী; পশ্চিম দিক মানে স্বামী এবং স্ত্রী; উত্তর দিক মানে সাধারণ মানুষ এবং তাদের বন্ধু; নিন্ম দিক মানে প্রভু এবং দাস দাসী; এবং উপরের দিক মানে বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যগণ।

একজন ছেলে বা মেয়ের উচিৎ তার পিতা মাতাকে সম্মান করা এবং তারা যা কিছু ইচ্ছা করেন তার সব কিছু পূরণ করা। তাদের উচিৎ পিতা মাতাকে সেবা করা, তাদেরকে পরিশ্রমের কাজে সহায়তা করা, পারিবারিক মর্যাদাকে ধরে রাখা, পারিবারিক সম্পদকে রক্ষা করা এবং যদি কেউ মারা যায় তাদের স্মৃতিচারণ করা।

পিতা মাতারা ও সন্তানদের প্রতি পাঁচটি কর্তব্য পালন করা উচিৎ তাহলো, খারাপ কাজে বাধাদান, ভাল কাজে দৃষ্টান্ত স্হাপনে উৎসাহিত করা, তাদের শিক্ষা দেয়া, তাদের বিবাহাদির ব্যবস্হা করা এবং যথাসময়ে পারিবারিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার হিসেবে বরণ করে নেয়া। যদি পিতা মাতা ও ছেলেমেয়েরা এই নিয়মগুলো মেনে

চলে তাহলে পরিবারে সবসময় শান্তি বিরাজ করে।

ছাত্র/ছাত্রীদের উচিৎ শিক্ষক শ্রেনীকক্ষে প্রবেশ করলে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান করা, তিনি যতক্ষণ আসন গ্রহণ না করেন ততক্ষণ নিজেরাও আসন গ্রহণ না করে তাঁর জন্য অপেক্ষা করা, তাঁর আদেশ শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সাথে মেনে চলা, শিক্ষকের জন্যে কিছু করতে হলে তা অবজ্ঞা না করে সম্পাদন করা এবং আন্তরিক মনযোগের সাথে তাঁর পাঠদান শ্রবণ করা।

একইভাবে, শিক্ষক ও তাঁর ছাত্র/ছাত্রীদের সম্মুখে যথাযথ আচরণ এবং তাদের জন্য ভাল দৃষ্টান্ত স্হাপন করা উচিৎ। তিনি যে শিক্ষা আয়ত্ত করেছেন তা তাঁর ছাত্র/ছাত্রীদের প্রতি মঙ্গলকামী চিত্তে সঠিকভাবে দান করা উচিৎ। শিক্ষা দানে তাঁর সহজ ও ভাল পদ্ধতি ব্যবহার এবং ছাত্র/ছাত্রীদের সম্মান অর্জনের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করে তোলা উচিৎ; এবং সম্ভাব্য সব উপায়ে ছাত্র/ছাত্রীদেরকে খারাপ সংস্পর্শ থেকে রক্ষা করার কথা শিক্ষকের ভুলা উচিৎ নয়। যদি একজন শিক্ষক এবং তাঁর ছাত্র/ছাত্রীগণ এই নীতিমালাগুলো মেনে চলে তাহলে তাদের সুসম্পর্ক ভালোভাবে রক্ষিত হবে।

একজন স্বামীর উচিৎ তার স্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা, সৌজন্যতা ও বিশ্বস্ততার সাথে আচরণ করা। ঘরের দায়িত্ব স্ত্রীর কাছে ছেড়ে দেয়া উচিৎ এবং সময়ে তার চাহিদা পরিপূরণে সহায়তা দান করা উচিৎ, যেমন--আনুসাঙ্গিক উপকরণ সমূহ। ঠিক একইভাবে, স্ত্রীর উচিৎ ঘরের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে সচেষ্ট হওয়া, কর্মচারীদেরকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করা, একজন সৎ স্ত্রী হিসাবে তার গুণাবলীকে রক্ষা করা। স্বামীর আয়ের অপচয় করা উচিৎ নয় এবং বাড়ীকে সুন্দরভাবে ও বিশ্বস্ততার সাথে তার পরিচালনা করা উচিৎ। যদি এই নিয়মগুলো অনুসরণ করা হয়, তাহলে একটি সুখী পরিবার গঠন করা সম্ভব এবং এতে কোন ঝগড়া উৎপন্ন হবে না।

বন্ধুত্বের নীতিমালা বলতে বুঝায়, তারা একে অন্যের প্রতি সহানুভুতিশীল হবে, একে অপরের ঘাটতি মোচন করতে সহায়তা দান করবে ও অপরের উপকার করতে

সহযোগিতা করবে, এবং সবসময় বন্ধুত্বসুলভ আচরণ ও আন্তরিকতামূলক বাক্য ব্যবহার করবে।

সবারই উচিৎ তার বন্ধুকে খারাপ পথে যেতে বাধা দেয়া, তার ধন সম্পদ রক্ষা করা এবং তার বিপদে সহায়তা করা। যদি তার বন্ধুর সামান্য দুর্ভাগ্যও নেমে আসে, তখন তার উচিৎ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া, যদি প্রয়োজন হয়, তার পরিবারকেও সহযোগিতা করা। এভাবে, তাদের বন্ধুত্ব বজায় থাকবে এবং দিন দিন তারা একত্রে সুখী হতে পারবে।

কোন গৃহকর্তা তার কর্মচারীদের প্রতি কার্য পরিচালনায় পাঁচটি বিষয় অনুসরণ করা উচিৎ। তার এমন কাজ হাতে নেয়া উচিৎ যা তার কর্মচারীদের দ্বারা করা সম্ভব। তাদেরকে যথাযথ বেতন দেয়া, অসুস্থ অবস্থায় তাদের যত্ন নেয়া, আনন্দপূর্ণ বিষয়াদি তাদের সাথে ভাগাভাগি করে উপভোগ করা এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় বিশ্রাম দেয়া।

কর্মচারীদেরও পাঁচটি বিষয় প্রতিপালন করা উচিৎ; গৃহকর্তা জেগে উঠার পূর্বেই তাদের শয্যা ত্যাগ করা উচিৎ। গৃহকর্তা শয্যায় যাওয়ার পর তাদের শয্যা গ্রহণ করা উচিৎ। সর্বদা সৎ থাকা উচিৎ। গৃহকর্তার শ্রীবৃদ্ধিকামী হয়ে যথাসম্ভব উত্তমরূপে কাজ করা উচিৎ; এবং তাদের গৃহকর্তার সুনাম নষ্ট হয় এরূপ কাজ করা উচিৎ নয়। যদি তারা এই নীতিগুলো অনুসরণ করে, তাহলে সর্বদা গৃহকর্তা ও দাস দাসীদের মধ্যে শান্তি বিরাজ করবে এবং একে অপরের মধ্যে কোনরূপ ভুল বুঝাবুঝি হবে না।

বুদ্ধের অনুসারীদের সবসময় এটা লক্ষ্য করা উচিৎ তার পরিবার বুদ্ধের শিক্ষা অনুসরণ করে চলছে কি চলছে না। বৌদ্ধ ভিক্ষু তথা শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিবেচনাবোধ লালন, সৌজন্যতার চর্চা, তাঁর নির্দেশনার প্রতি মনোযোগী ও যথাযথভাবে তা পালন এবং সবসময় তাঁর প্রতি নিবেদিত হওয়া উচিৎ।

তারপর বুদ্ধের শিক্ষা সম্পর্কে যিনি শিক্ষা দেবেন তাঁকে সঠিকভাবে শিক্ষার

সত্যিকার জীবনধারণের ব্যবহারিক নির্দেশনা

বিষয়বস্তু উপলব্ধি করতে হবে, ভুল ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করতে হবে, শিক্ষার প্রতি ভাল করে জোর দিতে হবে এবং অনুসারীদের সহজ পথের সন্ধান দিতে হবে। যখন একটি পরিবারে এই নীতিমালা অনুসরণ করা হয়, এবং মনের অভ্যন্তরে সঠিক শিক্ষা লালন করা হয়, তখন তারা সুখে জীবন যাপন করে।

একজন লোক যদি বাহ্যিক দুর্ভাগ্য থেকে মুক্তি লাভের জন্য ছয়টি দিকনির্দেশনার প্রতি মাথাবনত করে, তাহলে তাদের তা করা উচিৎ নয়। বরং তাদের মনের অভ্যন্তরে উৎপন্ন খারাপ মোহগুলো প্রতিরোধ করার জন্যই তাদের তা করা উচিৎ।

২। একজন লোক তার সাথে যাদের পরিচিতি আছে বা যার সাথে তাদের পরিচিতি নেই, তাদের সম্পর্কে তার সুস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিৎ।

ঐ সব লোকের সাথে সংশ্লিষ্টতা বা সম্পর্ক রাখা উচিৎ নয় যারা লোভী, বাকপটু, তোষামোদকারী বা অপচয়কারী।

তাদের ঐসব লোকের সাথেই সম্পর্ক রাখা উচিৎ যারা সাহায্যকারী, যারা সুখের ন্যায় দুঃখকেও ভাগাভাগি করে অংশ নিতে চায়, যারা সৎ পরামর্শ দান করে এবং তদুপরি যাদের সহানুভুতিশীল অন্তর আছে।

একজন সত্যিকারের বন্ধু হলো সে, যার সাথে কোন লোক নিরাপদে মিশতে পারে, যে সবসময় বন্ধুকে সৎ পথে পরিচালিত করে, যে গোপনে তার বন্ধুর কল্যাণ কামনা করে, দুর্ভাগ্যের সময় তার প্রতি সমবেদনা জানায়, প্রয়োজনে তার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়, যে বন্ধুর গোপনীয়তা রক্ষা করে এবং যে সর্বদা সৎ পরামর্শ দেয়।

এরূপ বন্ধু লাভ করা খুবই দুষ্কর, তদুপরি এরূপ বন্ধু হওয়া খুবই কঠিন। যেভাবে সূর্য এই উর্বর পৃথিবীকে উষ্ণ রাখে, সেভাবে একজন ভালো বন্ধু তার ভাল কাজের মাধ্যমে সমাজকে উজ্জ্বল করে তুলে।

৩। ছেলে মেয়েদের পক্ষে কঠিন, তাদের পিতামাতার উদার দয়ালুতার ঋণ পরিশোধ করা। এমনকি যদি তারা তাদের পিতাকে নিজেদের ডান কাঁধে এবং মাতাকে বাম কাঁধে রেখে একশত বৎসর বহনও করে, তবুও ঐ ঋণ শোধ করার মত নয়।

এমনকি তারা যদি তাদের পিতামাতার শরীরকে সুগন্ধযুক্ত দ্রব্যের মাধ্যমে শত বৎসর ধরে ধৌতও করে, একজন আদর্শবান সন্তান হিসাবে সেবাও করে, তাদের জন্য সিংহাসনও তৈরী করে, এবং তাদের প্রতি বিশ্বের যাবতীয় বিলাসিতার ব্যবস্হাও করে দেয়, তথাপিও তারা তাদের পিতামাতার কাছে কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ থাকে, তা পরিশোধের যোগ্য নয়।

কিন্তু তারা যদি তাদের পিতামাতাকে বুদ্ধের শিক্ষার প্রতি ধাবিত করতে পারে, খারাপ যে কোন কিছু পরিত্যাগ এবং ভাল কিছুর অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে, সকল প্রকার লোভ পরিত্যাগ এবং দান চিত্ত সৃষ্টি করতে পারে, তাহলেই তারা পিতামাতার ঋণ পরিশোধের চেয়েও বেশী কিছু করতে পারে।

যে গৃহে পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রদর্শিত হয়, সেখানে বুদ্ধের আশীর্বাদও বর্ষিত হয়।

৪। পরিবার হলো এমন এক স্হান যেখানে মানুষের মন একে অন্যের সংস্পর্শে আসে। যদি এই মন একে অন্যকে ভালবাসে পরিবার হয়ে উঠে ফুলের বাগানের মত। কিন্তু যদি এই মন একে অন্যের প্রতি বিরূপতা প্রকাশ করে, তবে তা ঝড়ের ন্যায় বাগানের ব্যাপক ধ্বংস করে।

যদি পরিবারে মতানৈক্য দেখা দেয়, তখন একে অন্যকে দোষারোপ করা উচিৎ নয়, বরং প্রত্যেকের নিজ নিজ মনকে পরীক্ষা করা উচিৎ এবং একটি সঠিক পথের সন্ধান করা উচিৎ।

৫। একদা এক স্থানে এক গভীর বিশ্বাসী লোক বাস করতো। যখন সে যুবক ছিলো তখন তার পিতা মারা যান; সে তার মাতার সাথে সুখে বসবাস করছিল, অতপর সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলো।

প্রথমে তারা একত্রে খুবই সুখে বাস করছিলো, এবং পরবর্তীতে সামান্য ভুল বুঝাবুঝিতে, স্ত্রী এবং শাশুড়ী একে অপরকে অপছন্দ করতে শুরু করলো। এই অপছন্দ চুড়ান্তভাবে যুবক দম্পতিকে তাদের মা ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত চলছিল।

শাশুড়ী চলে যাওয়ার পর ঐ যুবক দম্পতির একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করলো। শাশুড়ীর কাছে একটি গুজব পৌঁছলো, যুবতী স্ত্রীলোকটি নাকি বলাবলি করছিল, "আমার শাশুড়ী সবসময় আমাকে রাগান্বিত করতো, সে যদি আমাদের সাথে থাকতো তাহলে আমরা এরূপ সুখের দিন উপভোগ করতে পারতাম না; কিন্তু সে চলে যাওয়ার পরপরই আমাদের পরিবারে সুখের সংবাদ আসলো।"

এই গুজব শাশুড়ীকে রাগান্বিত করে তুলল এবং বিস্মিত হয়ে বলে উঠলো, "যদি কোন স্বামীর মা বাড়ী থেকে বিতাড়িত হয় এবং এর ফলে ঐ বাড়ীতে সুখের আবহাওয়া প্রবাহিত হয়, তাহলে পৃথিবী হতে প্রকৃত সত্য হেরে গেছে এবং এর বিপরীত কিছুই সত্য হিসাবে প্রতীয়মান হচ্ছে।"

এরপরে যুবকটির মা চিৎকার দিয়ে বললো, "এখন আমাদের উচিৎ 'সত্যকে' দাহ করা।" একজন পাগলিনীর বেশে সে শ্মশানে গমন করলো, নিজেকে দাহ করার জন্যে।

এক দেবতা এরূপ দুর্ঘটনার কথা শুনে ঐ মহিলাটির সম্মুখে উপস্থিত হলো এবং তাকে বিরত রাখতে চেষ্টা করলো, কিন্তু তাঁর সেই চেষ্টা ব্যর্থ হলো।

এরপর দেবতাটি তাকে বললো, "যদি তুমি এরূপ করো তাহলে আমি শিশু ও তার মাকে আগুনে পুড়ে মারব। তা কি তোমাকে সন্তুষ্ট করবে ?"

ইহা শুনে শাশুড়ী তার ভুল বুঝতে পারলো, তার রাগের জন্য অনুতপ্ত হলো এবং শিশুটি ও তার মায়ের জীবন রক্ষার জন্য দেবতাটির কাছে প্রার্থনা জানালো। একই সময়ে, যুবতী স্ত্রীলোকটি এবং তার স্বামী বৃদ্ধ মহিলাটির প্রতি তাদের অবিচারের কথা বুঝতে পারলো এবং শ্মশানে গেল তাকে সন্ধান করতে। দেবতাটি তাদের ভুল ধরে দিলো। অতপর তারা একসাথে একই পরিবারে সুখে বসবাস করতে লাগলো।

নিজে যদি ধ্বংস না করে তাহলে প্রকৃত সত্য কখনো হারিয়ে যেতে পারে না। প্রকৃত সত্য মাঝে মাঝে বিলুপ্ত হয়েছে বলে মনে হলেও, ইহা কখনো বিলুপ্ত হওয়ার নয়। যখন মনে হয় যে, প্রকৃত সত্য বিলুপ্ত হতে যাচ্ছে তখন বুঝতে হবে, নিজের মন থেকে প্রকৃত সত্য বিলুপ্ত হতে চলেছে।

বিরোধপূর্ণ মন সবসময় মারাত্মক সমস্যা বয়ে আনে। অযৌক্তিক ভুল বুঝাবুঝি অনেক সময় ব্যাপক দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষত পারিবারিক জীবনে এটা রোধ করা উচিৎ।

৬। পারিবারিক জীবনে দৈনন্দিন ব্যয়নির্বাহ কিভাবে করা হবে এ বিষয়ে যথাযথ যত্ন সহকারে কাজ করা উচিৎ। পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে পরিশ্রমী পিপীলিকা এবং ব্যস্ত মৌমাছির মতো পরিশ্রম করা উচিৎ। একে অন্যের শ্রম বা দয়ার উপর নির্ভর করা উচিৎ নয়।

অন্যদিকে, কোন লোকের এটা মনে করা উচিৎ নয় যে, যা উপার্জন করেছে তা সম্পূর্ণভাবে তার নিজস্ব। এর কিছু অংশ অবশ্যই অন্যের সাথে ভাগাভাগি করে নিতে হবে, কিছু অংশ জরুরী প্রয়োজনের জন্য রাখতে হবে, কিছু অংশ সংরক্ষিত রাখতে হবে তার ভবিষ্যত প্রয়োজনে ও সমাজের কাজের জন্যে এবং জাতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য। কিছু অংশ ধর্মীয় গুরুদের প্রয়োজনে দান করার জন্যে।

এটা অবশ্যই মনে রাখা উচিৎ যে, এই পৃথিবীতে নিশ্চিতভাবে কোন কিছুকে আমার একান্ত নিজস্ব বলে দাবী করা যাবে না। কোন ব্যক্তির কাছে যা কিছু আসে, তা কার্য-কারণের সমন্বয়েই আসে। ইহা ক্ষণিকের জন্যেই তার কাছে ধরা দেয়।

অতএব, সে একে আত্মকেন্দ্রিক বা অপ্রয়োজনীয় কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা উচিৎ নয়।

৭। রাজা উদয়ের রানী শ্যামাবতী একদা আনন্দকে পাঁচশত চীবর দান করেছিলেন, যা আনন্দ অতীব সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছিলেন।

ইহা শুনে রাজা আনন্দকে অসততার অভিযোগে সন্দেহ করলেন। তাই তিনি আনন্দের কাছে গিয়ে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন এই পাঁচশত চীবর দিয়ে তিনি কি করবেন ?

প্রত্যুত্তরে আনন্দ বললেন, " হে রাজন, আমার বেশীর ভাগ ভ্রাতৃসংঘ ছিন্ন চীবর পরিধান করে আছেন, আমি তাদের মাঝে এগুলো ভাগ করে দেবো।" নিম্নে তাঁদের কথোপকথন উল্লেখ করা গেল।

"পুরনো কাপড়গুলো দিয়ে আপনারা কি করবেন ?"
"এগুলো দিয়ে আমরা বিছানার চাদর বানাবো।"
"পুরনো বিছানার চাদর দিয়ে আপনারা কি করবেন ?"
"এগুলো দিয়ে আমরা বালিশের কভার বানাবো।"
"পুরনো বালিশের কভার দিয়ে আপনারা কি করবেন ?"
"এগুলো দিয়ে আমরা ঘর মোছার নেকড়া তৈরী করবো।"
"পুরনো ঘর মোছার নেকড়া দিয়ে কি করবেন ?"
"এগুলো আমরা পা মোছার কাজে ব্যবহার করবো।"
"পুরনো পা মোছার কাপড় দিয়ে আপনারা কি করবেন ?"
"এগুলো আমরা ঘর ঝাঁড়ু দেয়ার কাজে ব্যবহার করবো।"

"মহামান্য রাজা ! এরপর আমরা এগুলোকে আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করবো, এবং মাটির সাথে মিশ্রিত করে ঐ মাটি পোঁচড়া হিসাবে ঘরের দেয়ালে ব্যবহার করা হবে।"

এভাবে যে কোন বস্তুই আমাদের হাতে আসুক না কেন, আমরা ঐগুলোকে যত্নের

সাথে যথাযথভাবে ব্যবহার করি। কারণ আমরা জানি এগুলো আমাদের নয়, কেবল মাত্র সাময়িকভাবে আমরা এগুলোকে ব্যবহার করছি।

২
মহিলাদের জীবন

১। এই পৃথিবীতে চার ধরনের মহিলা আছে। এদের প্রথম ধরনের মহিলারা হলো, যারা খুব সামান্য কারণে রেগে যান, যাদের মন খুবই পরিবর্তনশীল, যারা লোভী এবং অন্যের সুখের প্রতি লালায়িত, অন্যের প্রয়োজনের প্রতি যাদের বিন্দুমাত্র দয়া নেই।

দ্বিতীয় ধরনের মহিলারা হলো, যারা সামান্য কারণে রেগে যান, যারা লোভী এবং দ্রুত মন পরিবর্তন করেন, কিন্তু অন্যের সুখের প্রতি লালায়িত নয় এবং অন্যের প্রয়োজনের প্রতি দয়াশীল।

তৃতীয় ধরনের মহিলারা হলো, যারা উদার মানসিকতা সম্পন্ন, এবং খুব তাড়াতাড়ি রেগে যান না। তারা জানেন কিভাবে লোভী মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়, কিন্তু ঈর্ষার অনুভুতি পরিত্যাগে সমর্থ নন, এবং অন্যের প্রয়োজনের প্রতি দয়াশীলও নন।

চতুর্থ ধরনের মহিলারা হলো, যারা উদার মানসিকতা সম্পন্ন এবং যারা লোভ পরিত্যাগ করতে পারে, এবং মানসিক প্রশান্তি রক্ষায় সক্ষম, যারা অন্যের সুখের প্রতি লালায়িত নয় এবং অন্যের প্রয়োজনের প্রতি দায়িত্বপরায়ণ।

২। যখন একজন যুবতী মহিলা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তখন তাকে নিম্নোক্ত নিয়মগুলো মেনে চলা উচিৎ, "আমি আমার স্বামীর পিতা মাতাকে সম্মান ও সেবা করবো। আমরা যে সুবিধাগুলো ভোগ করছি তা তাদের দ্বারা প্রদত্ত এবং তাঁরা আমাদের আপদে বিপদে রক্ষাকারী। অতএব, তাই পরিতৃপ্তির সাথে তাদের সেবা

করা উচিৎ এবং যখনই পারা যায় তখনই তাদের সেবা করতে প্রস্তুত থাকা উচিৎ।

"আমাকে অবশ্যই আমার স্বামীর ধর্মগুরু ও শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা উচিৎ। কারণ তাঁরা আমার স্বামীকে পবিত্র শিক্ষা দান করেছেন এবং ঐ সব পবিত্র শিক্ষা ছাড়া আমরা মানব জাতি হিসাবে বাস করতে পারতাম না।"

"আমাকে অবশ্যই মস্তিষ্ক সম্পন্ন (বুদ্ধিমতি) হতে হবে, যাতে আমি আমার স্বামীকে বুঝতে পারি এবং তার কাজে সহায়তা করতে পারি। আমাকে তাঁর স্বার্থের প্রতি মতানৈক্য হওয়া যাবে না, এই মনে করে যে এটা তাঁর বিষয়, আমার নয়।

"আমাকে পরিবারের চাকরদের স্বভাব, সামর্থ্য এবং চাহিদা সম্পর্কে বুঝতে হবে এবং সহৃদয়তার সাথে তাদেরকে ব্যবহার করতে হবে। আমি আমার স্বামীর আয়কে সৎভাবে রক্ষা করবো এবং একে অযথা ব্যবহার করবো না।"

৩। স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক কেবলমাত্র তাদের পারিবারিক সুবিধার জন্য সৃষ্ট নয়। কেবল একই গৃহে দু'টো শারীরিক অস্তিত্বের অবস্হান ছাড়াও এই সম্পর্ক আরো গভীর গুরুত্ব বহন করে। স্বামী ও স্ত্রীর অন্তরঙ্গ সম্পর্ককে সুমধুর করে তোলার জন্যে এবং বিপদের সময়ে একে অন্যকে কিভাবে সহযোগিতা করবে এ ব্যাপারেও, জ্ঞান অর্জনেও পবিত্র ধর্ম শিক্ষা অনুশীলন করা উচিৎ।

এক বৃদ্ধ "আদর্শ যুগল" এক সময় বুদ্ধের নিকটে আসলেন এবং বললেন, " মহামতি বুদ্ধ! আমরা শৈশব থেকে একে অপরকে জেনে শুনে বিয়ে করেছি এবং এ পর্যন্ত আমাদের সুখের জীবনে কোন প্রকার মলিনতা আসেনি। অনুগ্রহ করে আমাদেরকে বলুন পরবর্তী জীবনে আমরা পুনঃ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবো কি না?"

বুদ্ধ তাঁদেরকে এই জ্ঞানগভীর উপদেশ দান করলেন, " যদি তোমরা দু'জনে একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হও, যদি তোমরা দু'জনে ঠিক একই শিক্ষা অনুশীলন করো, যদি

তোমরা দু'জনে ঠিক একইভাবে দানাদি কুশল কর্ম সম্পাদন করো, এবং যদি দু'জনে ঠিক একই জ্ঞানের অধিকারী হও, তাহলে পরবর্তী জীবনে তোমরা অভিন্ন মন ও যুগ্ম জীবনের অধিকারী হতে পারবে।"

৪। সুজাতা ছিলেন ধনী বণিক অনাথপিন্ডের বড় ছেলের স্ত্রী। তিনি ছিলেন বদমেজাজী। অন্যকে শ্রদ্ধা করতেন না এবং তাঁর স্বামী ও স্বামীর পিতামাতার নির্দেশ মানতেন না। এইসব কারণে তাঁদের পরিবারে সবসময় সমস্যা উদ্ভুত হতো।

একদিন মহাকারুণিক বুদ্ধ অনাথপিন্ডিককে দর্শন করতে আসলেন এবং এই পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করলেন। তিনি সুজাতাকে ডেকে স্নেহসুরে নিম্নোক্ত কথাগুলো বললেন ঃ

"সুজাতা, এই পৃথিবীতে ৭ প্রকারের স্ত্রী আছে। এদের প্রথমটি হলো খুনী লোকের ন্যায়। সে অকুশল মনের অধিকারিনী, সে তার স্বামীকে সম্মান করে না, এবং পরিণতিতে অন্য ব্যক্তির প্রতি তার মন ধাবিত হয়।

"দ্বিতীয় প্রকারের স্ত্রী হলো চোরের ন্যায়। সে কখনও স্বামীর পরিশ্রমের কথা ভাবে না; কেবল মাত্র নিজের ভোগ লালসার কথাই ভাবে। সে নিজের ইচ্ছাকে চরিতার্থ করার জন্য স্বামীর আয়কে অপচয় করে এবং তা করতে গিয়ে স্বামীর অর্থ চুরি করে।"

"তৃতীয় প্রকারের স্ত্রী হলো শাসকের ন্যায়। সে তার স্বামীকে শাসন করে, বাড়ীকে পরিপাটি করে রাখতে সে অবহেলা করে এবং সবসময় তার স্বামীকে খারাপ ব্যবহার করে।"

"চতুর্থ প্রকারের স্ত্রী হলো মাতার ন্যায়। সে তার স্বামীকে শিশুর ন্যায় পরিচর্যা

করে, মা যেমন তার শিশুকে রক্ষা করে তেমনি সেও তার স্বামীকে রক্ষা করে, এবং

স্বামীর উপার্জনকে সদ্ব্যবহার করে।"

"পঞ্চম প্রকারের স্ত্রী হলো বোনের ন্যায়। সে স্বামীর প্রতি বিশ্বাসী, বিনয়ী আচরণ ও রক্ষণশীলতার সাথে স্বামীর পরিচর্যা করে।"

"ষষ্ঠ প্রকারের স্ত্রী হলো বন্ধুর ন্যায়। সে তার স্বামীকে সন্তুষ্ট করতে চায়, যেমনটি কোন বন্ধু দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর গৃহে ফিরে আসলে করে থাকে। সে বিনয়ী, সদ্ব্যবহারকারী এবং অসীম শ্রদ্ধার সাথে স্বামীর প্রতি আচরণ করে।"

"সপ্তম প্রকারের স্ত্রী হলো গৃহভৃত্যের ন্যায়। সে তার স্বামীকে বিশ্বাসের সাথে ভালবাসে এবং সেবা যত্ন করে। সে তাকে শ্রদ্ধা করে, তার আদেশ মেনে চলে, তার নিজস্ব কোন ইচ্ছা নেই, কোন প্রকার অকুশল ইচ্ছা পোষণ করে না, কোন প্রকার দ্বেষভাব পোষণ করে না, এবং সর্বদা স্বামীকে সুখী রাখতে চায়।"

মহাকারুণিক বুদ্ধ সুজাতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি নিজেকে কোন প্রকারের স্ত্রীর ন্যায় বলে মনে করো ?"

বুদ্ধের এই কথা শুনে সুজাতা তাঁর পুর্বকৃত আচরণের জন্য লজ্জিত হলো এবং বললো, ভন্তে; আমি শেষোক্ত প্রকারের স্ত্রী হতে ইচ্ছুক। সে তার স্বভাবে পরিবর্তন আনলো এবং পরে তার স্বামীর সাহায্যকারী হিসাবে কাজ করতে ইচ্ছা পোষণ করলো। পরবর্তীতে তাঁরা স্বামী স্ত্রী একত্রে জ্ঞান অর্জন করলেন।

৫। আম্রপালী নামক এক ধনী মহিলা যে বৈশালীতে বিখ্যাত বারাঙ্গনা হিসাবে পরিচিত ছিলো। অনেক সুন্দরী যুবতীকে তার কাছে বেশ্যাবৃত্তির জন্যে সে ধরে রেখেছিলো। একদা বুদ্ধকে সে আমন্ত্রণ করলো এবং প্রার্থনা জানালো কিছু ভাল শিক্ষা তাকে দান করার জন্যে।

তথাগত বুদ্ধ তাকে বললেন, "আম্রপালী, মহিলাদের মন সহজেই উত্তেজিত হয় এবং ভুল পথে ধাবিত হয়। মহিলারা পুরুষের তুলনায় অতি সহজেই তাদের আকাংখার কাছে এবং ঈর্ষার কাছে পরাজিত হয়।

"অতএব, আর্য পথ অনুসরণ করা মহিলাদের পক্ষে খুবই কঠিন কাজ। ইহা বিশেষভাবে যুবতী ও সুন্দরী মহিলাদের জন্য সত্যিই কঠিন কাজ। তোমাকে অবশ্যই লালসা ও মোহ অতিক্রম করে আর্য পথের দিকে ধাবিত হতে হবে।"

"আম্রপালী, তোমাকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, যৌবন ও সৌন্দর্য্য চিরস্থায়ী নয়। এদেরকে অসুস্থতা ভোগ করতে হয়, বার্ধক্য দ্বারা আক্রান্ত হতে হয়, দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয়। সম্পদ ও ভালবাসার প্রতি তৃষ্ণা মহিলাদের চিরন্তন এক সমস্যা, কিন্তু আম্রপালী, এগুলো আধ্যাত্মিক সম্পদ নয়। জ্ঞান অর্জনই একমাত্র সম্পদ যা মূল্যায়ন করা যায়। সুস্থ্যতাকে অসুস্থ্যতা অনুসরণ করে; তারুণ্যতাকে বার্ধক্যতা অনুসরণ করে; জন্ম মৃত্যুকে পথ করে দেয়। একজন লোক যাকে ভালবাসতো, একদিন তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, যাকে ঘৃণা করতো তার সাথে বসবাস করতে পারে। দীর্ঘদিন একজন লোক যা চায়, তা লাভ নাও করতে পারে। ইহাই জীবনের চিরাচরিত নিয়ম।"

"একমাত্র জিনিষ যা মানুষের জীবনে চিরস্থায়ী শান্তি এবং সুরক্ষা আনয়ন করতে পারে তা হলো জ্ঞান অর্জন। আম্রপালী, তোমার এখনই জ্ঞান অর্জনের পথ খোঁজা উচিত।"

সে মহাকারুণিক বুদ্ধের দেশনা শ্রবণ করে তাঁর শিষ্যা হলো এবং ভিক্ষুসংঘকে সুসজ্জিত বাগানটি দান করে দিলো।

৬। জ্ঞান অর্জনের পথে স্ত্রী / পুরুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই। যদি কোন মহিলা জ্ঞান অর্জনের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, সে হবে সত্যের পথ সন্ধানী বীর সৈনিক।

মল্লিকা যিনি প্রসেনজিৎ রাজার কন্যা এবং অযোধ্যা রাজার রানী, তিনি বীর সৈনিকের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মহাকারুণিক বুদ্ধের শিক্ষার প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল এবং তাঁর উপস্থিতিতে তিনি দশটি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ঃ

সত্যিকার জীবনধারণের ব্যবহারিক নির্দেশনা

"হে আমার প্রভু, আমি যতক্ষণ পর্যন্ত না জ্ঞান অর্জন করবো ততক্ষণ পর্যন্ত পবিত্র শীল ভঙ্গ করবো না; আমি কখনও বয়োজ্যেষ্ঠ লোকদের প্রতি বিরূপ আচরণ করবো না; আমি কারো প্রতি রাগান্বিত ভাব প্রদর্শন করবো না।"

"আমি কারো প্রতি হিংসাপরায়ণ হবো না এবং তাদের সম্পত্তির প্রতি লালায়িত হবো না; আমি নিজের মনের প্রতি বা সম্পত্তির প্রতিও স্বার্থপর হবো না; আমি যে সব বস্তু অর্জন করবো তা দিয়ে গরীব লোকদের সুখী করতে চেষ্টা করবো এবং শুধু নিজের ভোগের জন্য তা ধরে রাখবো না।"

"আমি সকল মানুষকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করবো, তাদের যা প্রয়োজন তা দেবো, এবং তাদের সাথে সদয় আচরণ করবো; তাদের পরিস্থিতি বিবেচনায় রাখবো এবং এটা আমার সুবিধার জন্য নয় এমন ধারণায় কোন প্রকার পক্ষপাত মূলক আচরণ না করে তাদের উপকারের জন্য কাজ করবো।"

"যদি আমি কাউকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায়, জেলে বন্দী অবস্থায়, রোগাক্রান্ত বা অন্যান্য কোন ঝামেলায় নিপতিত হতে দেখি, তাদেরকে সেই সমস্যার কারণ ও আইনের ব্যাখ্যা দিয়ে সমস্যা মুক্তির পথ দেখিয়ে সুখী করতে সাহায্য করবো।"

"যদি কেহ জীবিত কোন প্রাণীকে ধরতে চায় এবং তাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করে বা এ সম্পর্কিত কোন শীল ভঙ্গ করে, আমি তাদেরকে শাস্তি প্রদানের প্রয়োজন হলে শাস্তি প্রদান করবো, বা শিক্ষা দেয়ার প্রয়োজন হলে শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করবো, এবং আমি তাদের এরূপ প্রচেষ্টা থেকে নিবৃত্ত করতে ও তাদের ভুল ধরে দিতে সাধ্যাতীত চেষ্টা করবো।"

"আমি প্রকৃত শিক্ষা শ্রবণ করতে ভুলবো না, কারণ আমি যতটুকু জানি, যদি কেউ প্রকৃত শিক্ষাকে অবহেলা করে, তাহলে সে দ্রুত সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হয় এবং সর্বত্র সে সমস্যার সম্মুখীন হয়, পরিশেষে সে জ্ঞান অর্জনের স্তর থেকে দূরে সরে যায়।"

অতঃপর তিনি গরীব লোকদেরকে রক্ষা করার জন্য নিম্নোক্ত তিনটি ইচ্ছা প্রকাশ করলেন ঃ "প্রথমত, আমি সকলকে শান্তিতে রাখতে চেষ্টা করবো। আমি বিশ্বাস করি, আমার এই ইচ্ছায়, আমি জন্মান্তরে যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, ইহাই হবে আমার কুশলের মূল এবং উত্তম শিক্ষার আলোকে প্রজ্ঞা উৎপাদনে সহায়ক।"

"দ্বিতীয়ত, উত্তম শিক্ষায় প্রাজ্ঞতা অর্জনের পরে, আমি তা নিরবিচ্ছিন্নভাবে অন্য লোকদেরকে শিক্ষা দেবো।"

"তৃতীয়ত, আমি আমার নিজের শরীরের বিনিময়ে, জীবনের বিনিময়ে, অথবা সম্পদের বিনিময়ে হলেও প্রকৃত শিক্ষাকে রক্ষা করবো।"

পরিবারিক জীবনের প্রকৃত গুরুত্ব হলো ইহা পরস্পরকে জ্ঞান অর্জনের পথে উৎসাহিত করে এবং সাহায্য করে। এমনকি একজন সাধারণ স্ত্রীলোক, যদি জ্ঞান অর্জনের জন্য একই প্রত্যাশা থাকে, একই প্রতিজ্ঞা ও প্রার্থনা থাকে, তাহলে সেও মল্লিকার ন্যায় বুদ্ধের একজন মহান শিষ্য হতে পারে।

৩

কর্ম সাধন

১। একটি দেশকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে হলে সাতটি শিক্ষা অনুকরণীয় ঃ এগুলোর প্রথমটি হলো, জনগণকে সবসময় সম্মিলিতভাবে রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা করা উচিৎ এবং জাতীয় প্রতিরক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ।

দ্বিতীয়ত, জাতীয় কোন বিষয়ে আলোচনার জন্যে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে একতাবদ্ধভাবে সম্মিলিত হওয়া উচিৎ।

তৃতীয়ত, জনগণকে পুরনো রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিৎ এবং অযৌক্তিকভাবে তা বদলানো উচিৎ নয়। তাদের আনুষ্ঠানিক নীতি নিয়ম ও ন্যায়বিচার রক্ষা করা উচিৎ।

চতুর্থত, তাদের লিঙ্গের পার্থক্য ও বয়োজ্যেষ্ঠদের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করা উচিৎ, এবং পারিবারিক ও সামাজিক পবিত্রতা রক্ষা করা উচিৎ।

পঞ্চমত, তাদেরকে পিতামাতার প্রতি সদয় এবং শিক্ষক ও বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি বিশ্বাসী হওয়া উচিৎ।

ষষ্ঠত, তাদেরকে পুর্বপুরুষদের মন্দির অথবা শ্মশানাদির প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাদের উদ্দেশ্যে বাৎসরিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করা উচিৎ।

সপ্তমত, তাদের উচিৎ জনসাধারণের নৈতিকতার প্রতি শ্রদ্ধা করা, ধার্মিক ব্যক্তিদেরকে সম্মান করা, সম্মানিত শিক্ষকদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং তাদেরকে দান দেয়া।

যদি কোন দেশ এই শিক্ষাগুলো ভালভাবে অনুসরণ করে, নিশ্চিতভাবে সে দেশ উন্নতি লাভ করবে এবং অন্যান্য দেশের শ্রদ্ধা অর্জন করবে।

২। এক সময়ে এক রাজা ছিলেন যিনি খুবই সুচারুরূপে তাঁর রাজ্য শাসন করতেন। তাঁর প্রাজ্ঞতার জন্য তাঁকে ‘মহান আলোকিত রাজা’ বলে ডাকা হতো। তিনি তাঁর প্রশাসনিক নীতিমালাকে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

দেশ শাসনের জন্য একজন শাসকের সঠিক পন্হা হলো আগে নিজেকে শাসন করা। একজন শাসককে তাঁর মৈত্রীময় অন্তর নিয়ে জনগণের সম্মুখে উপস্হিত হতে হবে, এবং তাদের মন থেকে সকল প্রকার অকুশল চিন্তা-চেতনা মুছে ফেলে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার শিক্ষা দান করতে হবে। পৃথিবীর বৈষয়িক সম্পদের মাধ্যমে যে আনন্দ পাওয়া যায়, উত্তম শিক্ষার মাধ্যমে তার চেয়ে অধিক শান্তি পাওয়া যায়।

অতএব, তিনি তাঁর জনগণকে উত্তম শিক্ষা দানের মাধ্যমে তাদের দেহ ও মনের শান্তি রক্ষা করতে পারবেন।

যখন কোন দরিদ্র লোক তাঁর বাড়ীতে আগমন করে তখন তাদের জন্য নিজের ভান্ডার খুলে দেয়া উচিৎ এবং তাদের যা প্রয়োজন তা নিয়ে যেতে দেয়া উচিৎ। সময়ে তাদেরকে প্রজ্ঞা শিক্ষার মাধ্যমে লোভ এবং অকুশল কর্ম পরিহার করার শিক্ষা দেয়া উচিৎ।

মানুষের মনের উপলব্ধির স্তরানুসারে কোন জিনিসের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন মানুষ মনে করে তারা যে শহরে বসবাস করে তা অতীব সুন্দর ও মনোরম, আবার কোন কোন লোক তাকে অপরিস্কার ও পুরানো জীর্ণ অবস্হায় দর্শন করে। এসব তাদের মনের অবস্হার উপর নির্ভর করে।

যারা মনে শ্রদ্ধার সাথে উত্তম শিক্ষাকে ধারণ করে, তারা সাধারণ গাছপালা ও পাথরের মধ্যে সুন্দর ও চকচকে উজ্জ্বল আলো প্রত্যক্ষ করে, লোভী লোকেরা, তাদের মনকে নিয়ন্ত্রণ করার মত যথেষ্ট উপায় জানে না। তাই তারা সোনালী প্রাসাদের রূপ প্রত্যক্ষ করতেও অন্ধের ন্যায় ব্যর্থ।

একই দেশের সকল মানুষের ব্যবহারিক জীবন হলো এক। কারণ তাদের সমস্ত কিছুর উৎস হলো মন। অতএব, শাসকের উচিৎ প্রথমে তাঁর জনগণের মনকে নিয়ন্ত্রণ করার শিক্ষা দেয়া।

৩। প্রাজ্ঞ প্রশাসনের প্রধানতম নীতিমালা হচ্ছে, মহান আলোকিত রাজার মতো, জনগণকে তাদের মানসিক প্রশিক্ষণের প্রতি নমিত করা।

মনকে প্রশিক্ষিত করার অর্থ হলো জ্ঞানের অনুসন্ধানী হওয়া। অতএব, একজন প্রাজ্ঞ শাসককে সর্বপ্রথমে বুদ্ধের শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দেয়া উচিৎ।

যদি বুদ্ধের প্রতি একজন শাসকের বিশ্বাস থাকে, যদি তিনি বুদ্ধের শিক্ষার প্রতি নিবেদিত হন, ধার্মিক ও করুণাময় মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও প্রশংসা প্রকাশ করেন,

তখন বন্ধু অথবা শত্রুদের মাঝে তাঁর গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নই উঠে না; বরং এমন যোগ্য শাসকের গুণে তাঁর দেশ উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করবে।

যদি একটি দেশ উন্নত হয়, তাহলে ঐ দেশ অন্য দেশকে আক্রমণ করার কোন প্রয়োজন নেই। তাই ঐ দেশের জন্যে কোন প্রকারের অস্ত্র-শস্ত্রও প্রয়োজন হয় না।

যখন জনগণ সুখী ও সন্তুষ্ট থাকে, শ্রেণী বৈষম্য তখন বিলুপ্ত হবে, কুশল কাজের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাবে, নৈতিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাবে, সর্বোপরি জনগণ একে অপরকে সম্মান করবে। এতে সকলেই উন্নতি লাভ করবে, আবহাওয়া ও তাপমাত্রা স্বাভাবিক আকার ধারণ করবে। চন্দ্র, সূর্য ও তারকারাজি স্বাভাবিকভাবে তার চতুস্পার্শ্বে আলোকিত করবে। ঝড়-বৃষ্টি সময়মত নেমে আসবে। সকল প্রকার প্রাকৃতিক বিপর্যয় আপনা আপনি দুরীভূত হবে।

৪। একজন শাসকের দায়িত্ব হলো তাঁর জনগণকে রক্ষা করা। তিনি হলেন জনগণের পিতা সদৃশ। তাই আইনের শাসন দ্বারা তিনি তাদেরকে রক্ষা করবেন। বাচ্চারা কান্না করার পূর্বে তাদেরকে যেমনটি পিতা মাতারা ভেজা কাপড় এর পরিবর্তে শুকনা কাপড় পরিহিত করায় তেমনি শাসক নিজের ছেলে মেয়ের ন্যায় জনগণকে যত্ন সহকারে উপযুক্ত করে তুলবেন। এবং তাদেরকে দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করবেন কোন প্রকার অভিযোগ উত্থাপন করার পূর্বে। ইহাও সত্য যে, যদি তাঁর জনগণ দেশে শান্তিতে বসবাস করতে না পারে, তাহলে তাঁর শাসন সঠিক নয়। জনগণ হলো তার দেশের সম্পদ সদৃশ।

সুতরাং, একজন প্রাজ্ঞ শাসক সবসময় তাঁর জনগণের কথা চিন্তা করেন এবং তিনি কখনও তাঁর জনগণের কথা এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে থাকতে পারেন না। তিনি জনগণের কষ্টের কথা চিন্তা করেন এবং তাদের উন্নতির জন্য পরিকল্পনা করেন। প্রাজ্ঞতার সাথে দেশ শাসন করতে হলে তাঁকে সব বিষয়ে উপদেশ দিতে হবে। যেমন- পানি, খরা, ঝড়, ও বৃষ্টি সম্পর্কে তাঁকে উপদেশ দিতে হবে। তাঁকে অবশ্যই শস্য সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে, ভালো ফসল কিভাবে উৎপাদন করা যায়

সে সম্পর্কেও তাঁর ধারণা থাকতে হবে, জনগণের আরাম-আয়েশের দিকে এবং দুঃখ-দুর্দশার দিকেও তাঁকে দৃষ্টি রাখতে হবে। ভালো লোককে তার ভালো কাজের প্রশংসার মাধ্যমে এবং খারাপ লোককে তার খারাপ কাজের শাস্তির মাধ্যমে জনগণকে পরিস্কার করে বুঝিয়ে দিতে হবে এদের দু'য়ের অবস্হান সম্পর্কে।

একজন প্রাজ্ঞ শাসক জনগণের প্রয়োজন অনুযায়ী সাহায্য করেন, আবার যখন জনগণ উন্নতি লাভ করে তখন তাদের কাছ থেকে তা সংগ্রহ করেন। যখন কর আদায় করা হয় তখন তাঁকে অবশ্যই সঠিকভাবে বিবেচনা করে করতে হবে এবং যতটুকু সম্ভব করের বোঝা যাতে হাল্কা হয় সে বিষয়ে বিবেচনা করা উচিৎ। এভাবে তিনি জনগণকে সঙ্গতিপূর্ণ অবস্হায় রাখবেন।

একজন প্রাজ্ঞ শাসক তাঁর ক্ষমতা ও মর্যাদা দ্বারা তাঁর জনগণকে রক্ষা করবেন। যদি কেউ এভাবে দেশের জনগণকে শাসন করে, তাহলে জনগণ তাঁকে সম্মানের সাথে রাজা বলে ডাকবে।

৫। সত্যের রাজা হলেন রাজাদের রাজা। তাঁর রাজত্ব হয় বিশুদ্ধ এবং সর্ব্বোচ্চ। তিনি কেবল মাত্র এই বিশ্বের এক চতুর্থাংশ দেশ শাসন করেন না, আবার তিনি প্রজ্ঞারও প্রভু এবং সকল প্রকার পবিত্র শিক্ষার রক্ষা কর্তাও বটে।

তিনি যেখানে যাবেন সেখানে যুদ্ধ বন্ধ হবে এবং দ্বেষ চিত্ত ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। তিনি সত্যের ক্ষমতা দ্বারা সকলকে নিরপেক্ষভাবে শাসন করেন, এবং সকল অশুভ কিছুকে বিলীন করে দিয়ে সকলের জন্য শান্তি বয়ে আনেন।

সত্যের রাজা কখনো হত্যা করেন না, চুরি করেন না, ব্যভিচার করেন না। তিনি কখনো প্রতারণা করেন না, কটু কথা বলেন না, মিথ্যা ভাষণ করেন না, অর্থহীন কথা বলেন না। তাঁর মন সকল প্রকার লোভ, দ্বেষ ও মোহমুক্ত। তিনি উক্ত দশ প্রকার অকুশল কাজ বর্জন করেন এবং এগুলোর পরিবর্তে দশ প্রকার কুশল কাজ সম্পাদন করেন।

সত্যিকার জীবনধারণের ব্যবহারিক নির্দেশনা

সত্যের উপর ভিত্তি করে তাঁর শাসন পরিচালিত হওয়ার কারণে তিনি অপরাজেয়। যেখানে সত্য উপস্থিত, সেখানে সংঘর্ষ বিলোপ হয় এবং দ্বেষ ভাবও ধ্বংস হয়ে যায়। জনগণের মধ্যে কোন প্রকারের মতপার্থক্য থাকে না, তারা শান্তি ও নিরাপদে দিনাতিপাত করে থাকে; সত্যের কিঞ্চিত উপস্থিতিও তাদের মধ্যে শান্তি ও সুখ আনয়ন করে। সে কারণেই তাঁকে সত্যের রাজা বলে সম্বোধন করা হয়।

যেহেতু সত্যের রাজাই সকল রাজার রাজা, তাই অন্য সকল শাসকেরা তাঁর নামের প্রশংসা করেন এবং তাঁকে উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করে নিজেদের রাজ্য শাসন করেন।

অতএব, সত্যের রাজা সকল রাজার উপর সার্বভৌম ক্ষমতা অর্জন করেন। তাঁর প্রদর্শিত সত্যের পথ অনুসরণ করে তাঁরা তাঁদের জনগণের জন্য শান্তি বয়ে আনেন এবং ধর্মের সাথে তাঁদের দায়িত্ব পরিপূর্ণ করেন।

৬। একজন জ্ঞানী শাসক করুণাপরায়ণ হয়ে বিচার কার্য সম্পাদন করে থাকেন। পঞ্চশীল নীতির ভিত্তিতে তিনি এক একটি ঘটনাকে প্রাজ্ঞতার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

উক্ত পাঁচটি নীতি হলো, প্রথমতঃ, তিনি অবশ্যই উপস্থাপিত ঘটনার সত্যতা পরীক্ষা করবেন।

দ্বিতীয়তঃ, তিনি অবশ্যই নিশ্চিত হবেন যে এটা তাঁর বিচারের আওতাভুক্ত। যদি তিনি পূর্ণ আস্থার মাধ্যমে কোন বিচারের রায় ঘোষণা করেন, তবে তা হবে কার্যকর। কিন্তু তিনি যদি এর বিপরীত করেন, তাহলে তা হবে জটিলতা সৃষ্টি করা মাত্র। সঠিক কারণগুলো জানার জন্য তাঁকে অপেক্ষা করা উচিৎ।

তৃতীয়তঃ, তিনি সঠিকভাবে বিচার করবেন। এর অর্থ হলো, তিনি অবশ্যই অপরাধীর মনের মধ্যে প্রবেশ করবেন। যদি তিনি বুঝতে পারেন যে, অপরাধীর দৃষ্টিকোণ থেকে সে এই অপরাধ সংগঠিত করেনি, তাহলে তিনি তাকে মুক্তি

দেবেন।

চতুর্থতঃ, তিনি রূঢ়ভাবে বিচারের ফলাফল প্রকাশ না করে মৈত্রীর মাধ্যমে প্রকাশ করবেন। এর অর্থ হলো, তিনি বিচারে যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা করবেন কিন্তু তাঁর সীমা অতিক্রম করবেন না। একজন আদর্শবান শাসক মৈত্রীর দ্বারা অপরাধীকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন এবং তাকে নিজের ভুল গভীরভাবে বিবেচনা করার জন্য সময় দিয়ে থাকেন।

পঞ্চমতঃ, তিনি রাগভাবের দ্বারা নয় বরং করুণাভাবের মাধ্যমে বিচার কার্য সম্পাদন করবেন। এর অর্থ হলো, তিনি অপরাধকে শাস্তি দেবেন কিন্তু অপরাধীকে নয়। করুণার উপর ভিত্তি করেই তিনি তাঁর বিচার কাজকে পরিচালিত করবেন এবং অপরাধীকে তার অপরাধ সম্পর্কে অনুধাবন করার জন্যে ব্যবস্থা গ্রহণে সচেষ্ট হবেন।

৭। যদি রাজ্যের কোন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী তাঁর দায়িত্বে অবহেলা করেন, নিজের লাভের ইচ্ছায় কাজ করেন বা চুরির আশ্রয় নেন, তা দ্রুত জনসাধারণের নৈতিকতা নষ্ট করে দেয়। লোকেরা একে অপরকে প্রতারণা করে, দুর্বল লোকেরা সবল লোকদেরকে আক্রমন করে, একজন শক্তিশালী ব্যক্তি সাধারণ ব্যক্তির উপর দুর্ব্যবহার করে বা একজন ধনীলোক গরীবের অসহায়ত্বের সুযোগ নেবে, এমনটি হলে কারো জন্য কোন বিচার অবশিষ্ট থাকবে না। অসদাচরণ সীমা ছেড়ে গেলে সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে বহুমুখী।

এরূপ পরিস্থিতিতে, বিশ্বাসী মন্ত্রীগণ জনসেবা থেকে দূরে সরে যাবে, জ্ঞানী ব্যক্তিগণ জটিলতার ভয় থেকে দূরে সরে থাকবে, এবং তোষামোদকারীরাই রাজ্য ক্ষমতা পরিচালনা করতে থাকবে। তারা জনগণের ভোগান্তির কথা বিবেচনা না করে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে।

এরূপ অবস্থাতে সরকারের ক্ষমতা অকার্যকর হয়ে পড়ে এবং শাসন নীতি ধ্বংসে নিপাতিত হয়।

সত্যিকার জীবনধারণের ব্যবহারিক নির্দেশনা

এরূপ অবিবেচক কর্মকর্তারা জনগণের সুখকে চোরের ন্যায় হরণ করে। তারা চোরের চেয়েও অধম, কারণ একজন শাসক হিসেবে ও একজন মানুষ হিসেবে উভয় দিক থেকে তারা প্রতারক এবং জাতীয় সমস্যার কারণ। রাজার উচিৎ এসকল কর্মকর্তার মূলোৎপাটন করা এবং তাদের শাস্তি দেয়া।

যদি কোন দেশ ভাল রাজার দ্বারা বা সঠিক আইনের দ্বারা শাসিত হয়, এখানে অন্য এক ধরনের আনুগত্যের সৃষ্টি হয়। দেখা যায় যে, কোন কোন ছেলে/মেয়েরা যারা পিতা-মাতা দ্বারা সুদীর্ঘ বৎসর ধরে লালন পালন ও সেবা শুশ্রুষা লাভ করেছে তারা ঐ পিতা-মাতার কথা ভুলে গিয়ে কেবল নিজেদের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসায় মত্ত হয়ে পড়ে। তারা পিতা-মাতাকে অবহেলা করে, তাদের নিজ সম্পত্তি থেকে অধিকার বঞ্চিত করে এবং তাঁদের শিক্ষাকে অবহেলা করে। এরূপ সন্তানকে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে ধূর্ত বলা যায়।

কেন তাদেরকে এরূপ বলা হয় ? কারণ তারা পিতা-মাতার প্রতি কৃতঘ্ন। যাদের সুদীর্ঘ জীবনের প্রদত্ত ভালবাসা ছিল মহৎ। সেই ভালবাসার দান শোধ করা যাবে না, যদিও সে সারা জীবন তাঁর পিতা-মাতাকে সম্মান করে ও সেবা শুশ্রষার মাধ্যমে দয়া প্রদর্শন করে। একইভাবে যারা তাদের শাসকের প্রতি অনুগত ও কৃতজ্ঞ নয় এবং পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞপরায়ণ নয়, তাদেরকে অধম অপরাধী হিসেবে শাস্তি দেয়া উচিৎ।

এমনকি যদি কোন দেশ ভাল রাজা এবং সঠিক আইন দ্বারা শাসিত হয়, তবুও সেখানে অন্য এক ধরনের আনুগত্যের সৃষ্টি হয়। যেমন, কোন কোন লোক আছে যারা বুদ্ধ রত্ন, ধর্ম রত্ন এবং সংঘ রত্নের মতো অমূল্য রত্নত্রয়ের কথা সম্পূর্ণ ভুলে যান। এরূপ লোকেরা দেশের পবিত্রতা নষ্ট করে, পবিত্র ধর্ম গ্রন্থাদিতে অগ্নি সংযোগ করে, প্রকৃত শিক্ষকদেরকে তাদের নিজেদের হীনস্বার্থে ব্যবহার করে। এভাবে বুদ্ধের পবিত্র শিক্ষাকে তারা অবমাননা করে। তাই তারাও অধম অপরাধীদের দলভুক্ত।

এরূপ কেন হয়? কারণ তারা তাদের জাতীয় আধ্যাত্মিক বিশ্বাসকে ধ্বংস করেছে, যা তাদের মূলভিত্তি ও পুণ্য অর্জনের উৎস স্বরূপ। এরূপ লোক যারা অন্যের

বিশ্বাসে আগুন ধরে দেয়, তারা নিজেরাই নিজেদের শ্মশান রচনা করছে।

তুলনামূলকভাবে অন্যান্য অকুশল কর্মগুলোকেও এমন অনানুগত্যের আলোকে আলোচনা করা যায়। এ সকল অনানুগত অপরাধীদেরকেও মারাত্নক শাস্তি দেয়া উচিৎ।

৮। একজন ভাল শাসক যিনি দেশকে সঠিক আইনের মাধ্যমে শাসন করেন, তাঁর বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র হতে পারে বা বৈদেশিক শত্রুও তাঁর দেশের উপর হামলা করতে পারে। এরূপ পরিস্থিতিতে শাসককে তিনটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিৎ।

তাঁকে সিদ্ধান্ত করতে হবে যে, "প্রথমতঃ, এসকল ষড়যন্ত্রকারীরা বা বৈদেশিক শত্রুরা সুশাসন এবং দেশের কল্যাণের জন্য হুমকি স্বরূপ; আমার অবশ্যই উচিৎ জনগণকে এবং দেশকে রক্ষা করা, এমনকি প্রয়োজনে সেনা ও অস্ত্রের সাহায্যে হলেও।"

"দ্বিতীয়তঃ, অস্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে আমি তাদেরকে দমনে অন্য যে কোন উপায় অনুসন্ধান করবো।"

"তৃতীয়তঃ, আমি তাদেরকে হত্যা না করে, জীবিত অবস্থায়, এবং নিরস্ত্র অবস্থায় পরাভূত করার চেষ্টা করবো।"

এ তিনটি সিদ্ধান্তকে প্রয়োগ করে উপযুক্ত পদে উপযুক্ত লোক নিয়োগ দিয়ে এবং নির্দেশনা দিয়ে রাজা জ্ঞান দূরদর্শিতার মাধ্যমে সমস্যার মোকাবেলা করতে পারেন।

এভাবে অগ্রসর হলে, দেশ এবং তার সৈন্যরা রাজার প্রাজ্ঞতা এবং আত্ন-সম্মানবোধের দ্বারা উৎসাহিত হবেন এবং দৃঢ়তা ও মহত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেন। যখন সৈন্যদেরকে ডাকার প্রয়োজন পড়বে, তখন তাঁরা সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধের কারণ এবং এর প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অনুধাবন করতে পারবেন। ফলে, তাঁরা সাহস ও আনুগত্যের সাথে যুদ্ধের মাঠে গমন করবেন। তাঁরা রাজার দূরদর্শিতা

সত্যিকার জীবনধারণের ব্যবহারিক নির্দেশনা

জ্ঞানকে সম্মান করবেন এবং রাজ্যের সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়ী হবেন। এরূপ যুদ্ধ দেশের জন্য শুধু বিজয়ই বয়ে আনবে না বরং সম্মানও বর্ধিত করবে।

৩য় পরিচ্ছেদ

বুদ্ধভূমি গঠন

১

ভ্রাতৃসংঘের মধ্যে সহনশীলতা

১। চলুন আমরা একটি মরুভূমির ন্যায় দেশের কথা কল্পনা করি, যা সম্পূর্ণরূপে অন্ধকারের মধ্যে ডুবে আছে এবং যেখানে অসংখ্য প্রাণী গভীর অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে।

স্বাভাবিকভাবে তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে, যেহেতু তারা রাত্রে একে অপরকে না চিনেই দৌড়াচ্ছে। তাই তারা হতাশা ও একাকীত্ব বোধ করবে। প্রকৃতপক্ষে, ইহা একটি করুণ চিত্র।

অতপর চলুন আমরা কল্পনা করি, হঠাৎ এক মহৎ ব্যক্তি টর্চ নিয়ে সেখানে আবির্ভূত হলেন এবং তাঁর চতুর্দিকের সমস্ত কিছুই আলোকোজ্জ্বল হয়ে পরিস্কারভাবে দেখা দিল।

এতে অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবিত প্রাণীগুলো হঠাৎ করে মুক্তির সন্ধান পেল, কারণ তারা একে অপরকে চিনতে পারলো এবং একে অন্যের সাথে এই মুক্তির স্বাদ ভাগাভাগি করে উপভোগ করলো।

এ কাহিনীর "মরুভূমির দেশ" দ্বারা মানব জগতকে বুঝানো হয়েছে, যখন তা তৃষ্ণার অন্ধকারে আবৃত হয়ে থাকে। যাদের মনের মধ্যে প্রজ্ঞার আলো নেই তারা একাকীত্ব ও ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। তারা একাকী জন্মগ্রহণ করেও একাকী

মৃত্যুবরণ করে। তারা জানে না কিভাবে তাদের বন্ধুদের সাথে মিলিত হতে হয় এবং কিভাবে শান্তিতে ও মিলেমিশে বাস করতে হয়, এবং তারা স্বভাবতই হতাশাগ্রস্ত ও ভীত।

"একজন টর্চবহনকারী মহৎ ব্যক্তি'র" দ্বারা মানবীয় অবয়বে বুদ্ধকে বুঝানো হচ্ছে, এবং তিনি তাঁর প্রজ্ঞার আলোকে ও করুণার দ্বারা এই পৃথিবীর অন্ধকার দূরীভূত করতে পারেন।

এই আলোর মাধ্যমে জনগণ নিজেদেরকে এবং অন্যদেরকেও দেখতে পায়। এতে একে অপরের সাথে সৌভ্রাতৃত্বপূর্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্হাপন করতে পারে।

কোন কোন সম্প্রদায়ে হাজার হাজার লোক বাস করতে পারে, কিন্তু তা প্রকৃত সৌভ্রাতৃত্ব নয়, যতক্ষণ না তারা একে অপরকে না জানে; বা একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল না হয়।

একটি আদর্শ সম্প্রদায় বিশ্বাস ও প্রজ্ঞার দ্বারা আলোকিত হয়। ইহা এমন একটি স্হান যেখানে লোকজন একে অপরকে জানে এবং সামাজিক ঐকমত্য বিরাজ করে।

বস্তুতপক্ষে, ঐকমত্য হলো জীবন এবং এর প্রকৃত অর্থ হলো সত্যিকার সম্প্রদায় বা সংগঠন।

২। সংগঠনের মধ্যে তিন প্রকারের সংগঠন দেখা যায়। প্রথমতঃ, কোন কোন সংগঠন ক্ষমতা, সম্পদ বা মহান ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে গঠিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন সংগঠন আছে যেগুলো সদস্যদের সুবিধানুযায়ী গঠিত হয়, ঐ সকল সংগঠন সদস্যদের সুযোগ-সুবিধা ও সন্তুষ্টি, বিবাদ না করে যতদিন পর্যন্ত ধরে রাখা যাবে, ততদিন পর্যন্ত রক্ষা করতে পারবে।

তৃতীয়তঃ, এমন কিছু সংগঠন আছে যেগুলো কিছু আদর্শ শিক্ষার মাধ্যমে সংগঠিত হয় এবং ঐ শিক্ষা ও ঐক্যমতই ইহার প্রাণ স্বরূপ।

অবশ্যই শেষোক্ত সংগঠন হলো প্রকৃত সংগঠন, যেখানে সদস্যগণ একই মতাদর্শে কাজ করে থাকে, যেখান থেকে একতাশক্তি ও বিভিন্ন গুণাবলী সৃষ্টি হয়। এরূপ সংগঠনের মধ্যে ঐক্যতা, সন্তুষ্টি ও সুখ বিরাজ করবে।

জ্ঞান হলো বৃষ্টি স্বরূপ, যা পর্বতের উপর পতিত হয়, এবং খাঁজে জমা হয়ে ছোট ছোট স্রোত হিসেবে নিম্ন দিকে প্রবাহিত হয়ে নদীর সাথে মিলিত হয় এবং পরিশেষে সাগরের সাথে একত্রিত হয়।

আদর্শ শিক্ষা স্বরূপ বৃষ্টি মানুষের অবস্হা বা পরিস্হিতি বিবেচনা না করেই সকল লোকের উপর সমানভাবে পতিত হয়। যারা ইহা গ্রহণ করে তারা ছোট দলে সংগঠিত হয়, তারপর সংগঠনে রূপ নেয় এবং পরবর্তীতে সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। পরিশেষে, তারা নিজেদেরকে জ্ঞানের মহাসাগরে আবিস্কার করতে সক্ষম হয়।

এসকল মানুষের মন, দুধ ও পানির মিশ্রণের ন্যায়, যা শেষ পর্যন্ত মহা ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে সকলকে আবদ্ধ করে।

অতএব, এভাবে আদর্শ শিক্ষা হলো একটি আদর্শ সংগঠনের মৌলিক চাহিদা। পূর্বেই যা উল্লেখ করা হয়েছে, ইহা হলো আলো সদৃশ, যার দ্বারা জনগণ একে অপরকে চিনতে পারে, একে অপরের সাথে মিলিত হতে পারে, এবং এতে করে তারা তাদের মন হতে অকুশল চিন্তাগুলো বাদ দিয়ে একতা, শান্তি ও সম্প্রীতির মধ্যে দিনাতিপাত করতে পারবে।

এভাবে, যে সংগঠনগুলো বুদ্ধের প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে সংগঠিত হয়েছে সেগুলোকে ভ্রাতৃসংঘ বলা হয়।

বুদ্ধভূমি গঠন

তাদের উচিৎ বুদ্ধের শিক্ষাগুলো অনুসরণ করা এবং অনুরূপভাবে তাদের মনকে প্রশিক্ষণ দেয়া। এতে করে, সবাই তাত্ত্বিকভাবে বুদ্ধের ভ্রাতৃসংঘের সদস্য হতে পারবে। কিন্তু বাস্তবতার দিক থেকে, যারা একই ধর্মে বিশ্বাসী তারাই শুধু সদস্য হবেন।

৩। বুদ্ধের ভ্রাতৃসংঘের মধ্যে দু'ধরনের সদস্য থাকবেন, এদের প্রথম প্রকার হলো, যারা গৃহী সদস্যদের শিক্ষা দেবেন, এবং দ্বিতীয় প্রকার হলো, যারা শিক্ষকদেরকে তাঁদের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য, বাসস্হান, ঔষধপথ্য ও পোষাকাদি দান দিয়ে সহযোগিতা করেন। তারা একত্রে বুদ্ধ শিক্ষাকে এভাবে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেবে এবং তা চলমান রাখবে।

অতঃপর, ভ্রাতৃত্বসংঘকে পূর্ণাঙ্গ করার জন্য সদস্যদের মধ্যে যথাযথ সৌহাদ্য অবশ্যই থাকতে হবে। শিক্ষকেরা সদস্যদেরকে শিক্ষা দেন এবং সদস্যরা শিক্ষকদেরকে সম্মান করে, এতে তাদের মধ্যে সৌহাদ্য রক্ষা পাবে।

বুদ্ধের ভ্রাতৃসংঘকে একে অপরের প্রতি স্নেহভাবাপন্ন ও সহনশীল হওয়া উচিৎ, বন্ধুভাবাপন্ন অনুসারী হিসেবে একত্রে বাস করা উচিৎ, এবং একই ভাবাদর্শে পূর্ণ হওয়া উচিৎ।

৪। ছয়টি কারণ আছে যেগুলোর দ্বারা ভ্রাতৃসংঘ সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে। এগুলো হলো, প্রথমতঃ, কথাবার্তায় আন্তরিকতা, দ্বিতীয়তঃ, দায়িত্বের প্রতি আন্তরিকতা ও দয়াভাব, তৃতীয়তঃ, মতাদর্শের প্রতি আন্তরিকতা ও সহানুভূতি, চতুর্থতঃ, সাধারণ সম্পত্তির সম বিভাজন, পঞ্চমতঃ, একইভাবে বিশুদ্ধ শীল প্রতিপালন এবং ষষ্টতঃ, সকলকে সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন হতে হবে; তথা আপন কাজ ও তার ফলের প্রতি এবং জন্মান্তরের প্রতি অগাধ বিশ্বাসী হতে হবে।

এগুলোর মধ্যে ষষ্ঠটি বা "সকলকে সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন হতে হবে" হচ্ছে পরমাণুর পিণ্ডীভূত অংশের ন্যায় এবং অপর পাঁচটি তার আবরণ সদৃশ কাজ করে।

ভ্রাতৃসংঘকে সফল হতে হলে দু'অংশে বিভক্ত সাতটি নীতিমালা অনুসরণ করা উচিৎ। এদের প্রথম অংশটি হলোঃ

(১) তাদের প্রায় সময় একত্রে মিলিত হওয়া উচিৎ, ধর্ম শিক্ষা শ্রবণ ও আলোচনা করা উচিৎ।
(২) তাদের মুক্ত মনে মেলামেশা করা উচিৎ এবং একে অপরকে শ্রদ্ধা করা উচিৎ।
(৩) তাদের ধর্মশিক্ষাকে শ্রদ্ধা করা উচিৎ এবং নীতিকে সম্মান করা ও এগুলোকে পরিবর্তন না করা উচিৎ।
(৪) বয়োজ্যেষ্ঠ ও বয়োকনিষ্ঠ সদস্যরা একে অপরের প্রতি সৌজন্যতা বজায় রেখে সম্পর্ক রক্ষা করা উচিৎ।
(৫) তাদের আচরণে আন্তরিকতা ও ভক্তির চিহ্ন থাকা উচিৎ।
(৬) তাদের উচিৎ নীরব স্হানে বসে নিজেদের মনকে পরিশুদ্ধ করা, এবং অন্য জনগণকেও করতে দেয়া।
(৭) তাদের উচিৎ সকল মানুষকে ভালবাসা, অতিথিদেরকে আন্তরিকতার সাথে ব্যবহার করা, এবং অসুস্হদের প্রতি সদয় ব্যবহার করা।

যদি ভ্রাতৃসংঘ উল্লেখিত নিয়মগুলো মেনে চলে, তাহলে তাদের কখনও অবনতি হবে না।

দ্বিতীয় অংশটি হলো, ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের উচিৎ (১) বিশুদ্ধ ভাবাদর্শ রক্ষা করা এবং একসাথে অনেক কিছুর সাথে জড়িত না হওয়া; (২) ন্যায়পরায়ণতা ও সকল প্রকার লোভ ত্যাগ করে বসবাস করা; (৩) ধৈর্য্য ধারণ করা এবং তর্ক না করা; (৪) নীরবতা পালন করা ও অনর্থক কথা না বলা; (৫) নীতির প্রতি অনুগত থাকা ও অশ্রদ্ধাপরায়ণ না হওয়া; (৬) মনকে একনিষ্ঠভাবে ধরে রাখা ও ভিন্ন শিক্ষা অনুসরণ না করা; এবং (৭) দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় সংযমী ও মিতব্যয়ী হওয়া।

যদি উল্লেখিত নিয়মগুলো সদস্যরা মেনে চলে, তাহলে ভ্রাতৃত্ববোধ দীর্ঘস্হায়ী হবে এবং কখনও অবনতি হবে না।

বুদ্ধভূমি গঠন

৫। উপরের বর্ণনানুসারে, ভ্রাতৃসংঘের মধ্যে সর্বপ্রথমে সৌর্হাদ্য রক্ষা করা উচিৎ। সুতরাং, সৌর্হাদ্য ব্যতিরেকে ভ্রাতৃত্ববোধের জন্ম হয় না। প্রত্যেক সদস্যগণ একে অপরকে রক্ষা করবে, কিন্তু বিরোধীতা করবে না। যদি বিরোধীতা দেখা দেয়, তাহলে তা অতি সহসা মীমাংসা করা উচিৎ। কারণ বিরোধীতা অতি সহসা যে কোন সংগঠনকে ধ্বংস করে দেয়।

অতিরিক্ত রক্তের দ্বারা রক্তের দাগ মোচন করা যায় না; অতিরিক্ত ক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে রোধ করা যায় না; ক্রোধকে দমন করা যায়, একমাত্র তাকে দমন করার মাধ্যমে।

৬। কালামিতি নামে একরাজা ছিলেন; যাঁর দেশ পার্শ্ববর্তী যুদ্ধবাজ রাজা ব্রম্মদত্ত কর্তৃক দখলীকৃত হয়েছিল। রাজা কালামিতি, তাঁর স্ত্রী পুত্রসহ কিছু দিন লুকানো অবস্থায় বন্দী হয়েছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাঁর পুত্র, যুবরাজ, পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

যুবরাজ তাঁর পিতাকে বাঁচাতে কিছু উপায় উদ্ভাবন করতে চেয়েও ব্যর্থ হলেন। তাঁর পিতার মৃত্যুদণ্ডের দিন, যুবরাজ ছদ্মবেশে নিজেকে মৃত্যুদণ্ডের স্থানে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন, যেখানে তিনি কিছুই করতে পারছিলেন না, শুধু তাঁর দুর্দশাগ্রস্ত পিতার করুণ মৃত্যু, হতাশাগ্রস্ত নেত্রে অবলোকন করছিলেন।

তাঁর পিতা এমন আতঙ্কিত অবস্থার মধ্যেও তাঁর ছেলেকে চিনতে পেরেছিলেন এবং অস্পষ্ট ভাষাতে নিজেই নিজেকে বলার ন্যায় করে বলছিলেন, "দীর্ঘ সময় ধরে সন্ধান করবে না; দ্রুততার সাথে কিছু করবে না; ক্রোধকে কেবল মাত্র শান্তভাবের মাধ্যমেই দমন করা যায়।"

অতঃপর, দীর্ঘ সময় ধরে যুবরাজ প্রতিশোধের উপায় খোঁজছিল। পরিশেষে, সে রাজা ব্রম্মদত্তের প্রাসাদে পরিচারক হিসেবে চাকুরীতে নিযুক্ত হলো এবং রাজার অনুকম্পা লাভে সক্ষম হলো।

একদিন রাজা যখন শিকারে বের হলেন, যুবরাজ তখন প্রতিশোধের উপায় খুঁজছিলো। যুবরাজ তাঁর প্রভুকে একটি নির্জন স্থানে নিয়ে যেতে সক্ষম হলো, এবং তখন রাজা খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। যুবরাজকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে রাজা যুবরাজের কোলে তাঁর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন।

যুবরাজ তাঁর ছুরি বের করলো এবং তা রাজার গ্রীবায় বসিয়ে দিলো কিন্তু পরক্ষণে সে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লো। তার পিতার মৃত্যুদন্ডের সময়ে ব্যক্ত কথাগুলো তার মনে পড়লো, তারপরেও সে পুনঃ চেষ্টা করেও রাজাকে হত্যা করতে ব্যর্থ হলেন। হঠাৎ রাজা জাগ্রত হলো এবং যুবরাজকে বললেন, তিনি খারাপ স্বপ্ন দেখেন যে রাজা কালামিতির পুত্র তাঁকে হত্যা করতে চেষ্টা করছে।

যুবরাজ ছুরিটি তাঁর হাতে তুলে নিয়ে, রাজাকে দ্রুতগতিতে আঁকড়ে ধরলো এবং নিজেকে কালামিতি রাজার পুত্র বলে জানালো। তারপর সে বললো যে, শেষ পর্যন্ত তার পিতার প্রতিশোধ নেবার সময় এসেছে। কিন্তু তবুও সে রাজাকে হত্যা করতে পারলো না এবং হঠাৎ সে ছুরি ফেলে দিয়ে রাজার সম্মুখে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

যখন রাজা যুবরাজ থেকে তার পিতার শেষ কথাগুলো শুনলেন, তখন তিনি খুবই সন্তুষ্ট হলেন এবং যুবরাজের নিকট ক্ষমা চাইলেন। পরবর্তীতে, রাজা যুবরাজকে পূর্বের রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন এবং পার্শ্ববর্তী দু'টি দেশের মধ্যে দীর্ঘ দিন ধরে বন্ধুত্বতার সম্পর্ক বজায় থাকলো।

মৃত্যুপথযাত্রী রাজা কালামিতির বক্তব্য ছিলো, "দীর্ঘ সময় ধরে অনুসন্ধান করবে না," মানে দীর্ঘ সময় ধরে মনে শত্রুতাকে পোষণ করা উচিৎ নয়, এবং "দ্রুততার সাথে কিছু করবে না" মানে বন্ধুত্বতা দ্রুততার সাথে নষ্ট করা উচিৎ নয়-একেই বুঝানো হয়েছে।

শত্রুতা দ্বারা কখনও শত্রুতা উপশম হয় না; একমাত্র একে ভুলার মাধ্যমেই এটা সম্ভব।

বুদ্ধভূমি গঠন

ভ্রাতৃসংঘের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সাধারণত সম্যক শিক্ষার সমন্বয়ের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠে। প্রত্যেক সদস্যদের উচিৎ এই কাহিনীর শিক্ষাকে প্রশংসা করা।

কেবলমাত্র ভ্রাতৃসংঘের সদস্যরা নয় সাধারণ মানুষেরও উচিৎ এই কাহিনীর শিক্ষাকে প্রশংসা করা এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনে এই শিক্ষা অনুশীলন করা।

২

বুদ্ধ ভূমি

১। যেভাবে উপরে বর্ণনা করা হয়েছে, যদি ভ্রাতৃসংঘ তাঁদের দায়িত্ব হিসেবে বুদ্ধের শিক্ষাকে প্রচার ও প্রসারে সমন্বয় জীবন ধারার কথা ভুলে না যান, তাহলে এর সদস্য সংখ্যা বাড়তেই থাকবে এবং তাঁদের শিক্ষাও অনেক বিস্তৃতি লাভ করবে।

এর অর্থ হলো, অনেক লোক জ্ঞানের অনুসন্ধানী হবেন। তদুপরি, তৃষ্ণা ও কাম-লালসা দ্বারা পরিচালিত লোভ, দ্বেষ ও মোহ নামক অকুশল রিপুবাহিনী পশ্চাদপসারণ করতে শুরু করবে। তখন প্রজ্ঞার আলো, বিশ্বাস ও আনন্দ এসে উক্ত স্হান পরিপূরণ করবে।

অকুশল সদৃশ অবিদ্যা-তৃষ্ণা, তাড়না, যুদ্ধ, অস্ত্র, ও রক্তক্ষরণ দ্বারা আধিপত্য বিস্তার করে। যার ফলশ্রুতিতে, হিংসা, কুসংস্কার, ঘৃণা, প্রতারণা, চাটুকারিতা, তোষামোদ, গোপনীয়তা এবং অপব্যবহার ইত্যাদি পাপে পরিপূর্ণতা লাভ করে মানুষের মনোজগৎ।

ধরা যাক্, প্রজ্ঞার আলোকে শয়তানের রাজ্যকে আলোকিত করা হলো, এবং তার উপরে করুণার বৃষ্টি পতিত হলো। এতে বিশ্বাসের শিকড় গজাতে লাগলো, সর্বোপরি, এগুলোর মাধ্যমে আনন্দের ফল্গুধারা চতুর্দিকে সুগন্ধী ছড়াতে লাগলো।

আসবে।

শান্ত মৃদু বাতাস এবং গাছের শাখায় কিছু মুকুল যেমন বসন্তের আগমনী বার্তা জানিয়ে দেয়, তেমনিভাবে, একজন লোক যখন জ্ঞান অর্জন করেন, তখন ঘাস, বৃক্ষ, পর্বত, নদী এবং অন্যান্য সকল বস্তুই যেন নতুন জীবন লাভ করে মুখরিত হয়ে উঠে।

যদি একজন মানুষের মন পবিত্র হয়ে উঠে, তাহলে তার চতুর্দিকও তখন পবিত্র হয়ে উঠে।

২। যেখানে পবিত্র শিক্ষা বিদ্যমান, সেখানে সকলেই পবিত্রতার সাথে ও শান্ত মনে বসবাস করে। প্রকৃতপক্ষে, বুদ্ধের করুণা নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রত্যেককে উপকৃত করে, এবং তাঁর পবিত্র আলোকোজ্জ্বল শিক্ষাকে স্মরণ করার দ্বারা তাদের মন থেকে সকল প্রকার অকুশল দুরিভূত হয়ে যাবে।

একটি পবিত্র মন শীঘ্রই গভীর মনে পরিণত হয়, ইহা আর্য পথের অনুরূপ, ইহা দান দিতে ভালবাসে, ইহা শীল রক্ষা করতে ভালবাসে, একটি ধৈর্য্যশীল মন, একটি উদ্দমশীল মন, একটি শান্ত মন, একটি জ্ঞান সম্পন্ন মন, একটি করুণা সম্পন্ন মন যা মানুষকে বিভিন্ন দক্ষ উপায়ে জ্ঞান অর্জনের দিকে নিয়ে যায়। এভাবে বুদ্ধভূমি সৃষ্টি করা সম্ভব হয়।

উপরোক্ত প্রকারে একটি বাড়ী, যা স্বামী, স্ত্রী ও পুত্র কন্যা নিয়ে গঠিত, তা কালক্রমে রূপান্তরিত হয়ে এমন একটি বাড়ীতে পরিণত হয়, যেখানে বুদ্ধ উপস্থিত থাকেন। একটি দেশ, যা সামাজিক ভিন্নতার কারণে দুর্ভোগের সম্মুখীন হয় কিন্তু তাও একইভাবে পরিবর্তিত হয়ে মৈত্রীযুক্ত সৌর্হাদ্যপূর্ণ স্থানে পরিণত হয়।

একটি সুবর্ণ প্রাসাদ যা রক্তের দাগে রঞ্জিত তা কখনো বুদ্ধের বাসস্থান হতে পারে না। কিন্তু একটি ছোট কুঠির যেখানে ছাদের ছিদ্র দিয়ে চাঁদের আলো প্রবেশ

করে তা উপরোক্ত গুণাবলীর অনুশীলনে এমন এক স্থানে রূপান্তরিত হতে পারে, যেখানে বুদ্ধ অবস্থান করতে পারেন, তবে সর্বাগ্রে ঐ গৃহকর্তার মন পবিত্র হতে হবে।

যখন একজন মানুষের মনে পবিত্রতার ভিত্তিতে বুদ্ধভূমি রচিত হয়, তখন ঐ মন নিজে নিজে স্বগোত্রিয় অন্য মনকে টেনে আনবে এবং সৌহার্দপূর্ণ অবস্থায় ভ্রাতৃত্বভাব গড়ে তুলবে। বুদ্ধের প্রতি বিশ্বাস স্বতন্ত্রলোক থেকে পরিবারে প্রসারিত হয়, পরিবার থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে শহরে, শহর থেকে বড় শহরে, বড় শহর থেকে দেশে এবং পরিশেষে সমগ্র বিশ্বে প্রসারিত হয়।

বস্তুতপক্ষে, ধর্মীয় শিক্ষা প্রসারে আন্তরিকতা এবং বিশ্বস্ততাই বুদ্ধভূমি গঠন করতে পারে।

৩। ইহাই সত্য যে, যখন আমরা এই পৃথিবীকে এক দিক থেকে দেখি, এ পৃথিবীটা লোভ, অবিচার, রক্তপাত ইত্যাদি অকুশল কর্ম দ্বারা পরিপূর্ণ; আবার অন্য দিক থেকে যদি দেখি, মানুষেরা বুদ্ধের জ্ঞানকে বিশ্বাস করছে, তখন বিশ্বাস করতে হবে, অবশ্যই একদিন এই রক্ত দুধে রূপান্তরিত হবে, লোভ করুণায় পরিণত হবে, এবং সর্বোপরি, সমগ্র অকুশল ভূমি বুদ্ধের পবিত্র ভূমিতে পরিণত হবে।

একটি ছোট বালতি দিয়ে সাগর সেচ করা কঠিন কাজ মনে হতে পারে, কিন্তু মনে যদি দৃঢ়তা থাকে, এমনকি অনেক অনেক জীবন অতিবাহিত হলেও এই মনের দ্বারা সে একদিন বুদ্ধজ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হবে।

বুদ্ধ অন্য এক পথে অপেক্ষা করছেন; তা হলো তাঁর জ্ঞান-মার্গ; যেখানে কোন লোভ নেই, দ্বেষ নেই, অতৃপ্ত আকাঙ্খা নেই, দুঃখ নেই, নেই কোন যন্ত্রণা, কিন্তু যেখানে আছে শুধু প্রজ্ঞার আলো এবং করুণার বৃষ্টি।

ইহা শান্তির স্থান, যারা দুঃখ ভোগ করছে, কষ্ট ভোগ করছে ও যন্ত্রণা ভোগ করছে তাদের জন্য শরণ গ্রহণ করার স্থান; যারা ধর্ম প্রসারে একটু বিশ্রাম নিতে চান, এটা

তাদের জন্য বিশ্রামের স্থান।

এই শুদ্ধাবাসে অসংখ্য আলো এবং চিরঞ্জীব প্রাণীর বাস। যাঁরা এ রাজ্যে আগমন করেন তাঁরা কখনও মোহের রাজ্যে ফিরে যান না।

প্রকৃতপক্ষে, এই শুদ্ধাবাস যেখানে পুষ্প বাতাসে সুগন্ধী ছড়ায় প্রজ্ঞার মাধ্যমে এবং পাখীরা তাদের কলরবের দ্বারা পবিত্র ধর্ম গান পরিবেশন করে, ইহা সকল মানুষের শেষ গন্তব্যস্থল।

৪। যদিও এই বুদ্ধভূমি বিশ্রামের স্থান, কিন্তু ইহা অলসতার স্থান নয়। এই স্থানের সুগন্ধীযুক্ত ফুলের বিছানা আলস্য ও শ্রমবিমূখ ব্যক্তির জন্য নয়, এই স্থান হলো সতেজতা ও বিশ্রামের জন্য, যেখানে পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করবে এবং প্রবল আগ্রহের সাথে বুদ্ধের জ্ঞানকে প্রচারে নিয়োজিত হবে।

বুদ্ধের ধর্ম চিরস্থায়ী। যতদিন পর্যন্ত মানব সমাজের অস্তিত্ব থাকবে এবং প্রাণী জগতের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকবে, যতদিন পর্যন্ত স্বার্থপর এবং কলুষিত মন তাদের নিজেদের বিশ্ব ও পারিপার্শ্বিকতা সৃষ্টি করবে, ততদিন পর্যন্ত বুদ্ধ ধর্মের প্রচার শেষ হবে না।

বুদ্ধের শিষ্যরা, যারা অমিতাভ বুদ্ধের সর্ব্বোচ্চ শক্তির মাধ্যমে শুদ্ধাবাস অতিক্রম করেন, তাঁরা সম্ভবত প্রবল আগ্রহ সহকারে যেখান থেকে এসেছেন, সেখানে ফিরে যেতে চান। কারণ সেখানে তাঁদের দায়বদ্ধতা আছে। সেখানে তাঁরা বুদ্ধের ধর্ম প্রচারে অংশগ্রহণ করবেন।

ছোট মোমবাতির আলো যেমন ধারাবাহিকভাবে একটি থেকে অন্যটিতে আলো ছড়ায়, তেমনিভাবে বুদ্ধের করুণার আলোও একজনের মন হতে অন্যজনের মনে অসমাপ্তভাবে প্রসারিত হয়।

বুদ্ধের শিষ্যগণ তাঁর করুণার ভাবাদর্শকে বুঝতে পারেন, বিশুদ্ধিতা ও জ্ঞান

লাভের করণীয় কাজের সাথে মানিয়ে নিতে পারেন। তাঁরা একে এক বংশধর হতে অন্য বংশধরের নিকট ক্রমান্বয়ে সঞ্চারিত করে বুদ্ধভূমিকে অনাদি ও অনন্তকাল ধরে মহিমান্বিত করার জন্যে প্রেরণ করেন।

৩

বুদ্ধ ভূমিতে যাঁরা মহিমান্বিত

১। শ্যামাবতী, যিনি রাজা উদয়নের স্ত্রী, তিনি বুদ্ধের প্রতি খুবই নিবেদিত ছিলেন।

তিনি প্রাসাদের গভীর প্রকোষ্ঠে বাস করতেন, তেমন বাহিরে যেতেন না। কিন্তু তাঁর পরিচারিকা উত্তরা, যার স্মৃতিশক্তি ছিলো খুবই প্রখর, সে প্রায় সময় বুদ্ধের দেশনা শ্রবণ করার জন্য বের হতো।

সে যখন রাজপ্রাসাদে ফিরে আসতো, তখন রানীকে পুনঃরায় বুদ্ধের দেশনা সম্পর্কে বলতো, এবং এতে করে রানী উত্তরার প্রজ্ঞা ও বিশ্বাসের উপর অনেকটা নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন।

রাজা উদয়নের দ্বিতীয় স্ত্রী, প্রথম স্ত্রীর প্রতি হিংসাপরায়ণ ছিলেন এবং তাঁকে হত্যা করতে চাইলেন। দ্বিতীয় স্ত্রী রাজাকে প্রথম স্ত্রীর কুৎসা রটনা করতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত রাজা তা বিশ্বাস না করতেন। এভাবে একদিন রাজা দ্বিতীয় স্ত্রীর কথা বিশ্বাস করে তাঁর প্রথম স্ত্রী শ্যামাবতীকে হত্যা করতে মনস্থির করলেন।

রানী শ্যামাবতী এতই শান্তভাবে রাজার সম্মুখে দাঁড়ালেন, এতে রানীকে হত্যা করার মন আর তাঁর রইলো না। তিনি তাঁর অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করে রানীর প্রতি অবিশ্বাস মনোভাবের জন্য ক্ষমা চাইলেন।

এতে দ্বিতীয় স্ত্রীর হিংসা আরও বৃদ্ধি পেতে লাগলো এবং তিনি রাজার

অনুপস্থিতিতে দুর্বৃত্ত পাঠালেন প্রাসাদের অভ্যন্তরে আগুন ধরিয়ে দেয়ার জন্য। রানী শ্যামাবতী শান্ত থাকলেন, তিনি হতভম্ব হয়ে যাওয়া পরিচারিকাকে শান্ত ও উৎসাহিত করলেন, তারপরে তিনি উদ্বেগহীনভাবে বুদ্ধের শিক্ষার আদর্শকে সাথে নিয়ে শান্তভাবে মৃত্যুবরণ করলেন। ঐ আগুনে পরিচারিকা উত্তরাও মৃত্যুবরণ করলো।

বুদ্ধের অনেক মহিলা শিষ্যাদের মধ্যে উক্ত দু'জন খুবই উচ্চ সম্মানের অধিকারিনী। রানী শ্যামাবতী, করুণার আদর্শ ও তাঁর পরিচারিকা উত্তরা একজন ভাল শ্রোতা হিসেবে।

২। যুবরাজ মহানাম ছিলেন শাক্যবংশীয় রাজা এবং বুদ্ধের চাচাতো ভাই। বুদ্ধের শিক্ষার প্রতি তাঁর যথেষ্ট বিশ্বাস ছিলো। তিনি বুদ্ধের খুবই শ্রদ্ধাবান অনুসারীও ছিলেন।

সে সময়ে কোশলরাজ্যের বিরূঢ়ক নামক এক উগ্র রাজা যুদ্ধের মাধ্যমে মহানামের শাক্যরাজ্য দখল করেন। রাজা মহানাম বিরূঢ়ক রাজার নিকট গমন করে তাঁর জনগণের প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন, কিন্তু রাজা তাঁর কথায় কর্ণপাত করলেন না। অতঃপর মহানাম বিরূঢ়কের নিকট প্রস্তাব করলেন, তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত পার্শ্ববর্তী পুকুরে পানির নীচে থাকবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত যতজন বন্দী দৌড়ে পালাতে পারে ততজনকে মুক্তি দিতে।

এতে রাজা সম্মত হলেন। তিনি চিন্তা করলেন যে যুবরাজ অল্প সময়ের জন্যই পানির নীচে থাকতে পারবেন।

রাজা মহানাম পানিতে ডুব দেয়ার সাথে সাথে দুর্গের দরজা খুলে দেয়া হলো এবং বন্দীগণ তাড়াতাড়ি তাদের জীবন রক্ষা করতে বের হয়ে পড়লো। কিন্তু যুবরাজ মহানাম উঠে আসলেন না, তাঁর জনগণের প্রাণ রক্ষার জন্যে তিনি নিজের চুলকে পানির নীচে জলাশয়াদির দ্বারা সৃষ্ট গাছের শিকড়ের সাথে বেঁধে রেখে জীবন ত্যাগ করলেন।

বুদ্ধভূমি গঠন

৩। উৎপলাবর্ণা একজন বিখ্যাত ভিক্ষুনী ছিলেন; যাঁর প্রজ্ঞা বুদ্ধের প্রধান শিষ্য মোদগল্যায়ণের সাথে তুলনা করা হতো। তিনি ভিক্ষুনী সংঘের প্রধান ছিলেন এবং কখনো তাঁদের শিক্ষা দানে বিরত থাকতেন না।

দেবদত্ত ছিলেন একজন দুষ্ট ও নির্দয় স্বভাবের লোক, যিনি রাজা অজাতশত্রুর মনকে বুদ্ধের শিক্ষার বিরুদ্ধে বিষাক্ত করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে রাজা অজাতশত্রু অনুতপ্ত হয়ে, দেবদত্তের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন এবং পরে বুদ্ধের মহান শিষ্যে পরিণত হয়েছিলেন।

একসময়ে যখন দেবদত্ত রাজাকে দর্শনের জন্যে গিয়ে রাজপ্রাসাদের দরজা থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন, তখন তিনি রাজপ্রাসাদ থেকে বের হওয়ার সময়ে উৎপলাবর্ণার সাক্ষাৎ পেলেন। এতে তিনি খুবই রাগান্বিত হলেন এবং তাঁর প্রতি প্রণয়াভিলাষী হয়ে তাঁকে মারাত্নকভাবে আহত করলেন।

তিনি মারাত্নক ব্যথা নিয়ে তাঁর কুঠিরে ফিরে আসলেন এবং অন্য ভিক্ষুনীরা যখন তাঁকে সান্তনা দেয়ার চেষ্টা করছিলেন তখন তিনি তাঁদেরকে বললেন, "ভিক্ষুনীগণ ! মানব জীবনকে বুঝা যায় না, সকল বস্তুই অনিত্য ও অনাত্নাধর্মী। কেবল মাত্র জ্ঞানজগতই স্হির ও শান্তিপূর্ণ। তোমরা অবশ্যই তোমাদের অনুশীলন চালিয়ে যাবে।" অতঃপর তিনি শান্তভাবে মৃত্যুপথে গমন করলেন।

৪। একদা অঙ্গুলীমালা নামক এক ভয়ঙ্কর দস্যু ছিলেন, যিনি অনেক লোককে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু মহাকারুণিক বুদ্ধ তাকে রক্ষা করেছিলেন এবং পরে তিনি বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

একদা তিনি ভিক্ষা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কোন এক শহরে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি তাঁর অতীত কর্মের জন্য জনগণ থেকে ভীষণ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছিলেন।

গ্রামবাসীরা তাঁকে ভূপাতিত করে মারাত্নকভাবে আহত করে। কিন্তু রক্তপাতপূর্ণ

অবস্থায় তিনি বুদ্ধের নিকট ফিরে গেলেন। তাঁর পায়ে উপুড় হয়ে পড়ে অতীতে নিষ্ঠুর কর্মের জন্য ভোগান্তি অনুভবের সুযোগ দানের জন্যে বুদ্ধের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

তিনি বললেন, "মহাকারুণিক বুদ্ধ, আমার আসল নাম ছিল 'অহিংসক,' কিন্তু আমার অজ্ঞতার দরুন আমি অনেক মূল্যবান জীবন ধ্বংস করে দিয়েছি। তাদের এক এক জন হতে আমি এক একটি করে অঙ্গুলী নিয়েছি; সে কারণেই আমি অঙ্গুলীমালা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছি।"

"আমি আপনার করুণার দ্বারা জ্ঞান সাধনা করি এবং বুদ্ধ রত্ন, ধর্ম রত্ন ও সংঘ রত্ন এই ত্রিরত্নের প্রতি অনুরক্ত হই। যখন কোন ব্যক্তি ঘোড়া বা গরু চালনা করে তখন তাকে চাবুক বা দড়ি ব্যবহার করতে হয়, কিন্তু আপনি মহাকারুণিক বুদ্ধ, চাবুক বা দড়ি বা বাঁকা হুকের ব্যবহার ছাড়াই আমার মনকে পরিশুদ্ধ করেছেন।"

"মহাকারুণিক বুদ্ধ, আজ আমি যা ভোগ করতেছি তা শুধু আমারই প্রাপ্য। আমি বাঁচতেও চাই না, আবার মরতেও চাই না। আমি শুধুই আমার অন্তিম সময়ের জন্য অপেক্ষা করছি মাত্র।"

৫। মোদগল্যায়ণ ও সারীপুত্র বুদ্ধের শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম দুই প্রধান শিষ্য। যখন অন্য ধর্মীয় গুরুরা দেখলেন, পবিত্র জল স্বরূপ বুদ্ধের শিক্ষাকে দুঃখ-তপ্ত সকলেই পান করছেন, তখন তাঁরা ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁর শিক্ষার প্রসারতাকে প্রতিরোধ করার জন্যে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে লাগলেন।

কিন্তু কোন প্রতিবন্ধকতা তাঁর শিক্ষা বিস্তারের পথকে রুদ্ধ করতে পারলো না। অন্য ধর্মানুসারীরা মোদগল্যায়ণকে হত্যা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন।

দু'বার তিনি তাদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেলেও তৃতীয়বারে তিনি অনেক বর্বরলোকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েন এবং তারা তাঁকে আঘাত করতে থাকে।

বুদ্ধভূমি গঠন

তিনি জ্ঞান সাধনায় স্হিত থেকে, তাদের আঘাত শান্তভাবে গ্রহণ করতে লাগলেন, এতে যদিও তাঁর মাংস ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল ও হাঁড় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে পড়ছিল, তবুও তিনি শান্তভাবে মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছিলেন।

বুদ্ধের ধর্ম শিক্ষা গ্রন্থের উৎস ও নির্দেশনা

বিশদ বর্ণনা ঃ DN- দীর্ঘ নিকায়

MN- মজ্জিম নিকায়

SN- সংযুক্ত নিকায়

AN- অঙ্গুত্তর নিকায়

বুদ্ধ

অংশ	পৃষ্ঠা	সারি	উৎস
পরিচ্ছেদ 1			
1	2	1	বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থাবলী
	4	17	AN-৩-৩৮, সুখুমালা সুত্ত
	5	3	MN-৩-২৬, আরিয়াপরিয়েসন সুত্ত
	5	11	বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থাবলী
	6	3	MN-৯-৮৫, বোধিরাজকুমার সুত্ত
	6	6	বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থাবলী
	6	12	সুত্ত-নিপাত ৩-২, পধান সুত্ত
	6	17	বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থাবলী
	7	6	বিনয়, মহাবগ্গ
	8	1	DN-১৬, মহাপরিনিব্বাণ সুত্ত
2	9	1	DN-১৬, মহাপরিনিব্বাণ সুত্ত
	9	21	পরিনিব্বাণ সুত্ত
	11	14	পরিনিব্বাণ সুত্ত
	11	20	DN-১৬, মহাপরিনিব্বাণ সুত্ত

পরিচ্ছেদ 2

1	13	1	অমিতায়ুর-ধ্যান এবং বিমালাকীর্তি-নির্দেশ সূত্র
	13	5	সূরংগম সূত্র
	13	9	বিমলকীর্তি-নির্দেশ এবং মহাপরিনির্বাণ সূত্র
	14	1	সৎধর্মপুন্ডারীক সূত্র ১৬
	14	15	মহাযান-জাতক-চিত্তভূমি-পরীক্ষা-সূত্র
	14	20	মহাপরিনির্বাণ সূত্র
2	16	9	সৎধর্মপুন্ডরীক সূত্র ৩
	17	5	সৎধর্মপুন্ডরীক সূত্র ৪
	18	15	সৎধর্মপুন্ডরীক সূত্র ৫
3	19	14	সৎধর্মপুন্ডরীক সূত্র ১৬

পরিচ্ছেদ 3

1	22	1	অবতমসক সূত্র ৫
	23	1	মহাপরিনির্বাণ সূত্র
	23	7	অবতমসক সূত্র
	23	14	সুবর্ণপ্রভাসত্তমরাজ সূত্র ৩
2	25	15	অবতমসক সূত্র
	25	20	অবতমসক সূত্র ৩৪, গন্ধভূহ
	26	2	ছোট সুখাবতীভূহ সূত্র
	26	6	অবতমসক সূত্র
	26	11	SN-৩৫-৫
	26	15	মহাপরিনির্বাণ সূত্র
3	28	9	MN-৮-৭৭, মহাসকুলূদয়ি সুত্ত

	29	4	মহাপরিনির্বাণ সূত্র
	29	14	লংকাবতার সূত্র
	29	24	অবতমসক সূত্র ৩২
	30	11	সৎধর্মপুন্ডরীক সূত্র ২৫
	30	16	মহাপরিনির্বাণ সূত্র
	31	2	সৎধর্মপুন্ডরীক সূত্র ২
	31	7	সৎধর্মপুন্ডরীক সূত্র ২

ধর্ম

পরিচ্ছেদ 1

1	34	1	বিনয়, মহাবগ্গ ১-৬ এবং SN-৫৭-১১-১২, ধম্মচক্কপবত্তন সুত্ত
	35	9	ইতিবুত্তক ১০৩
	35	19	MN-২, সব্বাসব সুত্ত
	36	1	৪২ সেকশনের ১৮
	36	14	শ্রীমালাদেবীসিংহনাদা সূত্র
2	38	6	অবতমসক সূত্র ২২, দশভূমিক

পরিচ্ছেদ 2

1	41	1	MN ৪-৩৫, চূলসচ্চক সুত্ত
	42	20	AN-৫-৪৯, রাজমুন্ধ সুত্ত
	43	6	AN-৪-১৮৫, সমন সুত্ত
	43	11	AN-৩-১৩৪, উপ্পাদ সুত্ত
2	43	18	লংকাবতার সূত্র
	43	21	অবতমসক সূত্র ২
	44	7	অবতমসক সূত্র ১৬

	44	19	অবতমসক সূত্র, দশভূমিক
	45	2	লংকাবতার সূত্র
	45	7	AN- ৪-১৮৬, উম্মগ্ন সুত্ত
	45	10	ধম্মপদ ১, ২, ১৭, ১৮
	45	20	SN-২-১-৬, কামদ সুত্ত
3	46	5	অবতমসক সূত্র ১৬
	46	11	লংকাবতার সূত্র
	47	3	MN-৩-২২, অলগদ্দূপম সুত্ত
	47	17	লংকাবতার সূত্র
	47	21	লংকাবতার সূত্র
4	50	1	বিনয়, মহাবগ্গ ১-৬
	50	10	লংকাবতার সূত্র
	50	15	SN-৩৫-২০০, দারুক্খন্ধ সুত্ত
	51	4	লংকাবতার সূত্র এবং অন্যান্য
	51	15	MN-২-১৮, মধুপিন্ডিক সুত্ত
	52	4	লংকাবতার সূত্র
	52	19	লংকাবতার সূত্র
	53	12	বিমলকীর্তি-নির্দেশ-সূত্র
	55	6	অবতমসক সূত্র ৩৪, গন্দভূহ
	55	14	লংকাবতার সূত্র এবং অন্যান্য

পরিচ্ছেদ 3

1	56	1	বিনয়, মহাবগ্গ ১-৫
	56	12	বিনয়, চূলবগ্গ ৫-২১
	56	18	সূরমগম সূত্র
2	60	17	সূরমগম সূত্র
	62	3	মহাপরিনির্বাণ সূত্র

	62	9	সৎধর্মপুন্ডরীক সূত্র ৭ এবং সূরমগম সূত্র
	62	22	অবতমসক সূত্র ৩২
	63	1	মহাপরিনির্বাণ সূত্র
	63	5	ব্রম্মজাল সূত্র
	63	12	মহাপরিনির্বাণ সূত্র
3	64	1	মহাপরিনির্বাণ সূত্র

পরিচ্ছেদ 4

1	68	1	শ্রীমালাদেবীসিমহনাদ সূত্র
	69	4	AN-২-১১
	69	8	ইতিবুত্তক ৯৩
	69	12	বিনয়, মহাবগ্গ
	69	22	AN-৩-৬৮, অঞ্ঞাতিত্থিক সুত্ত
	70	7	AN-৩-৩৪, আলবক সুত্ত
	70	17	বৈপুল্যা সূত্র
	70	21	বিনয়, মহাবগ্গ ১-৬, ধম্মচক্কপবত্তন সুত্ত
	71	3	MN-২-১৪, চূলদুক্খক্খন্ধ সুত্ত
	71	16	মহাপরিনির্বাণ সূত্র
	72	14	ইতিবুত্তক ২৪
2	74	1	MN-৬-৫১, কনদরক সুত্তন্ত
	74	14	AN-৩-১৩০
	74	22	AN-৩-১১৩
3	75	10	ইতিবুত্তক ১০০
	75	22	সমযুক্তরত্নপিঠক সূত্র
	76	17	মহাপরিনির্বাণ সূত্র

	77	19	AN-৩-৬২
	78	9	AN- ৩-৩৫, দেবদূত সুত্ত
	79	5	থেরীগাথা অত্থকথা
4	80	1	সুখাবতীভূহ সূত্র ২য় খন্ড

পরিচ্ছেদ 5

1	85	1	সুখাবতীভূহ সূত্র ১ম খন্ড
	88	7	সুখাবতীভূহ সূত্র ২য় খন্ড
	89	11	অমিতায়ুর-ধ্যান-সূত্র
	92	1	ছোট সুখাবতীভূহ সূত্র

অনুশীলনের উপায়

পরিচ্ছেদ 1

1	92	1	MN-২, সব্বাসব সুত্ত
	97	12	MN-৩-২৬, অরিযপরিযেসন সুত্ত
	98	2	SN-৩৫-২০৬, ছপান সুত্ত
	98	18	৪২ সেকশনের সূত্র ৪১-২
	100	15	MN-২-১৯, দ্বেধাবিতক্ক সুত্ত
	101	6	ধম্মপদ অত্থকথা
2	102	1	AN-৩-১১৭
	102	11	MN-৩-২১, ককচূপম সুত্ত
	104	23	MN-৩-২৩, বম্মীক সুত্ত
	106	5	জাতক IV-৪৯৭, মাতঙ্গ জাতক
	108	23	৪২ সেকশনের সূত্র ৯

	109	4	৪২ সেকশনের সূত্র ১১
	109	18	৪২ সেকশনের সূত্র ১৩
	110	22	AN-২-৪, সমচিত্ত সুত্ত
3	111	9	সমযুক্তরত্নপিঠক সূত্র
	119	9	মহাপরিনির্বাণ সুত্ত
	119	25	সমযুক্তরত্নপিঠক সূত্র

পরিচ্ছেদ 2

1	123	1	MN-৭-৬৩, চূলমালুঙ্গ সুত্তন্ত
	124	17	MN-৩-২৯, মহাসারপম সুত্ত
	126	1	মহামায়া সুত্ত
	126	10	থেরগাথা অথকথা
	127	20	MN-৩-২৮, মহাহত্থিপদপম সুত্ত
	128	8	মহাপরিনির্বাণ সুত্ত
	128	18	অবদানশতক সূত্র
	129	18	মহাপরিনির্বাণ সূত্র
	131	5	পঞ্চবিমশতি শহশ্রীকাপ্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র
	132	8	অবতমসক সূত্র ৩৪, গন্দভূহ
2	133	8	AN-৩-৮৮
	134	14	AN-৩-৮১
	134	19	AN-৩-৮২
	135	7	পরিনির্বাণ সূত্র ২য় খন্ড
	136	2	MN-১৪-১৪১, সচ্চবিভঙ্গ সুত্ত
	137	3	পরিনির্বাণ সূত্র ২য় খন্ড
	137	15	AN-৫-১৬, বল সুত্ত

	137	19	অবতমসক সূত্র
	138	10	মহাপরিনির্বাণ সূত্র
	138	22	সমযুক্তরত্নপিঠক সূত্র
	139	11	সুবর্ণপ্রভাস সূত্র
	139	23	মহাপরিনির্বাণ সূত্র
	140	16	থেরগাথা অথকথা
	141	6	জাতক ৫৫, পঞ্চাবুধ জাতক
	142	6	ইতিবুত্তক ৩৯ এবং ৪০
	142	15	মহাপরিনির্বাণ সূত্র
	142	17	মহাপরিনির্বাণ সূত্র
	142	19	AN-৫-১২
	143	3	পরিনির্বাণ সূত্র
	143	12	শূরমগম সূত্র
3	144	14	SN-৫৫-২১ এবং ২২, মহানাম সুত্ত
	145	5	AN-৫-৩২, চুন্দী সুত্ত
	145	11	বিমলকীর্তি-নির্দেশ-সূত্র
	145	21	শূরমগম সূত্র
	146	4	সুখাবতীভূহ সূত্র ২য় খন্ড
	146	13	SN-১-৪-৬
	146	15	অবতমসক সূত্র ৩৩
	147	8	অবতমসক সূত্র ২৪
	147	18	সুবর্ণপ্রভাস সূত্র ৪
	148	2	অমিতায়ুর-ধ্যান-সূত্র
	148	4	সুখাবতীভূহ সূত্র
	148	10	মহাপরিনির্বাণ সূত্র
	149	2	MN-২-১৬, চেতোখিল সুত্র

	149	14	সুখাবতীভূহ সূত্র ২য় খন্ড
4	150	7	ধম্মপদ
	157	11	SN-১-৪-৬
	157	23	AN
	158	3	মহাপরিনির্বাণ সূত্র

ভ্রাতৃসংঘ

পরিচ্ছেদ 1

1	160	1	ইতিবুত্তক ১০০ এবং MN-১-৩, ধম্মদায়াদ সুত্ত
	160	7	ইতিবুত্তক ৯২
	161	1	বিনয়, মহাবগ্গ ১-৩০
	161	17	MN-৪-৩৯, মহা-অস্সপুর সুত্ত
	162	23	MN-৪-৪০, চূলঅস্সপুর সুত্ত
	163	19	সদ্ধর্মপুন্ডরীক সূত্র ১৯
	164	1	সদ্ধর্মপুন্ডরীক সূত্র ১৯
	164	9	সদ্ধর্মপুন্ডরীক সূত্র ১৯
2	165	20	SN-৫৫-৩৭, মহানাম সুত্ত
	166	7	AN ৩-৭৫
	166	12	SN-৫৫-৩৭, মহানাম সুত্ত
	166	16	SN-৫৫-৫৪, গিলায়নম সুত্ত
	166	22	অবতমসক সূত্র ২২
	168	4	মহাপরিনির্বাণ সূত্র
	170	10	অবতমসক সূত্র

	172	22	মহাপরিনির্বাণ সূত্র
	173	19	অবতমসক সূত্র
	174	11	মহাপরিনির্বাণ সূত্র

পরিচ্ছেদ 2

1	176	1	DN-৩১, সিংগালোবাদ সুত্ত
	181	3	AN-২-৪, সমচিত্ত সুত্ত
	181	18	AN-৩-৩১
	182	2	জাতক ৪১৭, কচ্চানি জাতক
	183	14	DN-৩১, সিংগালোবাদ সুত্ত
	184	1	ধম্মপদ অথকথা ১
2	185	8	AN-৪-১৯৭
	185	22	AN-৫-৩৩৩ উগ্গহ সুত্ত
	186	14	বার্মা অর্থকথা
	187	6	AN-৭-৫৯, সুজাত সুত্ত
	188	17	DN-১৬, মহাপরিনিব্বাণ সুত্ত
	189	19	শ্রীমালাদেবীসিমহনাদ সূত্র
3	191	16	DN-১৬, মহাপরিনিব্বাণ সুত্ত
	192	15	অবতমসক সূত্র ৩৪, গন্দভূহ
	193	18	সুবর্ণপ্রভাস সূত্র
	194	12	বোধিসত্ত্ব-গোচরোপায়-বিষয়বিকুর্বন-নির্দেশ-সূত্র

পরিচ্ছেদ 3

1	201	1	মহাপরিনির্বাণ সূত্র
	202	17	AN-৩-১১৮, সোচেযন সুত্ত
	204	4	SN

	204	15	বিনয়, মহাবগ্গ ১০-১ এবং ২
	204	23	DN-১৬, মহাপরিনিব্বাণ সুত্ত
	206	1	বিনয়, মহাবগ্গ ১০-১ এবং ২
2	208	7	SN
	209	3	The Chuin Kyo Sutra
	209	9	বিমলকীর্তি-নির্দেশ-সূত্র
	210	11	মহাপরিনির্বাণ সূত্র
	211	2	ছোট সুখাবতীভূহ সূত্র
	211	7	সুখাবতীভূহ সূত্র
	211	19	বিমলকীর্তি-নির্দেশ-সূত্র
3	212	6	ধম্মপদ অথকথা ১
	212	14	AN-৩৪-২
	213	9	ধম্মপদ অথকথা ১
	214	1	AN-৫-১
	214	4	সরবাসতিবাদ-সংঘবেদক-বস্তু ১০
	214	17	MN-৯-৮৭, অঙ্গুলিমাল সুত্ত
	215	15	AN ২৬

পরিশিষ্ট

বৌদ্ধ ধর্মের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১
ভারত

মানব সভ্যতার আধ্যাত্মিক ইতিহাসে ঐ সময়টাকেই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করা হয় যখন ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যবর্তী অংশে "এশিয়ার আলো" উজ্জ্বলরূপে আলোকিত হয়ে উঠে। অথবা অন্য কথায়, যখন মহান প্রজ্ঞা এবং করুণার ফল্গুধারা এই পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণে নিঃসৃত হয়, তা সময়ের বিবর্তনে শতাব্দীকাল ধরে আজ পর্যন্ত মানব হৃদয়কে সমৃদ্ধ করে আসছে।

বুদ্ধ গৌতম যিনি পরবর্তী সময়ে বুদ্ধের অনুসারীদের কাছে শাক্যমুণি বা "শাক্য বংশীয় নক্ষত্র," হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন তিনি তাঁর প্রাসাদ ত্যাগ করে প্রাচুর্যতা সত্ত্বেও সাধক হয়ে, দক্ষিণে মগধ রাজ্যের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইহা বিশ্বাস করা হতো, তিনি শেষ পর্যন্ত সেখানকার এক বোধিবৃক্ষের নীচে বুদ্ধত্বজ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তাঁর মহান মৃত্যু বা মহাপরিনির্বাণ লাভ পর্যন্ত পয়তাল্লিশ বৎসর ধরে তিনি কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে মহা প্রজ্ঞা ও করুণার বাণী প্রচার করেছিলেন। ফলশ্রুতিতে, ঐ রাজ্য ও মধ্যভারতের বিভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে বুদ্ধ ধর্মের প্রসার লাভ করে।

মৌর্য রাজত্বের তৃতীয় রাজা সম্রাট অশোকের (খৃষ্টপূর্ব ২৬৮-২৩২) শাসন আমলে সমগ্র ভারতীয় ভূখন্ডে এবং দেশের সীমা ছাড়িয়ে বিভিন্ন জায়গায় বুদ্ধের শিক্ষার প্রসারতা লাভ করে।

মৌর্যবংশ ছিল ভারতের সর্বপ্রথম সংযুক্ত রাজ্য। এই রাজ্যের প্রথম শাসক চন্দ্রগুপ্তের আমলে (খৃষ্টপূর্ব ৩১৬-২৯৩), এক বিশাল এলাকা জুড়ে তাঁর রাজত্ব ছিলো, যা উত্তরে হিমালয় পর্বত, পূর্বে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে হিন্দুকুশ পর্বতমালা এবং দক্ষিণে সমগ্র বিন্দা পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত। রাজা অশোক এরপরও দক্ষিণ

দিকে কলিঙ্গ ও অন্যান্য রাজ্য দখল করে ডিকান মালভূমি পর্যন্ত রাজ্যের পরিধি বিস্তৃত করেন।

এই রাজা স্বভাবগতভাবে খুবই হিংস্র ছিলেন বলে বলা হত। প্রজাগণ তাঁকে চন্ডাশোক নামে ডাকত (হিংস্র অশোক)। কিন্তু কলিঙ্গ দখলকালীন সময় এর ধ্বংসযজ্ঞের অবস্থা দেখে তাঁর চরিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটান। তিনি মহা প্রজ্ঞা ও করুণার শিক্ষার আলোকে নিজেকে নিবেদিত করেছিলেন। এরপরে তিনি বৌদ্ধ ধর্মের একজন অনুসারী হিসেবে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার ও প্রসারের জন্য অনেক কিছু করেছিলেন। এগুলোর মধ্যে দু'টো কাজ সবচেয়ে বেশী বর্ণনার দাবী রাখে।

এর প্রথমটি হলো "খোদাই করা অশোকানুশাসন," বা বুদ্ধের শিক্ষার উপর ভিত্তি করে প্রণীত প্রশাসনিক সিদ্ধান্তগুলো পাথরের স্তম্ভে বা পরিচ্ছন্ন পাথরের দেয়ালে খোদাই করে রাখা, যা তাঁর নির্দেশে অসংখ্য স্থানে করা হয়েছিল এবং এভাবে বুদ্ধের শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, বুদ্ধের প্রজ্ঞা ও করুণার বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে চতুর্দিকে প্রচারক পাঠিয়েছিলেন। বিশেষতঃ সবচেয়ে যা উল্লেখযোগ্য ঘটনা তা হলো, তাঁর দ্বারা প্রেরিত প্রচারকগণ ঐ সকল দেশে পাঠানো হয়েছিল, যেমন-সিরিয়া, মিশর, কিরিন, মেসেডোনিয়া, এবং ইপিরস; যার লক্ষ্য ছিল বুদ্ধের শিক্ষাকে দূরপ্রাচ্য থেকে পশ্চিমা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা। অধিকন্তু, মহেন্দ্রকে (পালি ভাষায় মহিন্দ) দিয়ে তাম্রপন্নি বা সিলোন এ পাঠানো প্রচারাভিযান ছিল সফল; যা বুদ্ধের সুন্দর শিক্ষাকে সুন্দর লংকা দ্বীপে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ইহাকে ঐ দ্বীপে বুদ্ধের শিক্ষা প্রসারের সফল ভিত্তি হিসেবে ধরে নেয়া যায়।

২
মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তি

"বৌদ্ধ ধর্মের পূর্বাভীমুখী পদচারণা" পরবর্তীকালে বৌদ্ধদের মধ্যে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছিল। কিন্তু খৃষ্টপূর্ব শতাব্দীগুলোতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারের সুস্পষ্ট

লক্ষ্য ছিল পশ্চিমা বিশ্ব। খৃষ্টাব্দ শুরু হওয়ার সময়কাল থেকে বৌদ্ধ ধর্ম পূর্বাভীমুখী অভিযাত্রা শুরু করে। যাই হোক, এই বিষয়ে উল্লেখ করার আগে বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে ঘটে যাওয়া বিরাট পরিবর্তনটি আলোচনার দাবী রাখে। এই পরিবর্তনটি আর অন্য কিছু নয়, তা হলো "নতুন উদ্দীপনা" যাকে মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম বা বৌদ্ধ ধর্মের বড় গাড়ী হিসেবে বলা হয়। ঐ সময়ে শক্তিশালী ভিত লাভ করেছিল এই মহাযান। তখনকার সময়ের শিক্ষাগুলোর মধ্যে ইহা বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে আবির্ভূত হয়েছিল।

কখন, কিভাবে এবং কার দ্বারা এই "নতুন উদ্দীপনা" শুরু হয়েছিল ? এখনও পর্যন্ত এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কেহই দিতে পারেননি। তবে, আমরা সবাই অবগত আছি, প্রথমতঃ, এই ধারণা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন ঐ সময়কার তথাকথিত স্বতন্ত্র চিন্তাবিদদের নিয়ে গঠিত মহাসংঘিকা নামক দলের প্রগতিশীল সাধকদের দ্বারা; দ্বিতীয়তঃ, ইহাও হতে পারে, খৃষ্টপূর্ব ১ম অথবা ২য় শতাব্দী থেকে খৃষ্টাব্দ ১ম শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালেই মহাযান ধর্মগ্রন্হের কিছু গুরুত্বপুর্ণ উপাদান বিরাজিত ছিল। যখন নাগার্জুনের উৎকৃষ্ট মানের চিন্তা-ধারা যা পরবর্তিতে মহাযান ধর্ম গ্রন্হের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আত্নপ্রকাশ করে, তখন মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম, ধর্মের ইতিহাসে নিজেকে প্রথম সারিতে নিয়ে গিয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

বৌদ্ধ ধর্মের সুদীর্ঘ ইতিহাসে মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম যে ভূমিকা রেখে আসছে তা অপরিসীম। বর্তমান, চীন এবং জাপান এ দু'দেশের বৌদ্ধ ধর্ম এবং তাদের প্রায় সব ইতিহাস মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে প্রভাবান্বিত ও বিকশিত হয়ে আসছে। এখানে অবাক হওয়ার কিছুই নেই কারণ জনগণকে রক্ষার জন্য নতুন এরূপ আদর্শের প্রচলন ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে, তদুপরি বোধিসত্ত্বের আকারে জীবিত সাধকদের প্রাক্ অনুমানকে উপজীব্য করেও তা অনুশীলন করা হয়েছিল; অধিকন্তু, জনগণকে সাহায্য করার জন্য, মহাযান চিন্তাবিদদের দ্বারা যে মনস্তাত্ত্বিক বা প্রকৃতির অস্তিত্ব সম্পর্কিত বুদ্ধিভিত্তিক যে জ্ঞানের উন্মেষ ঘটেছিল, তা ছিল সত্যিই অতুলনীয়। এভাবে, একদিকে তা বুদ্ধ গৌতমের শিক্ষার সাথে যদিও নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত ছিল, তথাপি প্রজ্ঞা ও করুণার অনেক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীও এর সাথে যুক্ত হয়েছিল। এসব নতুন সংযুক্তির মাধ্যমে, বৌদ্ধ ধর্ম তার পরিপূর্ণ গতি এবং শক্তি লাভ

করেছিল এবং বিশাল নদীর দ্রুত প্রবাহমান স্রোতের মতো পূর্বের দেশগুলোকে সমৃদ্ধ করেছিল।

৩
মধ্য এশিয়া

মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে চীনই প্রথম বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত হয়। একারণে, ভারতবর্ষ হতে চীনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারের কথা বলতে গেলে সিল্ক রোডের কথা বলতে হয়। এই সড়ক মধ্য এশিয়ার সীমারেখাহীন সীমান্তের মধ্য দিয়ে পশ্চিম ও পূর্বকে সংযুক্ত করেছে। হান রাজবংশের রাজা উ (king Wu) এর আমলে (খৃষ্টপূর্ব ১৪০-৮৭) এই বাণিজ্য সড়ক ছিল উন্মুক্ত। ঐ সময়ে হান রাজত্ব সুদূর পশ্চিমে বিস্তৃতি লাভ করেছিল এবং এর ফলে সংযুক্ত দেশ সমূহ যেমন-ফারঘানা, শোকডিয়ানা, তুখারা, এবং এমনকি পার্থিয়া বা পূর্বে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের (Alexander the Great) বাণিজ্যতত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল; যা তৎসময়েও প্রচুর পরিমাণে ক্রিয়াশীল ছিল। এই পুরাতন রাস্তা যা ঐ সমস্ত দেশের মধ্য দিয়ে সিল্ক আনা-নেয়া হতো, সেখানে উক্ত সিল্ক এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এতে পরবর্তীতে ঐ রাস্তার নামকরণ করা হলো সিল্ক রোড। খৃষ্টাব্দ শুরু হওয়ার কিছু পূর্বে অথবা পরে, ভারত এবং চীন এই বাণিজ্যিক রাস্তাটিকে ভিত্তি করে তাদের দু'দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ শুরু করেছিল। অতএব, এই রাস্তাটিকে বৌদ্ধ ধর্মের রাস্তা বললেও অত্যুক্তি করা হবে না।

৪
চীন

চীনে বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস শুরু হয়েছিল মূলতঃ বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্হ এবং এর অনুবাদ গ্রন্হকে স্বীকৃতিদানের মাধ্যমে। আদিকাল থেকে এই পুরানো গ্রন্হগুলোকে চাইনিজ ভাষায় "Ssu-shih-er-chang-ching" বা ৪২ সেকশনের সূত্র, যা বুদ্ধ দ্বারা ভাষিত বলে বলা হতো। তা কাশ্যাপমাতঙ্গ এবং অন্যান্যদের দ্বারা, ইং পিং

(Ying-p'ing 58-76 A.D.) রাজবংশের পূর্বাঞ্চলীয় রাজা মিং (King Ming) এর সময়ে অনুবাদিত হয়। কিন্তু বর্তমানে তা একটি সন্দেহমূলক রূপকাহিনী বলে বিবেচনা করা হয়। বর্তমানে An-shih-kao কে সামগ্রিকভাবে স্বীকার করা হয়। তিনি ১৪৮ থেকে ১৭১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত Lo-yang এ অনুবাদের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। ঐ সময়কাল থেকে উত্তরাঞ্চলীয় Sung Dynasty (৯৬০-১১২৯খৃষ্টাব্দ) পর্যন্ত এই অনুবাদের কাজ ১০০০ (এক হাজার) বৎসরের কাছাকাছি পর্যন্ত চলমান ছিল।

খৃষ্টীয় প্রথমবর্ষের দিকে, যাঁরা ধর্মগ্রন্হ ও এগুলোর অনুবাদ কাজে নিয়োজিত ছিলেন এবং প্রচার কাজে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন তাঁরা ছিলেন মূলতঃ মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর ভিক্ষুরাই। উদাহরণ স্বরূপ, An-shih-kao যাঁর নাম পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি Parthia থেকে এসেছিলেন। তেমনিভাবে K'ang-seng-k'ai সমরখন্দ থেকে তৃতীয় শতাব্দীতে Lo-yang এ এসেছিলেন, যিনি পরবর্তীতে "সুখাবতীব্যুহ" (অসংখ্য জীবন সম্পর্কিত বই) নামক বইটি অনুবাদ করেছিলেন। অধিকন্তু, Chu-fa-hu বা ধর্মরক্ষা, যিনি "সদ্ধর্মপুন্ডরীক" সূত্র অনুবাদ করার জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। তিনি এসেছিলেন তুখার থেকে। তৃতীয় শতাব্দীর শেষাংশ থেকে চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম অংশ পর্যন্ত তিনি Lo-yang এ অবস্হান করেছিলেন। পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমার্ধে যখন কুচ্ছা হতে কুমারজীবের আগমন ঘটে তখন চীনের অনুবাদকর্ম লক্ষণীয় স্হানে পৌঁছে।

ঐ সময় হতেই সাংস্কৃত শিক্ষা লাভের জন্য চীন থেকে ভারতে ভিক্ষুদের আগমন ঘটে। এই ভিক্ষুদের মধ্যে অন্যতম হলেন Fa-hsien (৩৩৯-৪২০? খৃষ্টাব্দ)। তিনি ৩৯৯ খৃষ্টাব্দে ভারতের উদ্দেশ্যে Ch'ang-an ত্যাগ করেন এবং পনের বৎসর পর দেশে ফিরে আসেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভারত গমনকারী ভিক্ষু হলেন Hsuan-chuang (৬০০-৬৬৪ খৃষ্টাব্দ), যিনি ৬২৭ খৃষ্টাব্দে ভারত গমন করেন এবং সুদীর্ঘ উনিশ বৎসর পর ৬৪৫ খৃষ্টাব্দে দেশে ফিরে আসেন। অধিকন্তু, I-ching (৬৩৫-৭১৩ খৃষ্টাব্দ) সমুদ্র পথে ৬৭১ সালে ভারত গমন করেন এবং একই পথে পচিঁশ বৎসর পর দেশে ফিরে আসেন।

এসকল ভিক্ষুগণ নিজেরা ভারত গমন করেছিলেন সাংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্যে। তাঁরা যেসব ধর্মগ্রন্হ পছন্দ করেছিলেন তা নিয়ে গিয়ে অনুবাদ কর্মে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছিলেন। Hsuan-chuang অনুবাদ কর্মে ভাষাগত যে দক্ষতা প্রদর্শন করেছিলেন, তা ছিল সত্যিই চমকপ্রদ। তাঁর কর্মোদ্দীপনার মাধ্যমে চীনে ধর্মগ্রন্হের অনুবাদ সর্ব্বোচ্চ গতিশীলতা লাভ করেছিল। কুমারজীবের তত্ত্বাবধানে পরবর্তীকালে যে অনুবাদগুলো হয়েছিলো ওগুলোকে "পুরাতন অনুবাদ" বলে ধরে নেয়া হতো এবং Hsuan-chuang ও তাঁর পরবর্তী সময়ে যে অনুবাদগুলো হয়েছিলো ঐগুলোকে "নতুন অনুবাদ" হিসেবে বৌদ্ধ পন্ডিতগণ পরবর্তী সময়ে ধরে নেন।

সাংস্কৃত ভাষার উপর ভিত্তি করে তখন যে বিপুল পরিমাণ গ্রন্হ অনুবাদ হয়েছিল, তা ঐ পন্ডিত লোকদের চিন্তাধারা এবং ধর্মীয় কার্যাবলীর সাথে ধারাবাহিকভাবে এক শক্তিশালী মিশ্রিত রূপ পরিগ্রহ করে। যা স্বাভাবিকভাবে এক সময় গোষ্টিবদ্ধতা, প্রয়োজনীয়তা ও আত্নবিশ্বাসে রূপ নিয়েছিল। প্রথম দিকের ভিক্ষুরা অনাত্না থেকে তাঁদের মনকে বস্তু ও সৃষ্টির দিকে নিবদ্ধ করলেন। এদের মধ্যে যাঁরা সূত্রের প্রজ্ঞা দ্বারা আকৃষ্ট তাঁরা সুস্পষ্টভাবে ঐ ইচ্ছা নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। পরবর্তীতে তাঁরা তথাকথিত "হীনযান" বা অপেক্ষাকৃত ছোট গাড়ী থেকে "মহাযান" বা বড় গাড়ীর দিকে তাঁদের মনোযোগকে চালিত করেছিলেন। অধিকন্তু, এই প্রবণতা ধারাবাহিকভাবে স্বতন্ত্র তেনদাই নিকায় (Tendai) নামে রূপ গ্রহণ করে এবং বলা যায় তা সর্ব্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছে, যখন জেন নিকায়ের (Zen) আবির্ভাব ঘটে।

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ অধ্যায়ের দিকে তেনদাই নিকায় (Tendai) চীনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তেনদাই (Tendai) নিকায়ের তৃতীয় প্রধান ধর্মগুরু তেনদাই ডাইসি (Tendai Daishi), চি-ই (Chih-i) (৫৩৮-৫৯৭ খৃষ্টাব্দ) কর্তৃক পরিপূর্ণতা লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন বৌদ্ধ চিন্তাধারার উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব এবং বুদ্ধের শিক্ষার পাঁচটি সময়ের সমালোচনামূলক শ্রেণীবিভাগ এবং আটটি মতবাদ এই মহৎ ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল, যা সুদীর্ঘকাল ধরে চীনে এবং পাশাপাশি জাপানেও

বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ধরে রেখেছে। পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, চীনে বিভিন্ন সূত্রাবলীর আনয়নের মধ্যে এর উৎপত্তিকালীন সময়ের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়নি এবং সে সময়ে যা আনা হয় তাই অনুবাদ করা হয়েছিল। বিপুল সংখ্যক সূত্রাবলীর মধ্যে কোনটি আদি, তা মূল্যায়ন করা বিরাট এক সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মকে সামগ্রিকভাবে মূল্যায়ন এবং একটি অন্যটির সাথে কিভাবে সম্পর্কিত তা বুঝা একসময়ে খুবই জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছিল। সূত্রাবলীকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে চৈনিক চিন্তাধারার প্রবণতাটি প্রথমত সামনে এসে যায়। সর্বোপরি, Chih-i ছিলেন অধিকতর ধারাবাহিক এবং বিপুলভাবে প্রভাবশালী। কিন্তু, আধুনিক যুগে বৌদ্ধ গবেষণামূলক কাজের মুখে, এমনকি এরূপ শক্তিশালী প্রভাবও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

চীনের বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে "যা শেষে আগমন করেছিল" তা ছিল জেন নিকায়। এই নিকায়ের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিদেশী শ্রমণ বোধিধর্মের (৫২৮ খৃষ্টাব্দ) নাম উল্লেখ করা হয়। কিন্তু যে বীজ তিনি বপন করেছিলেন তার ফুল প্রস্ফুটিত হয় Hui-neng (৬৩৮-৭১৩ খৃষ্টাব্দ) এর পরবর্তী সময় হতে, যিনি ছিলেন ষষ্ঠ ধর্মগুরু। অষ্টম শতাব্দীর পরে, জেন নিকায় তাঁদের অনেক মেধাবী ভিক্ষুদেরকে কয়েক শতক ধরে প্রচারে পাঠিয়েছিলেন।

দেখা যায় যে, বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে নতুন চিন্তাধারা বিদ্যমান ছিল, যা চীনা জনগণের সাধারণ স্বভাবে গভীরভাবে পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধ ধর্মই চীনা জনগণের চিন্তা-চেতনাকে নানা রং এ রন্জিত করছে। এখনও পর্যন্ত বুদ্ধ গৌতমের শিক্ষার দ্রুত প্রবাহ, চলমান সতেজ স্রোতস্বিনীর সংযুক্তির ভিতর দিয়ে অদ্যাবধি বৃহত্তর নদীতে রূপ নিচ্ছে এবং পূর্বের দেশগুলোকে সমৃদ্ধ করছে।

৫

জাপান

জাপানে বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস শুরু হয় ৬ষ্ঠ শতকের দিকে। ৫৩৮ খৃষ্টাব্দে রাজা

Paikche (বা কুদারা, কুরিয়া) সম্রাট Kinmei এর রাজকীয় দরবারে বুদ্ধ মুর্তি ও সূত্রাবলী উপহার স্বরূপ প্রেরণ করেছিলেন। ইহাই এদেশে বৌদ্ধ ধর্মের সূচনা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। জাপানে বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস ১৪০০ বৎসর পুরানো।

এই সুদীর্ঘ ইতিহাসে জাপানি বৌদ্ধ ধর্মকে তিনটি পর্যায়ের সংযোগ সূত্রে আমরা ভাবতে পারি। প্রথম পর্যায়ে সাধারণত সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর বৌদ্ধ ধর্মকে ধরা যেতে পারে। একে বস্তুগতভাবে প্রকাশ করতে হলে Horyuji প্যাগোডা (৬০৭ খৃষ্টাব্দ) এবং Todaiji প্যাগোডাকে (৭৫২ খৃষ্টাব্দ) উদাহরণ হিসেবে ধরা যায়, যা ঐ সময়কালেই তৈরী হয়েছিল। এই সময়ের পূর্বে দৃষ্টিপাত করলে, যে বাস্তবতাকে আমরা এড়িয়ে যেতে পারিনা তা হলো ঐ সময়ে সংস্কৃতির প্রবাহ সমগ্র এশিয়া জুড়ে অস্বাভাবিক মাত্রায় দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়েছিল, যখন পশ্চিমা সভ্যতা তিমির অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। পূর্বের দেশগুলো আশ্চর্য সক্রিয়তায় এবং উল্লেখযোগ্য আলোড়নের ভিতর দিয়ে উন্নত হচ্ছিল। চীনে, মধ্য এশিয়ায়, ভারতে এবং দক্ষিণ সাগর তীরবর্তী দেশগুলো বুদ্ধিভিত্তিক, ধর্মীয় এবং চারুকার্য ক্ষেত্রগুলোতে দক্ষতার সাথে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছিল। উল্লেখিত উৎকর্ষতা যুক্ত হয়ে, বৌদ্ধ ধর্ম পূর্ববিশ্বের দেশগুলোকে মানবতার উদ্ভাসিত স্রোতে স্নাত করে দিয়েছিল। এই নতুন উৎকর্ষতা অত্যুৎকৃষ্ট Horyuji প্যাগোডা এবং চমকপ্রদ Todaiji প্যাগোডার গঠন শৈলীর মাধ্যমে অবলোকন করা গিয়েছিল এবং যার মাধ্যমে বৈচিত্র্যময় ধর্মীয় এবং চারুকলার বিকাশ ঘটে ছিল তা পূর্বের দেশগুলোর সাধারণ সাংস্কৃতিক প্রবাহের ধারণ ক্ষমতাকেই ইঙ্গিত করে যা মূলত এশিয়ার সর্বত্র প্রসারিত হয়েছিল।

এই দেশের জনগণ, যারা সুদীর্ঘকাল ধরে একটি দেশ হিসেবে সভ্যতার আলো থেকে পিছিয়ে পড়েছিল, বর্তমানে তারা ব্যাপকভাবে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে স্নাত হচ্ছে। বলা যায়, সভ্যতা নামক পুষ্প হঠাৎ করে তাদের কাছে সবকিছুই উন্মোচিত করেছে। সৌভাগ্যের মসৃণ চাকা এভাবেই ঐ শতাব্দীগুলোতে জাপানকে আনুকূল্য প্রদর্শন করেছিল। আর এই উন্নত সাংস্কৃতিক সভ্যতা জাগরণে যে উল্লেখযোগ্য নেতৃত্বের ভূমিকা রেখেছিল সে আর কেউ নয় সে হলো বৌদ্ধ ধর্ম। বৌদ্ধ বিহারগুলো হয়ে উঠলো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান, এবং ভিক্ষুরা হয়ে উঠলেন

এই নতুন শিক্ষাকেন্দ্রের প্রধান। সেখানে কেবল ধর্মের উন্নতি নয়, বিস্তৃতাকারে এবং ব্যাপকভাবে সংস্কৃতির উন্নতির দিকটিও ছিল উল্লেখযোগ্য। ইহাই ছিল বৌদ্ধ ধর্মের আসল অবস্থা যা অন্য দেশ হতে এদেশে আগমন করেছিল।

নবম শতাব্দীতে, দু'জন বিশিষ্ট ভিক্ষু Saicho (Dengyo Daishi, ৭৬৭-৮২২) এবং Kukai (Kobo Daishi, ৭৭৪-৮৩৫) আবির্ভূত হন এবং তাঁরা দু'টি নিকায় প্রতিষ্ঠিত করেন, দু'টিকে একত্রে Heian-Buddhism হিসেবে ধরে নেয়া হয়। ইহা ছিল জাপানী বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক সংস্হাপন। তাঁরা বৌদ্ধ ধর্মকে এর আদি সঠিক শিক্ষার আলোকে গ্রহণ করেন এবং অনুশীলনে নিবিষ্ট হন এবং কেন্দ্রীয়ভাবে Mt. Hiei এবং Mt. Koya তে স্ব স্ব নিকায়ের বিহার স্হাপন করেন। এই দু'টি বিহার প্রতিষ্ঠার ৩০০ বৎসর পরে, এবং Kamakura যুগ পর্যন্ত এই দু'টি নিকায়, Tendai এবং Shingon প্রধানতঃ অভিজাত ব্যাক্তিবর্গের কাছে এবং সম্রাটদের কাছে সমাদৃত হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়টি হলো, ১২ শতাব্দী থেকে ১৩ শতাব্দীর বৌদ্ধ ধর্ম। সে সময়ে আবির্ভূত হওয়া বিশিষ্ট ভিক্ষুদের মধ্যে রয়েছেন Honen (১১৩৩-১২১২ খৃষ্টাব্দ), Shinran (১১৭৩-১২৬২ খৃষ্টাব্দ), Dogen (১২০০-১২৫৩), এবং Nichiren (১২২২-১২৮২ খৃষ্টাব্দ) অন্যতম। যখন আমরা জাপানের বৌদ্ধ ধর্মের কথা আলোচনা করি, তখন উল্লেখিত বিশিষ্ট ভিক্ষুদের নাম উল্লেখ না করে পারি না। তাহলে কেনই বা শুধু ঐ শতাব্দীগুলোতে আবির্ভূত ব্যক্তিত্বদের সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে ? এর কারণ ঐ সময়ে তাঁরা সকলেই একটা সাধারণ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাহলে সে সাধারণ সমস্যাটি কি ছিল ? খুব সম্ভবত তা হলো, বৌদ্ধ ধর্ম যদিও জাপানী সমাজে সহজে গৃহীত হয়েছিল, কিন্তু তা হয়েছিল একটি স্বতন্ত্র জাপানী পদ্ধতিতে।

ইহা অবশ্যই প্রশ্ন জাগবে, "কেন ? ইহা কি সত্যি নয় যে, বৌদ্ধ ধর্ম ঐ সুদীর্ঘ সময়েরও পূর্বে এদেশে সূত্রপাত হয়েছিল ?" ইহাই ঐতিহাসিকভাবে সত্য। কিন্তু এ নতুন আমদানিকৃত ধর্মকে সম্পূর্ণভাবে বুঝে উঠতে, পূর্ণতাদান করতে, ও নিজেদের

মত করে গ্রহণ করতে এদেশের লোকদের কাছে কয়েকশত বৎসর লেগে গিয়েছিল। সংক্ষেপে বলা যায়, সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্মকে এদেশের মানুষদের গ্রহণ করার প্রচেষ্টা শুরু করেছিল, এবং এসকল প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে, বার ও তের শতকের বৌদ্ধদের কাছে এই ধর্ম বিকশিত হয়েছিল।

অতঃপর, জাপানে বৌদ্ধ ধর্মের উল্লেখিত বিশিষ্ট ভিক্ষুদের দ্বারা ভিত্তি স্থাপনের পর অদ্যাবধি এর গতিধারা বজায় রেখে স্বগর্বে অগ্রসর হচ্ছে। ঐ বিশিষ্ট ভিক্ষুদের আগমনের পর, জাপানী বৌদ্ধ ধর্মের জগতে পুনরায় অনুরূপ মেধার আগমন ঘটেনি। তথাপি, বর্তমান লেখক মনে করেন সেখানে অন্য একটি বিষয় বিদ্যমান যা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তা হলো বর্তমান সময়ে মূল/আদি বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা মূলক কার্যাবলীর ফসল।

জাপানের বৌদ্ধ ধর্ম সামগ্রিকভাবে, ইহার গ্রহণকালীন সময় থেকে, মহাযান মতাদর্শ সম্পন্ন। ইহা চীনের বৌদ্ধ ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত। বিশেষতঃ বার ও তের শতাব্দীতে বিশিষ্ট ভিক্ষুদের আগমনের পর, মহাযান শিক্ষা এর স্বতন্ত্র ধর্মীয় নিকায় কর্তৃক ভিত্তি স্থাপনের ভেতর দিয়ে প্রধান গতিপথটি সৃষ্টি হয়েছিল, যে দৃষ্টিভঙ্গী বর্তমান সময় পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে। এভাবে জাপানে বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে, মূল/আদি বৌদ্ধ ধর্মের গবেষণা শুরু হয়েছিল, Meiji যুগের মাঝামাঝি সময়ের পরের দিক থেকে। বুদ্ধ গৌতমের শিক্ষাদর্শের মূল স্বরূপ তখন সুস্পষ্টভাবে তাদের সম্মুখে পুনঃ উপস্থিত হয়েছিল। তখন তারা বুঝতে পারলেন যে, নিকায় প্রতিষ্ঠাতাকারীদের বাইরেও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিল। আবার, যারা এতদিন মহাযান শিক্ষার বাইরে অন্য কিছুকে ভাবতে পারেনি, তাদেরকেও বুঝতে সক্ষম করে তুলেছিল, এ ধারাবাহিক মহাযান শিক্ষার বাইরেও বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা বিদ্যমান আছে। এসকল নতুন উন্নয়নগুলো এখনও পর্যন্ত পণ্ডিতদের গবেষণার মধ্যে সীমাবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে এবং যা এখনও সাধারণ জনগণের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টির মতো যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। কিন্তু পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, এদেশের জনগণ বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনের দিকে ধাবিত হচ্ছে। লেখক এ পর্যায়ে একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে চান, যা উপরে বর্ণিত তিনটি ধারার তৃতীয়টি বা তৃতীয় ধারার শেষোক্তটি হিসেবে ধরা যাবে।

বুদ্ধের শিক্ষার প্রচার মিশন

বৌদ্ধ ধর্ম হলো শাক্যমুণি বুদ্ধ ৪৫ বৎসর যাবৎ যা প্রচার করেছেন তা; যাকে আমরা ধর্ম বলে থাকি। এ শিক্ষাগুলো তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী। সুতরাং, তিনিই এই ধর্মের সর্বেসর্বা। অপরপক্ষে, বুদ্ধের ধর্ম ৮৪০০০ (চুরাশি হাজার) ধর্মস্কন্ধ ও অনেক নিকায়ের সমন্বয়ে গঠিত, যার সবগুলোই শাক্যমুণি বুদ্ধের শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত। যে গ্রন্হগুলোতে বুদ্ধের শিক্ষাকে সংরক্ষণ করা হয়েছে, তাকে *Issaikyo* বা *Daizokyo* বলে বলা হয়, যা পবিত্র শিক্ষার একটি সম্পূর্ণ সংগ্রহ।

শাক্যমুণি জোরালোভাবে মানুষের সমতার পক্ষে কথা বলেছেন এবং তিনি তাঁর শিক্ষাকে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত খুবই সহজ সরল ভাষায় উপস্হাপন করেন, যা সকলেই সম্পূর্ণভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি ৮০ বৎসর বয়স পর্যন্ত মানুষের বহুমুখী উপকারিতার কথা ভেবে মহাপরিনির্বাণ লাভের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এ ধর্ম প্রচারে নিবিষ্ট ছিলেন।

শাক্যমুণি বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভের পর, তাঁর শিষ্যগণ যেভাবে ঐ শিক্ষা শ্রবণ করেছিলেন, ঠিক সেভাবে এই পবিত্র শিক্ষা প্রচারের কাজে নিজেদেরকে উৎসর্গিত করেছিলেন। তবুও যেহেতু ঐ শিক্ষা স্হানান্তরিত হয়েছে এবং পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, সেহেতু সেখানে শিষ্যদের অসচেতনতার দরুন কিছুটা ভিন্নতা উপস্হাপন হতে পারে; যা তাঁরা শিক্ষা দিয়েছেন বা শুনেছেন বা বুঝেছেন। কিন্তু শাক্যমুণির শিক্ষা অবশ্যই সর্বদা সংক্ষিপ্ত এবং যথার্থভাবে স্হানান্তরিত হয়েছিল যা সবার জন্য পক্ষপাতহীনভাবে শ্রবণ করার সুযোগ ছিল। পরবর্তীকালে অনেক বড় ভিক্ষুরা একত্রিত হয়ে বুদ্ধের বাক্য এবং শিক্ষাকে মিলিয়ে দেখার জন্য এবং পুর্নবিন্যাসের দ্বারা শক্তিশালী করার জন্য, যেগুলো পারস্পরিকভাবে মিলে যায় ঐগুলোকে একই চিন্তাভুক্ত করে তাঁরা শুনেছেন। তাঁরা অনেক মাস কাল এই আলোচনা চালিয়েছিলেন। তাঁদের ঐ কাজগুলোকে সঙ্গায়ণ বলে অভিহিত করা হয়। এসকল সঙ্গায়ণ এটিই প্রমাণ করে যে তাঁরা কিভাবে আন্তরিকতা ও ত্যাগের মাধ্যমে মহান গুরুর

প্রকৃত বাণীকে প্রচার করতে সচেষ্ট ছিলেন।

যে শিক্ষাগুলো বিন্যস্ত করতে পেরেছিলেন সেগুলো লিখতে দেয়া হলো। যে শিক্ষাগুলোকে লিখিত আকারে তালিকাবদ্ধ করা হলো, সেগুলোর সাথে পরবর্তীতে অভিজ্ঞ ভিক্ষুদের মতামত এবং ব্যাখ্যা সংযুক্ত করা হয়। সেগুলো *Ron* বা অর্থকথা বলে পরিচিত হয়ে আসছে। "বুদ্ধের শিক্ষা" এই বইটিও পরবর্তী সময়ে সংযুক্ত করা একটি মতামত সম্বলিত গ্রন্হ। বৌদ্ধ ধর্মের সব গ্রন্হগুলোকে একসাথে *Sanzokyo* (বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্হাবলীর তিনটি অংশ) বা সংস্কৃত ভাষায় তাকে ত্রিপিটক বলা হয়।

Sanzokyo বা ত্রিপিটক গ্রন্হে *kyozo, Ritsuzo* এবং *Ronzo* বিদ্যমান। *Zo* শব্দের অর্থ হলো পাত্র বা আঁধার। *Kyo* এর অর্থ হলো বৌদ্ধ গ্রন্হাবলী, এবং *Ritsu* মানে বৌদ্ধ ভ্রাতৃসংঘের নিয়ম প্রণালী। *Ron* মানে বিশিষ্ট ভিক্ষুদের দ্বারা লিখিত মতামত সম্বলিত গ্রন্হ।

ঐতিহ্যগতভাবে, পরবর্তী পূর্বাঞ্চলীয় Han যুগের (২৫-২২০ খৃষ্টাব্দ) রাজা Ming এর সময়ে ৬৭ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধ ধর্ম চীন দেশে সূত্রপাত হয়। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে, ৮৪ বৎসর পরেই বৌদ্ধ গ্রন্হাবলী এবং অনুবাদ একই যুগের রাজা Huan (১৫১ খৃষ্টাব্দ) এর সময়ে চীনে পরিচিতি লাভ করে। অতঃপর প্রায় ১৭০০ বৎসর পর চীনা ভাষায় ধর্ম গ্রন্হ অনুবাদের প্রচেষ্টা শুরু হয়। ঐ অনুবাদিত ধর্ম গ্রন্হের সংখ্যা ১৪৪০টি এবং তা ৫৫৮৬ খণ্ডে বিভক্ত। ধর্ম গ্রন্হ অনুবাদের এ ধারা Wei যুগের প্রথম দিক থেকে অক্ষুন্ন ছিল। কিন্তু তা উত্তরাঞ্চলীয় Sung যুগেই ছাপানোর কাজ শুরু হয়েছিল। যাহাই হউক না কেন, এই সময় থেকে চীনের বিশিষ্ট ভিক্ষুদের দ্বারা রচিত গ্রন্হাবলী মূল ধর্ম গ্রন্হের সাথে সংযোজিত হয় এবং এর পর থেকে এ ধর্মগ্রন্হগুলোকে আর ত্রিপিটক বলা যুক্তি সঙ্গত নয়। যখন Suei যুগ শুরু হয়, তখন *Issaikyo* বা সমগ্র সংগৃহীত লিখিত পবিত্র ধর্ম গ্রন্হগুলো, Tang যুগে নতুন নামকরণ করে *Daizokyo* বা বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্হের সমগ্র সংগ্রহ নামে বিনয় এবং সূত্র হিসেবে সংরক্ষিত রাখা হয়।

তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের সূত্রপাত হয় ৭ শতাব্দীর দিকে। ৯ম থেকে ১১শ শতাব্দী পর্যন্ত মোট ১৫০শ বৎসর বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্হ অনুবাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। বস্তুতপক্ষে সবই অনুবাদিত হয়েছিল সে সময়েই।

প্রকৃত অবস্হার দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, ধর্মগ্রন্হগুলো শুধু কুরিয়ান, জাপানীজ, শ্রীলংকান, কম্বোডিয়ান, তার্কিশ ভাষায় অনুবাদিত হয়নি, প্রায় সব এশিয়ান দেশের ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে। আবার ল্যাটিন, ফ্রান্স, ইংরেজী, জার্মান এবং ইতালীয়ান ভাষায়ও তা অনুবাদিত হয়েছে। ইহা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বুদ্ধের শিক্ষার মহিমা পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই প্রসারতা লাভ করেছে।

কিন্তু দ্বিতীয় চিন্তা, যা ২,০০০ বৎসরেরও বেশী সময়ের মধ্যে অনুবাদিত গ্রন্হের মানের উপর ভিত্তি করে ধর্মীয় উন্নতির ইতিহাস; এবং ১০,০০০ হাজারেরও বেশী গ্রন্হের লেখা হতে, শাক্যমুণি বুদ্ধ যা বলেছেন তার অর্থ সঠিকভাবে উপলব্ধি করা বর্তমানে কঠিন। এমন কি Daizokyo এর সাহায্য নিয়েও তা উপলব্ধি করা কষ্টকর ব্যাপার। সুতরাং, তাই Daizokyo হতে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো চয়ন করা অপরিহার্য এবং এগুলোর বিবেচনা ও মানের উপর ভিত্তি করে যে কোন কেহ ধর্মের প্রতি বিশ্বাস স্হাপন করতে পারেন।

বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে বুদ্ধের শিক্ষার মূল কর্তৃপক্ষ হলেন শাক্যমুণি বুদ্ধ নিজেই। এই কারণে, বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কাছাকাছি ও বাস্তবতার সাথে সম্পর্কিত। অন্যথায়, এটি বুদ্ধের শিক্ষার প্রতি গভীর বিশ্বাসে মানব মনকে উৎসাহিত করতে ব্যর্থ হবে। এই অর্থে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বুদ্ধের শিক্ষা হবে একটি, যা আমরা আমাদের নিজেদের মত করে তৈরী করতে পারবো। ইহা সহজ ও সরল হওয়া কাম্য। এর গুণগতমান হবে পক্ষপাতহীন। সম্পূর্ণ শিক্ষাকে যথাযোগ্যভাবে উপস্হাপন করা, যাতে করে সঠিক এবং প্রচলিত শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রহণ করতে পারবো।

উপরে আলোচিত বিষয়ের কথা বিবেচনায় রেখে আমরা এই গ্রন্হটি, ২০০০ বৎসরেরও বেশী পুরানো ঐতিহাসিক গ্রন্হ Daizokyo উত্তরাধীকার সূত্রে প্রাপ্ত

ধারায় প্রকাশ করা হয়েছে। অবশ্য, এই প্রকাশনার সারমর্ম সম্পূর্ণ উক্ত গ্রন্হ থেকে নেয়া হয়নি। বুদ্ধের শিক্ষা অর্থগতভাবে খুবই গভীর এবং তাঁর গুণাবলী অফুরন্ত যা কেউ সহজভাবে প্রশংসা করে শেষ করতে পারে না।

সুতরাং, ইহা আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা, ভবিষ্যতে এই বইটি পুর্নমুদ্রনের সময়ে আরও বেশী সত্যনিষ্ঠ ও মূল্যবান বিষয়বস্তুর মাধ্যমে উৎকর্ষসাধন করে প্রকাশ করা।

বুদ্ধের শিক্ষার ইতিহাস

এই বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্হটি পুনর্বিবেচনাপূর্বক জাপানী সংস্করণ, বৌদ্ধ সাহিত্যের নতুন অনুবাদের উপর ভিত্তি করে সংকলন করা হয়েছে, যা ১৯২৫ সালের জুলাই মাসে Rev. Muan Kizuর তত্ত্বাবধানে এবং বৌদ্ধ সাহিত্যের নতুন অনুবাদ ও প্রসার নামক সংগঠনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্হের প্রথম জাপানী সংস্করণ সংকলন করেছিলেন অধ্যাপক Shugaku Yamabe এবং অধ্যাপক Chizen Akanuma তথা আরো অনেক জাপানী পন্ডিত ব্যক্তিদের দ্বারা, যা প্রকাশ করতে সময় লেগেছিল প্রায় ৫ বৎসর। Showa যুগে (১৯২৬-), বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্হের নতুন জনপ্রিয় সংস্করণ উক্ত সংগঠনের মাধ্যমে প্রকাশ করে সমগ্র জাপানে প্রচার করা হয়।

১৯৩৪ সালের জুলাই মাসে যখন জাপানে বিশ্ব বৌদ্ধ যুব সংস্হার সভা অনুষ্ঠিত হয়, তখন সমগ্র জাপান বৌদ্ধ যুব মৈত্রী সংঘের মাধ্যমে, বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্হের নতুন জনপ্রিয় সংস্করণটি বুদ্ধের শিক্ষা নামে Mr. D. Goddard এর সহযোগিতায় সংগঠনের কার্যক্রম হিসেবে ইংরেজীতে অনুবাদিত হয়। ১৯৬২ সালে, Mr. Yehan Numata, যিনি Mitutoyo যৌথ সংস্হার প্রতিষ্ঠাতা কর্তৃক আমেরিকায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের ৭০তম স্মারক বার্ষিকীতে "বুদ্ধের শিক্ষা" বইটির ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

১৯৬৫ সালে, Mr. Numata যখন টোকিওতে বৌদ্ধ ধর্ম উন্নয়ন সংস্থা গঠন করেন, তখন থেকে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় "বুদ্ধের শিক্ষা" নামক ইংরেজী সংস্করণ বইটি সংস্থার কার্যক্রমের অর্ন্তভুক্ত হয়ে সুচারুরূপে প্রচারিত হয়ে আসছে।

ইংরেজী ভাষার জগতে এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য, ১৯৬৬ সালে "বুদ্ধের শিক্ষা" বইটি সংশোধন-সংযোজনের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সদস্যগণ হলেন, অধ্যাপক Kazuyoshi Kino, Shuyu Kanaoka, Zenno Ishigami, Shinko Sayeki, Kodo Matsunami, Shojun Bando, এবং Takemi Takase অন্যতম। তাছাড়াও অধ্যাপক Fumio Masutani, Mr. N. A. Waddell, এবং Mr. Toshisuke Shimizu ও এই কমিটিতে সদস্যভুক্ত ছিলেন। অতঃপর, আধুনিক চিন্তা ধারার আলোকে বর্তমানের এই জাপানীজ-ইংরেজী সংস্করণ "বুদ্ধের শিক্ষা" বইটি প্রকাশিত হয়।

১৯৭২ সালে এই জাপানীজ-ইংরেজী সংস্করণের উপর ভিত্তি করে, অধ্যাপক Shuyu Kanaoka, Zenno Ishigami, Shoyu Hanayama, Kwansei Tamura, এবং Takemi Takase ইংরেজী সংস্করণের একটি সংকলন একই বৎসর প্রকাশ করেন।

পরবর্তীতে, অধ্যাপক Ryotatsu Shioiri, Takemi Takase, Hiroshi Tachikawa, Kwansei Tamura, Shojun Bando, এবং Shoyu Hanayama (প্রধান সম্পাদক) হিসেবে পুনঃ জাপানি ভাষায় "বুদ্ধের শিক্ষা" বইটি সংকলন করে, ১৯৭৩ সালে তা প্রকাশ করেন।

পুনরায়, ১৯৭৪ সালে, অধ্যাপক Kodo Matsunami, Shojun Bando, Shinko Sayeki, Doyu Tokunaga, Kwansei Tamura, এবং Shoyu Hanayama কে প্রধান সম্পাদক করে, "বুদ্ধের শিক্ষা" ইংরেজী সংস্করণটি Mr. Richard R. Steiner এর সহযোগিতায়, পুনঃ পর্যালোচনার মাধ্যমে সংকলন করা হয়। ইহা জাপানি সংস্করণ সম্বলিত ছিল (১৯৭৩ সালে প্রকাশিত)। ফলে

“বুদ্ধের শিক্ষা” বইটির জাপানি-ইংরেজী সংস্করণটি বর্তমান অবয়বে আত্নপ্রকাশ করে।

১৯৭৮ সাল পর্যন্ত, অধ্যাপক Shigeo Kamata এবং Yasuaki Nara কে সংকলন কমিটির সদস্যভুক্ত করে, আধুনিক সমাজে এই বইটির অর্ন্তস্পর্শী আবেদন নিশ্চিত করে বার্ষিক মিটিং অনুষ্ঠিত হয়, এবং এই মহৎ প্রচেষ্টা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

মে, ১৯৮৬

বুদ্ধের শিক্ষা গ্রন্থের অনুক্রমণিকা

মানব জীবন	পৃষ্ঠা নং	লাইন
জীবনের অর্থ	5	3
এ পৃথিবীর প্রকৃত অবস্হান	80	20
আদর্শ জীবন যাত্রা	209	9
মিথ্যা দৃষ্টি সম্পন্ন জীবন	39	21
জীবনের সঠিক ধারণা	36	20
জীবনের প্রতিকূল ধারণা	50	1
মোহ পরায়ণ ব্যক্তিগণ (পৌরাণিক কাহিনী	104	23
এক ব্যক্তির জীবন (পৌরাণিক কাহিনী)	75	22
যদি কেহ লোভ ও দ্বেষপূর্ণ জীবন যাপন করে (পৌরাণিক কাহিনী)	75	10
বয়স, রোগ ও মৃত্যু আমাদেরকে কি শিক্ষা দিতে পারে ? (কাহিনী)	78	9
মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী (কাহিনী)	79	5
পাঁচটি জিনিস এ পৃথিবীতে কেহই অর্জন করতে পারে না	42	20
এই পৃথিবীর চারটি সত্য	43	6
মোহ ও সর্বজ্ঞতা উভয়েই মনের মধ্যেই উৎপন্ন হয়	43	18
২০টি জিনিস খুবই কঠিন কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্যে অর্জন করা খুবই মূল্যবান	109	18
শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস		
শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস হলো আগুনের ন্যায়	146	13
শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের ৩টি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান	147	18
শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস হলো স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা	148	18

অকৃত্রিম মনে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের উৎপত্তি হয়	148	2
সত্যকে দর্শন করা কঠিন যেমন অন্ধলোক হাতীকে স্পর্শ করে তার আসল রূপ বর্ণনা করার ন্যায় (পৌরাণিক কাহিনী)	63	12
বুদ্ধের প্রকৃত রূপ কোথায় অবস্থান করছে তা তাঁর সঠিক শিক্ষার মাধ্যমে দর্শন করা যায় (পৌরাণিক কাহিনী)	65	14
বুদ্ধের রূপ প্রচণ্ড আবেগের মাঝেই লুকায়িত (পৌরাণিক কাহিনী)	62	9
সন্দেহ, শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসকে ব্যাহত করে	149	2
বুদ্ধ সমগ্র বিশ্বের পিতা সদৃশ আর মানুষেরা হলো তাঁর সন্তান/সন্ততি সদৃশ	31	7
বুদ্ধের প্রজ্ঞা মহা সমুদ্রের ন্যায় প্রশস্ত	30	3
বুদ্ধের প্রতিভা মহা করুণায় পরিপূর্ণ	13	1
বুদ্ধের করুণা চিরন্তন	14	1
বুদ্ধের কোন রূপ কায়া নেই	11	5
বুদ্ধ তাঁর সারা জীবন ধর্ম দেশনা করেছিলেন	20	8
বুদ্ধ মানুষের মনে বিশ্বাস উৎপাদনে জন্ম-মৃত্যুকে অলীক কাহিনী হিসেবে ব্যবহার করতেন	20	8
বুদ্ধ যুক্তিযুক্ত পৌরাণিক কাহিনীর অবলম্বনে জনগণকে দুঃখ থেকে রক্ষা করতেন	16	12
বুদ্ধ যুক্তিযুক্ত পৌরাণিক কাহিনীর অবলম্বনে জনগণকে দুঃখ থেকে রক্ষা করতেন	17	5
সর্বজ্ঞতার জগত	210	19
বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের অনুসারী হওয়া	145	11
কিভাবে শীল রক্ষা করতে হয়, মনকে সমহিত করা হয় এবং বিজ্ঞতার সাথে কাজ করতে হয় তা শিক্ষা করা	133	18
আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ	136	5
সর্বজ্ঞতার অন্য স্তরে পৌঁছার ৬টি উপায়	137	19
চার প্রকার সম্যক প্রচেষ্টার প্রণালী	137	9

৪টি বিবেচ্য বিষয়কে বিবেচনা করতে হবে	137	3
সর্বজ্ঞতাজ্ঞান অর্জনে পঞ্চস্কন্ধ শক্তি	137	15
মনের চার প্রকার সীমহিন অবস্থা	139	23
যাঁরা চারি আর্য সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন	35	9
মানুষের মৃত্যু ও অস্থায়ী জীবন	11	5
যাঁরা বুদ্ধ অমিতাভের নাম স্মরণ করবেন তাঁরা তাঁর শুদ্ধাবাসে জন্ম গ্রহণ করবেন	94	2
নিজেকে একটি আলো হিসেবে তৈরী কর, নিজের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর	9	3
মানসিক প্রশিক্ষণ		
নিজের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কি তা নিজেকে উপলব্ধি করতে হবে (রূপক কাহিনী)	123	7
তোমার প্রথম পদক্ষেপে সতর্কতা অবলম্বন কর	109	14
তুমি যা অনুসন্ধান কর তা ভুলে যেও না (রূপক কাহিনী)	124	17
যে কোন কিছুতে সফলতা অর্জন করতে হলে, অনেক পরিশ্রম সহ্য করতে হয় (কাহিনী)	129	18
নিজেকে দৃঢ়তার সাথে রক্ষা কর, বারংবার পরাজিত হওয়ার পরেও (কাহিনী)	141	6
অসন্তোষজনক অবস্থায়ও তোমার মনকে অশান্তির দিকে নিয়ে যাবে না (কাহিনী)	102	11
যাঁরা আর্য সত্যকে বুঝে ও অনুশীলন করে তাঁরা অন্ধকারে আলো নিয়ে অগ্রসর হওয়ার ন্যায়	36	1
এক জন লোক যেখানেই যাবে না কেন, সে মানবীয় জীবনে বুদ্ধের শিক্ষাকে খুঁজে পাবে (কাহিনী)	132	8
মানুষেরা তাদের মন যেদিকে নিয়ে যায় সেদিকে গমন করে	100	15
বুদ্ধের শিক্ষার আলোচ্য বিষয় হলো নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করা	9	15

প্রথমে তোমার মনকে নিয়ন্ত্রণ কর	176	1
যদি তুমি তোমার মনকে নিয়ন্ত্রণ কর	100	19
মনের বিভিন্ন স্তর (পৌরাণিক কাহিনী)	98	2
অহঙ্কার মনের বৈশিষ্ট্য নয়	41	12
তোমাকে প্রভাবিত করার দায়িত্ব মনকে দেবে না	9	8
তোমার মনকে জয় কর	126	10
তোমার মনের শিক্ষক হও	10	6
শরীর, মুখ ও মন থেকেই সকল অকুশল নিঃসৃত হয়	72	21
মন ও বাক্যের মধ্যে সম্পর্ক	103	15
এই দেহ কিছুই নয় কিন্তু একটি ধার করা জিনিস (কাহিনী)	118	3
এই দেহ সকল প্রকার অশুভ পদার্থে পরিপূর্ণ	107	21
কোন জিনিসের প্রতি লালসা গ্রস্থ হবে না	9	8
দেহ, মুখ ও মনকে পবিত্র রাখ	102	1
পক্ষপাতহীন হও ও দৃঢ়তার সাথে পরিশ্রম কর (কাহিনী)	140	16
মানবীয় দুঃখ		
মানবীয় দুঃখের উৎপত্তি আসক্তিপরায়ণ মন হতে	38	6
দুঃখকে কিভাবে প্রতিরোধ করা যায়	11	14
মোহ ও অবিদ্যা হতে সর্বজ্ঞতাজ্ঞানে প্রবেশ	51	23
কিভাবে দুঃখরূপ বন্ধন হতে মুক্তি লাভ করা যায়	96	1
যখন প্রচণ্ড আবেগের আগুন দূরীভূত হয়, তখন নূতন তেজ দীপ্ত সর্বজ্ঞতাজ্ঞান অর্জন হয়	117	2
কামভাব মোহের উৎস স্বরূপ	71	16
কামভাব সম্পর্কে চিন্তা করা মানে ফুলের মধ্যে লুকায়িত সর্পের ন্যায়	71	20
জ্বলন্ত ঘরের মধ্যে কোন প্রকার আসক্তি থাকে না (পৌরাণিক কাহিনী)	17	1
অকুশলের উৎস প্রচণ্ড আবেগ	97	19
এ বিশ্ব আগুনে প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে	69	8

যদি মানুষেরা খ্যাতি ও সম্মানের পেছনে ধাবিত হয়, ইহা তাদেরকে প্রজ্জ্বলিত করার ন্যায়	98	18
যদি কোন লোক লোভের বশবর্তী হয়ে সম্পদের পেছনে দৌড়ে, সে নিজেকে ধ্বংস করে	98	23
বিজ্ঞ ব্যক্তি ও মূর্খ ব্যক্তি তাদের মৌলিক স্বভাবের দ্বারা ভিন্ন	110	22
বোকা লোকেরা তাদের ভুল সম্পর্কে সজাগ নয় (পৌরাণিক কাহিনী)	116	10
বোকা লোকেরা অন্যলোকদের শুধু ফলের মাধ্যমে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দর্শন করে ঈর্ষান্বিত হয় (পৌরাণিক কাহিনী)	116	15
যে পথে এক জন বোকা লোক কাজ করতে উপযুক্ত মনে করে (পৌরাণিক কাহিনী)	121	2
প্রাত্যহিক জীবন		
দান দেয়া ও এগুলোর কথা ভুলে যাওয়া	138	15
সম্পদ ব্যতীত সাত প্রকারের দান	138	22
সম্পদ লাভের উপায় (কাহিনী)	119	25
কিভাবে সুখ অর্জন করা যায়	109	7
প্রাপ্ত সহৃদয়তাকে কখনও ভুলা যায় না (কাহিনী)	114	21
বিভিন্ন প্রকারের মানুষের বৈশিষ্ট্য	74	14
যে প্রতিশোধ মূলক মনোভাবকে প্রাধান্য দেয় সে সবসময় দুঃভাগ্যের গর্তে পতিত হয়	108	23
বিক্ষুব্ধ মনকে কিভাবে প্রশমিত করা যায় (কাহিনী)	206	9
অন্যের সমালোচনায় উত্তেজিত না হওয়া (কাহিনী)	101	6
তুমি পোষাক, খাদ্য ও বাসস্থানের জন্যে জীবন যাপন করছো না	169	18
খাদ্য ও পোষাক আরাম-আয়েশের জন্য নয়	96	15
খাদ্য গ্রহণ করার সময় কি চিন্তা করতে হয়	172	6
পোষাক পরিধানের সময় কি চিন্তা করতে হয়	171	9

শয্যা গ্রহণ করার সময় কি ভাবতে হয়	172	17
উষ্ণ ও ঠান্ডার সময় কি ভাবতে হয়	172	9
দৈনন্দিন জীবনে কি ভাবতে হয়	170	17
সরকার		
একটি জাতীয় অগ্রগতির পথে নিয়ে যাওয়ার উপায়	191	16
একজন শাসকের পথ	194	20
একজন শাসক আগে নিজেকে শাসন করবে	192	18
আদর্শ শাসন হলো মানুষের মনকে প্রশিক্ষণ দেয়া	193	18
মন্ত্রী ও পদস্থ ব্যক্তিগণ কিভাবে আচরণ করবেন	197	12
একজন বিচারক কিভাবে অপরাধীর সাথে আচরণ করবেন	196	13
জাতীয় জীবনে ধর্ম শিক্ষার ফলাফল	193	11
সামাজিক সমস্যগুলো কিভাবে সাফল্যের সাথে সমাধান করবে	199	7
অর্থনীতি		
অবশ্যই যথাযথভাবে বস্তুর ব্যবহার করতে হবে (কাহিনী)	184	6
কোন সম্পদই সর্বদা নিজের হতে পারে না	183	18
কোন জিনিস শুধু একা একা জমা করে রাখার জন্য নয়	190	5
কিভাবে সম্পদ অর্জন করা যায় (কাহিনী)	119	25
পারিবারিক জীবন		
পরিবার হলো এমন এক স্থান যেখানে সকল সদস্যদের মন একে অপরের সংস্পর্শে আসে	181	18
যে জিনিস দ্বারা পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়	177	3
একজন পিতা-মাতার প্রতি মহা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপায়	181	12
পিতা-মাতার প্রতি সন্তানদের যথাযথ দায়িত্ব ও কতর্ব্য	177	16
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক	178	17
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একই বিশ্বাস থাকা উচিৎ (কাহিনী)	186	19
মহিলাদের জীবন		

চার প্রকার মহিলা	185	8
বিভিন্ন প্রকারের স্ত্রী	187	12
যুবতী স্ত্রীর জন্য শিক্ষা (কাহিনী)	187	6
বিবাহিতা স্ত্রীলোকদের জন্য সুবিধা	185	22
যুবতী ও সুন্দরী মহিলাদের সুবিধার জন্য	189	2
পুরুষেরা কিভাবে মহিলাদের প্রতি ব্যবহার করবেন	107	13
স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য	186	14
আদর্শ মহিলার দায়িত্ব ও কর্তব্য	190	2
দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক কিরূপ ?	187	12
গৃহত্যাগী ভ্রাতৃসংঘের পথ		
একজন লোককে গৃহত্যাগী ভ্রাতৃসংঘ বলা যাবে না যদিও সে ভিক্ষু বেশ পরিধান করেন বা সূত্র আবৃত্তি করেন	163	3
গৃহত্যাগী ভ্রাতৃসংঘ বিহার বা বিহারের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নয়	160	1
লালসাপূর্ণ মানুষ প্রকৃত ভিক্ষু হতে পারেন না	160	7
একজন গৃহত্যাগী ব্যক্তির প্রকৃত জীবন ধারণ করা উচিৎ	162	1
সমাজ জীবন		
সমাজ জীবনের অর্থ	202	12
এই পৃথিবীতে সমাজের প্রকৃত অবস্থান	80	20
তিন প্রকারের সংগঠন	202	17
একটি প্রকৃত সমাজ জীবন	203	3
মহান আলো যা অন্ধকারকে আলোকিত করে	201	7
মানবীয় সম্পর্কের মধ্যে ঐক্য	203	13
যা সামাজিক সংগঠনকে ঐক্যতার মাধ্যমে পরিচালিত করে	204	15
আদর্শ ভ্রাতৃসংঘ	203	20
বৌদ্ধ অনুসারীদের সামাজিক আদর্শ	210	11

যারা আইনকে অমান্য করে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়	115	16
যারা অন্যের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ও কলহপূর্ণ তারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় (পৌরাণিক কাহিনী)	115	16
বয়োজেষ্ঠ্যদের সম্মান করা (কাহিনী)	111	9
শিক্ষকের প্রতি তাঁর ছাত্রের কর্তব্য এবং ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের দায়িত্ব	178	4
বন্ধুত্বের জন্য নীতিসমূহ	179	1
কিভাবে একজন ভাল বন্ধু পছন্দ করবে	180	10
একজন চাকর ও তার মালিক কিভাবে একে অপরকে ব্যবহার করবে	179	10
অপরাধীদের প্রতি আচরণ	190	13
যাঁরা ধর্ম শিক্ষা দেবেন তাঁদের সম্পর্কে বিবেচনা করতে হবে	164	9

সংস্কৃত শব্দকোষ
(বর্ণানুক্রমিক অনুসারে)

অনাত্মা (স্বার্থপরতাহীন)

বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে ইহা একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। এই পৃথিবীর সকল অস্তিত্বসম্পন্ন বস্তু এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু, শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে এগুলোর কোন প্রকার বাস্তব অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় না। বৌদ্ধ ধর্মের জন্য ইহা খুবই প্রকৃতিজাত, যা সকল প্রকার অস্তিত্বের অস্হায়ীত্বের পক্ষে কথা বলে, এরূপ অস্হায়ী অস্তিত্বের কারণে মনের মধ্যে কোন প্রকার স্হায়ী অস্তিত্বের এমন বিশ্বাস গড়ে উঠতে পারে না; যা আমি, আমার বলে দৃঢ়ভাবে দাবী করতে পারে। অনাত্মাকে তাই স্বার্থপরতাহীন হিসেবেও অনুবাদ করা যেতে পারে।

অনিত্য (অচিরস্হায়ী বা অস্হায়ী)

ইহা বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। এই পৃথিবীর সকল অস্তিত্ব সম্পন্ন বস্তু এবং ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু অবিরামগতিতে পরিবর্তীত হচ্ছে; এবং এক মুহূর্ত্তের জন্যও একই বস্তু হিসেবে বিদ্যমান থাকছে না। সকল বস্তুই ভবিষ্যতে কোন একদিন মৃত্যু বা সমাপ্তির মুখামুখি হবেই। এই অনিবার্য পরিস্হিতিই দুঃখের মূল কারণ। জাগতিক চিরন্তন সত্যের এই ধারণা কেবলমাত্র দুঃখবাদ এবং অবিশ্বাসী মতবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করলে হবে না, কারণ অনিত্যতা এবং দুঃখ ধর্মীতা এরা উভয়েই অগ্রসরমান ও পুনর্গঠনকারী; যা অবিরামগতিতে পরিবর্তীত হচ্ছে, সেই পরম বাস্তবতাকে প্রকাশ করে।

বোধিসত্ত্ব (বুদ্ধত্বজ্ঞান অর্জনের জন্য কঠোরভাবে পরিশ্রমকারী)

মূলতঃ, এই নামটি বুদ্ধত্বজ্ঞান অর্জন করার পূর্বে সিদ্ধার্থ গৌতমকেই ইঙ্গিত করে। মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারতা লাভ করার পরে, যাঁরা বুদ্ধত্বজ্ঞান অর্জনে কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তাঁদের সকলকে এই নামে ডাকা হয়। পরিশেষে, যাঁরা বুদ্ধত্বজ্ঞান অর্জনে অন্যকে সাহায্য করেন এবং একই উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে মহাকরুণাজাত কঠোর পরিশ্রম করেন, তাঁদেরকেও প্রতিকীভাবে বোধিসত্ত্ব হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ বোধিসত্ত্বদের মধ্যে অবলোকিতেশ্বর (Kwannon), স্মৃতিগর্ভ (Jizo), মঞ্জুশ্রীই(Mon-ju) কেবল মাত্র পরিচিত।

বুদ্ধ (যিনি সর্বজ্ঞ)

আসলে, গৌতম সিদ্ধার্থ (শাক্যমুণি) যিনি বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক তাঁকে এই নামে সম্বোধন করা হয়। তিনিই ভারতে ২৫০০ বৎসর পূর্বে, ৩৫ বৎসর বয়সে, বুদ্ধত্বজ্ঞান অর্জন করেছিলেন। সাধারণত সকল বৌদ্ধরাই শেষ পর্যন্ত বুদ্ধত্বজ্ঞান অর্জনই কামনা করে থাকেন। এই লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে বিভিন্ন পথানুসারে বৌদ্ধরা বিভিন্ন নিকায়ে বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়েছে। মহাযান বৌদ্ধ ধর্মে, ঐতিহাসিক শাক্যমুণি বুদ্ধ ছাড়াও, অনেক বুদ্ধের উপস্থিতি বিদ্যমান, যেমন-অমিতাভ (Amitabha, Amida), মহাবৈরোচনা (Dainichi), ভৈষর্য্যগুরু (Yakushi), ইত্যাদিকে, বুদ্ধের শিক্ষার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। জাপানী বৌদ্ধ ধর্মের Pure Land এর ন্যায় বৌদ্ধ ধর্মের ধারণায় প্রভাবিত, যে কোন ব্যক্তি Pure Land এ পুনঃর্জন্ম গ্রহণের পরে বুদ্ধ হয়, এই অর্থে যাঁরা মৃত্যু বরণ করেছেন সচরাচর তাঁদের সকলকেই "বুদ্ধ" বলা হয় বা জাপানিতে তাঁদেরকে Hotoke বলা হয়।

ধর্ম (সত্য শিক্ষা)

এই শিক্ষা সর্বজ্ঞ বুদ্ধের দ্বারা ভাষিত হয়েছে। এই শিক্ষা তিন প্রকারের অনুশাসনের সমন্বয়ে গঠিতঃ, যথা-সূত্র, (যে শিক্ষা বুদ্ধ নিজেই দেশনা করেছেন), বিনয়, (বুদ্ধের দ্বারা নির্দেশিত নিয়মানুবর্তীতা), এবং অভিধর্ম, (সূত্র এবং বিনয় সম্পর্কে পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন পন্ডিত ব্যক্তিদের দ্বারা লিখিত বা আলোচিত মনোবিজ্ঞান জাতীয় অর্থকথা সমূহ)। এই তিনটিকেই ত্রিপিটক বলা হয়। ধর্ম হলো বৌদ্ধদের কাছে এই তিনটি রত্নের একটি।

কর্ম (কার্য)

যদিও মূলতঃ এই পদের দ্বারা সহজভাবে "কার্য"কে বুঝায়, কিন্তু এর সাথে কার্য-কারণ-সম্বন্ধ তত্ত্বও জড়িত রয়েছে; যা একজন মানুষের অতীত সকল কার্য্যের ফল হিসেবে সৃষ্ট সম্ভাব্য শক্তি বিশেষ। ইহা হলো, আমাদের প্রত্যেকের ভাল-মন্দ কার্যের উপর ভিত্তি করে উৎপন্ন সুখ-দুঃখ বা উপেক্ষানুভূতি সমূহ। ইহা বিশ্বাস করা হয় যে, যদি একটি কুশল বা ভালো কর্ম বার বার সম্পাদন করা হয়, তাহলে সেই কুশল

কাজের শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, এবং এই সম্ভাব্য শক্তি ভবিষ্যতে অবিরাম কুশল কর্ম সম্পাদনের ইচ্ছাকে প্রভাবিত করে। কর্ম সম্পাদনের সুত্র মতে তিন প্রকারে কর্ম সম্পাদন করা হয়; এগুলো হলো, কায়, মন, ও বাক্যের মাধ্যমে।

মহাযান (বড় গাড়ী বা যান)

বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে, প্রধানত দু'ধারার শিক্ষা পরিলক্ষিত হয়ে আসছে, এদের একটি হলো, থেরবাদ এবং অন্যটি হলো মহাযান। থেরবাদ বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল শ্রীলংকা, বার্মা, থ্যাইল্যান্ড, লাওস, কম্বোডিয়া ইত্যাদি দেশে। অন্যদিকে মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল তিব্বত, চীন, কুরিয়া, জাপান ইত্যাদি দেশে। মহাযান এই পদের মাধ্যমে বুঝানো হচ্ছে, জন্ম-মৃত্যুর এই সংসারে সকলেই দুঃখে জর্জরিত। এই দুঃখ হতে মুক্তি লাভে সকলকে শ্রেনী বৈষম্য ভুলে গিয়ে বুদ্ধজ্ঞান অর্জনের জন্য দিক নির্দেশনা দান করা।

নির্বাণ (সম্পূর্ণ স্থির এবং জাগ্রত অনাসক্ত অবস্থা)

আক্ষরিকভাবে, ইহার অর্থ হলো 'নিভিয়ে দেয়া, বের করে দেয়া বা উপশম লাভ করা'। ইহা চিত্তের এমন এক অবস্থা যেখানে সম্যক প্রজ্ঞা সাধনার ভিত্তিতে মানুষের সকল প্রকার আসক্তি এবং প্রচন্ড আবেগ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়। যাঁরা মনের এই পর্যায়ে উপনীত হয়েছেন, তাঁদেরকে বুদ্ধ বলা হয়। গৌতম বুদ্ধ ৩৫ বৎসর বয়সে এই অবস্থানে উপনীত হয়েছিলেন এবং বুদ্ধত্বজ্ঞান অর্জন করেছিলেন। অতএব, বর্তমানে ইহা বিশ্বাস করা হয় যে, তিনি পরিনির্বাপিত হওয়ার পরেই এই স্থির অবস্থানে পৌঁছেছেন, কারণ মানব দেহ যে পর্যন্ত এ ধরাধামে অবস্থান করে, সে পর্যন্ত মানবীয় সকল অবস্থা এই দেহকে ভিত্তি করে বিদ্যমান থাকে।

পালি (ভাষা)

এই ভাষা থেরবাদ বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থে ব্যবহার করা হয়েছে। খুবই প্রাচীনতম বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থ এই ভাষায় লিখিত হয়েছিল বলে বিশ্বাস করা হয়। ইহা এক প্রকার প্রাকৃত ভাষা, যা সংস্কৃত ভাষার আঞ্চলিক রূপ বিশেষ; পালি এবং সংস্কৃত ভাষার মধ্যে

তেমন বড় ধরনের পার্থক্য নেই। যেমন-পালি ভাষায় ধম্ম, সংস্কৃত ভাষায় ধর্ম; পালি ভাষায় নিব্বাণ, সাংস্কৃত ভাষায় নির্বাণ ইত্যাদি। (সাংস্কৃতে বিস্তারিত দেখুন)

পারমিতা (এক তীর হতে অন্য তীরে অতিক্রমের বাহন)

"অন্য তীরে অতিক্রম করা মানে" বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন নিয়মানুবর্তীতা অনুশীলনের মাধ্যমে বুদ্ধ ভূমিতে উপনীত হওয়া। সাধারণত নিম্মোক্ত ৬টি কার্যকর নিয়মানুবর্তীতার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে যেগুলোর দ্বারা জন্ম-মৃত্যুর এই বিশ্ব অতিক্রম করে জ্ঞানের জগতে উপনীত হতে পারে। এগুলো হলো- দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য, সমাধি ও প্রজ্ঞা। জাপানের সংস্কৃতিতে পালিত বসন্ত ও শরতে Higan সপ্তাহ এই ধারণা হতে অনুসৃত হয়েছে।

প্রজ্ঞা (আধ্যাত্মিক জ্ঞান)

ইহা ছয় পারমিতার একটা। মনের ক্রিয়া যা মানুষকে ভুল-ভ্রান্তি হতে এবং সত্য ও মিথ্যাকে বুঝতে পারে মতো উপলব্ধি জাগ্রত করতে সাহায্য করে। যিনি এই প্রজ্ঞা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁকে বুদ্ধ বলা হয়। সুতরাং ইহা সর্বোত্তম পরিমার্জিত এবং আলোকিত জ্ঞান, যা অন্য সাধারণ মানবীয় জ্ঞান থেকে আলাদা।

সংঘ (বৌদ্ধ ভ্রাতৃ সংঘ)

ইহা ভিক্ষু সংঘ, ভিক্ষুণী সংঘ, উপাসক সংঘ, এবং উপাসিকা সংঘ নিয়ে গঠিত। প্রাচীন কালে ইহা গৃহত্যাগী পুরুষ ও মহিলাদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের উত্থানের পরবর্তী সময়ে, পুরুষ বা মহিলা শ্রেণী বিন্যাস ব্যতিরেকে, যাঁরা বোধিসত্ত্ব জীবনের লক্ষ্যে জীবন ধারণ করেন, তাঁদের সকলকেই একসাথে ভ্রাতৃ সংঘের সদস্যভুক্ত করা হয়। এই সংঘ বৌদ্ধ ধর্মের ত্রিরত্নের মধ্যে একটি রত্ন।

সাংস্কৃত (ভাষা)

প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ট সাহিত্যিক ভাষা; যা ইন্দো-ইউরোপিয়ান পরিবারের ভাষার একটি। ইহা বৈদিক ও শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃত এ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত। মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের

গ্রন্থগুলো এই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হয়েছিল, যা বৌদ্ধ হাইব্রিড সাংস্কৃত (Buddhist Hybrid Sanskrit) বলে বলা হয়।

সংসার (পুনরায় দেহধারণ)

অবিরাম, অতীত থেকে বর্তমানে, বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে এই মায়াময় ৬টি রাজ্যে আমরা পুনঃপুনঃ জন্ম-মৃত্যুর যাঁতাকলে ঘুরপাক খাচ্ছি। এই ৬টি রাজ্য হলো- নিরয়, পিত্তিবিসয়, তিরচ্ছানযোনি, অসূর, মানব ও স্বর্গ। বুদ্ধত্ব লাভ করা পর্যন্ত, কেহই সংসারের এই ভব চক্র থেকে মুক্ত হতে পারবে না। যাঁরা এ ভব চক্র থেকে মুক্ত তাঁদেরকে বুদ্ধ বলা হয়।

শূন্যতা (বস্তুর বিদ্যমানতাহীন)

এই ধারণা হলো, জগতের সকল কিছুতে বিদ্যমানতা বলতে কিছু নেই। আবার স্থায়ীত্ব বলতেও কিছুই নেই। যা বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে একটি মৌলিক আলোচ্য বিষয়। যেহেতু সকল কিছুই কার্য-কারণ-তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই হচ্ছে, সেহেতু সেখানে কোন কিছুর স্থায়ীত্বের প্রশ্নই আসে না। কিন্তু, কারো উচিৎ নয় যে, কোন বস্তুর বিদ্যমানতার ধারণাকে আঁকড়ে ধরে রাখা, আবার এও ঠিক নয় যে একে ত্যাগ করা। সকল প্রাণী বা অ-প্রাণীর মধ্যে সম্বন্ধযুক্ত। সুতরাং, কোন একটি ধারণা, বা ভাবতত্ত্বকে একমাত্র সত্য হিসেবে আঁকড়ে ধরাটা বোকামিতা মাত্র। ইহাই মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রজ্ঞা সূত্রের মৌলিক অন্তঃপ্রবাহ স্বরূপ।

সূত্র (ধর্ম গ্রন্থ)

বুদ্ধের শিক্ষা সম্বলিত স্মারক স্বরূপ। এই পদটির আদি অর্থ হলো "সুতা", যার দ্বারা বিশাল ধর্ম শিক্ষাকে বা বিজ্ঞানকে সংক্ষিপ্তাকারে বন্ধন করা হয়েছে। ইহা হলো পবিত্র ত্রিপিটকের অংশ।

থেরবাদ (অগ্রজদের শিক্ষা)

দক্ষিণাঞ্চলীয় বৌদ্ধ ধর্ম সাধারণত এই নামে পরিচিত। "থের" অর্থ হলো

অগ্রজ। তাই এই ধারার বৌদ্ধ ধর্মকে থেরবাদ বলা হয়। যাঁরা ঐতিহাসিকভাবে সংরক্ষণশীল মহৎ ভিক্ষুদেরকে সমর্থন করেন, যাঁরা খুবই কঠোরভাবে বিনয়কে আঁকড়ে ধরে রেখেছেন, তাঁদেরকে থেরবাদী বলা হয়। তাঁরা প্রগতিশীল ও অন্য শ্রেণীর ভিক্ষুদের মতামতকে গ্রহণ করেননি, (বিশ্বাস করা হয় যে তাঁরা পরবর্তীতে মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম বা উত্তরাঞ্চলীয় বৌদ্ধ ধর্মের ধারা প্রচার করেছিলেন)। এই ধরনের বিপরীত ধারার বৌদ্ধ ধর্ম প্রথম দিক থেকেই শুরু হয়েছিল; বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভের কয়েক শতাব্দী পর। তখন মহাদেব নামক এক প্রগতিশীল ভিক্ষু, দৃঢ়তারসাথে পাঁচ প্রকার শীলের ব্যাখ্যার মাধ্যমে মুক্তির পথের দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন। এই প্রচারণা থেরবাদ ও মহাসাংঘিকা হিসেবে বিভক্ত করে ফেলে, যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের সূত্রপাত হয়।

ত্রিপিটক (তিনটি পাত্র বা আঁধার)

বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থের তিনটি শাখা, যার অর্থ হলো ধর্ম। এগুলো হলো-সূত্রাবলী, যে গুলোতে বুদ্ধের শিক্ষা বিদ্যমান, বিনয়-যেখানে নিয়মানুবর্তীতা সম্পর্কে লিপিবদ্ধ আছে এবং অভিধর্ম-যেখানে বিভিন্ন অর্থকথার মাধ্যমে বুদ্ধের ধর্ম ও বিনয় সম্পর্কে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে চীন ও জাপানের মহান ভিক্ষু সংঘরা বৌদ্ধ ধর্ম সংক্রান্ত গ্রন্হ রচনা করেছিলেন ঐগুলো ও ধর্মশাস্ত্রে যোগ করা হয়েছিল। (ধর্মে দেখুন)

অঙ্গুত্তর নিকায়

ভিক্ষুগণ, এই পৃথিবীতে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন যাঁর জন্ম জগতের সকল প্রাণীকে সেবা করার জন্যে, সকল প্রাণীর সুখের জন্য; যিনি এই স্বর্গ-মর্ত্যের সকলকে তাঁর করুণার জলে সিক্ত করেন, সকলকে উপকার করেন, মঙ্গলের জন্যে এবং সুখের জন্য কাজ করেন। তিনি কে ? তিনি হলেন তথাগত, যিনি অরহৎ, যিনি সর্বজ্ঞ। ভিক্ষুগণ, তিনিই সেই ব্যক্তি।

ভিক্ষুগণ, এ পৃথিবীতে স্পষ্টভাবে কোন কিছু প্রকাশ করে এমন ব্যক্তির দর্শন লাভ করা খুবই কঠিন। তিনি কে ? তিনি হলেন তথাগত, যিনি অরহৎ, যিনি সর্বজ্ঞ। তিনিই সেই ব্যক্তি।

ভিক্ষুগণ, এই পৃথিবীতে বিশিষ্ট ব্যক্তির সন্ধান লাভ করা কষ্টকর। তিনি কে ? তিনি হলেন তথাগত, যিনি অরহৎ, যিনি সর্বজ্ঞ। তিনিই সেই ব্যক্তি।

ভিক্ষুগণ, এক ব্যক্তির মৃত্যুতে সবাই দুঃখ প্রকাশ করে। তিনি কে ? তিনি হলেন তথাগত, যিনি অরহৎ, যিনি সর্বজ্ঞ। তিনিই সেই ব্যক্তি।

ভিক্ষুগণ, এ পৃথিবীতে এক ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন যিনি অতুলনীয়। তিনি কে ? তিনি হলেন তথাগত, যিনি অরহৎ, যিনি সর্বজ্ঞ। তিনিই সেই ব্যক্তি।

ভিক্ষুগণ, কোন ব্যক্তি স্পষ্টভাবে কোন কিছু প্রকাশ করা মানে গভীর অর্থপূর্ণ চোখ, গভীর জ্ঞানলোক, এবং গভীর ঔজ্জ্বল্যতাকে বুঝায়। তিনি কে ? তিনি হলেন তথাগত, যিনি অরহৎ, যিনি সর্বজ্ঞ। তিনিই সেই ব্যক্তি। (অঙ্গুত্তর নিকায় ১-১৩)

বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার সংস্থা এবং বুদ্ধের শিক্ষা গ্রন্থের বিতরণ প্রসঙ্গ

বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার সংস্থার কথা বলতে গেলে বিনয়ী ব্যবসায়ী Mr. Yehan Numata'র কথা এসে যায়, যিনি Mitutoyo প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতাও।

তিনি ১৯৩৪ সালে খুবই মূল্যবান পরিমাপক যন্ত্র উদ্ভাবনের মাধ্যমে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করেন। ব্যবসার সফলতা নির্ভর করে স্বর্গ, মর্ত্য ও মানুষের মাঝে একটি সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্কের মাধ্যমে যা ছিল তাঁর আসল প্রত্যয় এবং মানবীয় মনের পরিপূর্ণতা লাভ করা সম্ভব শুধুমাত্র প্রজ্ঞা, করুণা ও সাহসিকতার ন্যায় বিচক্ষণতার সু-সমন্বয়ের দ্বারা। তিনি সবকিছুই এই প্রত্যয়ের উপর ভিত্তি করে পরিমাপক যন্ত্রের উদ্ভাবন ও উৎকর্ষ সাধনে এবং মানবীয় মনের উন্নতি সাধনে সক্রিয় ছিলেন।

তাঁর বিশ্বাস হলো এই যে, একমাত্র মানবীয় মনের পরিপূর্ণতা সাধনের মাধ্যমেই বিশ্ব শান্তি অর্জন সম্ভব, আর এই কারণেই বুদ্ধের শিক্ষা এই পৃথিবীতে বিদ্যমান। অতএব, তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার সাথে সাথে, তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে বৌদ্ধ সংগীত, বুদ্ধের ছবি ও শিক্ষার প্রচার এবং আধুনিকীকরণের জন্যে কঠোর প্রচেষ্টা চালান।

১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে, তিনি ব্যক্তিগত অর্থায়নে, বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার কল্পে একই প্রতিষ্ঠানভুক্ত একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করেন, এবং একই সময়ে, বিশ্ব শান্তি অর্জনে সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবেও। অতপর, বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার সংস্থা একটি সাধারণ সংগঠন হিসেবে তার যাত্রা শুরু করে।

কিভাবে বুদ্ধের শিক্ষা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, এবং কিভাবে বুদ্ধের মহা প্রজ্ঞা ও করুণার আলো প্রত্যেক মানুষকে উপকৃত এবং আনন্দিত করেছিল ? এই বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার সংস্থার কাজ ছিল উক্ত সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্যে উপায় অনুসন্ধান

করা, যা প্রতিষ্ঠাতার ইচ্ছাকে বজায় রেখেছে।

সংক্ষিপ্তভাবে, বুদ্ধের শিক্ষাকে প্রচারের জন্যে সম্ভাব্য সকল প্রকার উদ্যোগকে, অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে উক্ত বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার সংস্থা দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে।

"বুদ্ধের শিক্ষা" বইটি আমাদের এদেশের ধর্মীয় ইতিহাসের প্রতিফলনের ফসল স্বরূপ। তেমন কিছু এখনও খুব কমই লিখিত হয়েছে, যাকে আমরা জাপানীদের ধারণা মতে অনুবাদিত বুদ্ধের শিক্ষা নামক বই বলতে পারি। প্রকৃত অর্থে, এর পরিবর্তে আমরা সর্বদা খুব গর্বের সাথে আমাদের বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে থাকি।

যারা এই বইটি পড়বে তাঁদের প্রত্যেকের কাছে এই বইটি একটি আধ্যাত্মিক খাদ্য হিসেবে পরিবেশিত হবে। ইহা যে কোন কেহ তার পড়ার টেবিলে বা সাথে করে বহন উপযোগী করে তৈরী করা হয়েছে এবং যখন এর সংস্পর্শে আসবে তখন এটা তাকে আধ্যাত্মিকতার আলোকে আলোকিত করবে।

যদিও বইটাকে আমরা যেভাবে চেয়েছি সে ভাবে এখনও পর্যন্ত পূর্ণতা দান করতে পারিনি, অনেক লোকের শ্রম ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে, সাধারণ মানুষের প্রকৃত প্রয়োজনে, সহজভাবে পড়ার জন্যে এবং বৌদ্ধ ধর্মের নির্ভরযোগ্য সূচনা ও একই সময়ে, দৈনন্দিন জীবনে একটি ব্যবহারিক দিক নির্দেশনা মূলক গ্রন্থ হিসেবে সত্যের প্রতি প্রেরণা যোগানোর জন্যে, বুদ্ধের শিক্ষা নামক বর্তমান সংস্করণ দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে প্রকাশিত হয়েছে।

বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার সংস্থার অভিপ্রায়, একদিন দেখা যাবে যে, অনেক পরিবারে এই বইটি আছে, অনেক বন্ধু অনুসারীরা এই বইটি পড়তে উৎসাহিত হবে এবং পরিশেষে মহান তথাগতের শিক্ষার আলোকে স্নাত হবে।

পাঠকের মন্তব্যকে সবসময় স্বাগত জানানো হবে। যে কোন সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার সংস্থায় লেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

পাঠকদের প্রতি অনুরোধ

ভারত-বাংলার বৌদ্ধ সমাজের থেরবাদী পিটক এবং মহাকবি অশ্বঘোষের 'বুদ্ধ চরিত' গ্রন্থের আলোকে বুদ্ধের জীবন নিয়ে ধারণা ও বিশ্বাসের উপর প্রায় ২০০ বছরের এক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। বর্তমান গ্রন্থের রচয়িতা কতৃপক্ষ 'বুক্কিয় দেনদো ক্যোকাই' মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের পরিবেশ অধ্যুষিত আধুনিক জাপানী বৌদ্ধ সমাজ মানসের উপযোগী করে বুদ্ধ ও তাঁর শিক্ষাকে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন বর্তমান গ্রন্থের রচনা ও প্রচারের মাধ্যমে। ডক্টর ভদন্ত জ্ঞান রত্ন থেরো মহোদয় বাংলা ভাষায় সেই গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন বুদ্ধ জীবন নিয়ে বির্তক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নহে, বুদ্ধের শিক্ষার মৌলিক বিষয় গুলোর সাথে বাংলা ভাষাভাষীদের পরিচয় করে দেয়ার লক্ষ্যে। তাই এ অনুবাদ গ্রন্থে 'বুদ্ধের জীবন কথা' পরিচ্ছেদ সহ অন্যান্য যে সকল ক্ষেত্রে কোন ব্যতিক্রমধর্মী তথ্য পরিদৃষ্ট হবে, তাতে অনুবাদকের কোন হাত নেই; তা মূল রচয়িতার বিষয় বলে ধরে নিতে পাঠকদের প্রতি অনুরোধ থাকবে।

ভাষান্তর

ড. জ্ঞান রত্ন থেরো

অনুবাদকের পরিচিতি

ভদন্ত ড. জ্ঞান রত্ন থেরো ১৯৬৪ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পাদদেশে অবস্থিত পরম শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় গোবিন্দ-গুণালংকারের স্মৃতি বিজড়িত এবং বহু প্রথিতযশা ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবে মুখরিত জোরবা বৌদ্ধ পল্লীতে জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতার নাম স্বর্গীয় বাবু রাজেন্দ্র লাল বড়ুয়া এবং মাতার নাম স্বর্গীয়া শ্রীমতি মীরা রানী বড়ুয়া। তিনি সফলতার সাথে ১৯৮৪ সালে এস, এস, সি, এবং ১৯৮৬ সালে এইচ, এস, সি পাশ করার দরুন কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড থেকে শিক্ষা বৃত্তি লাভ করেন। উল্লেখ্য যে, তখন তিনি রাউজান থানার অন্তর্গত গহিরা শান্তিময় বিহারে অবস্হান করেছিলেন।

তিনি ১৯৮৬-৮৭শিক্ষাবর্ষে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী বিভাগে ভর্তি হয়ে শিক্ষারত অবস্থায় ১৯৮৮ সালে Migration Certificate নিয়ে থ্যাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককের সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন মহাচুলালংকন বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে একই বিভাগে ভর্তি হন এবং ১৯৯৩ সালে কৃতিত্বের সাথে বি, এ, (ইংরেজী) ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯৯৪ সালে তিনি জাপানী ভাষা ও সংস্কৃতি শিক্ষার জন্যে Trident College of Language এ ভর্তি হন। ১৯৯৫ সালে উক্ত কোর্স শেষ করে তিনি আইচি গাকুইন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যভাষাতত্ত্ব-বিদ ও জাতীয় অধ্যাপক Prof. Mayeda Egaku'র তত্ত্বাবধানে এম, এ, ডিগ্রীতে ভর্তি হয়ে, "The Origin of Abhidhamma and its Development" বিষয়ের উপর গবেষণা করে, ১৯৯৭ সালে প্রথম শ্রেণীতে এম, এ, ডিগ্রী লাভ করেন। উল্লেখ্য যে, তিনি তখন কৃতী ছাএ হিসেবে জাপান সরকারের শিক্ষা বিষয়ক মন্এনালয় হতে মনবুশো (Monbusho) বৃত্তি লাভ করেন।

১৯৯৭ সালে পুনরায় ভদন্ত জ্ঞান রত্ন থেরো জাপান সরকারের মনবুশো বৃত্তি নিয়ে একই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এবং একই অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে এম, এ, ডি, লিট্ ডিগ্রীতে ভর্তি হন। ২০০০ সালে তিনি "The Way of Practicing Meditation in Theravada Buddhism" এর উপর গবেষণা করে কৃতিত্বের সাথে এম, এ, ডি, লিট্ ডিগ্রী লাভ করেন এবং ২০০১ সালে তাঁর গবেষণা লব্ধ পুস্তকটি জাপানে প্রকাশিত হয়। তিনি থেরবাদ ও জেন ভাবনার উপর গবেষণার জন্যে Bukkyo Dendo Kyokai হতেও বৃত্তি লাভ করেন। ড. জ্ঞান রত্ন উচ্চতর গবেষণার জন্যে ২০০১ সালে জাপান সরকারের শিক্ষা, আর্ট, বিজ্ঞান, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্এনালয়ের অন্তর্গত "Japan Society for the Promotion of Science" (JSPS) থেকে "Postdoctoral Fellow" হিসেবে বৃত্তি লাভ করেন। বর্তমানে তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে "জাপানীজ কালচারাল স্টাডিজ" বিভাগে প্রভাষক হিসাবে কর্মরত আছেন।

এছাড়াও ভদন্ত ড. জ্ঞান রত্ন থেরো জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন সামাজিক ও গবেষণামূলক সংগঠনের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখে কাজ করে যাচ্ছেন।

উল্লেখ্য যে, ভদন্ত ড. জ্ঞান রত্ন থেরো'র শিক্ষা জীবনের সকল সাফল্যের পিছনে যিনি বিনিদ্রিত সহযোগিতা করে যাচ্ছেন, তিনি হলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ধুতাংগসাধক পরম পুজ্য শ্রীমৎ প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো মহোদয়। যিনি এই অনুবাদ গ্রন্হটির সংশোধনী কাজেও সহযোগিতা করেছেন।